contents

ইমাম গাযালী (র)

ইমাম গাযালী (র)

মিনহাজুল আবেদীন

[ইবাদত সোপান]

মাওলানা মুজীবুর রহমান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মিনহাজুল আবেদীন
ইমাম গাযালী (র)
অনুবাদ : মাওলানা মুজীবুর রহমান

ইফাবা প্রকাশনা : ১২০৯/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৫২
ISBN : 984-06-0239-0

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৬৯

পঞ্চম (ইফাবা তৃতীয়) সংস্করণ
আষাঢ় ১৪০২
জিলহজ্জ ১৪১৩
জুন ১৯৯৪

প্রকাশক
এম. আতাউর রহমান
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

প্রচ্ছদ
কাজী শামসুল আহ্সান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহম্মদ মনসুর-উদ-দৌলাহ্ পাহলোয়ান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্যঃ টাকা মাত্র

MINHAJUL ABEDIN : Minhajul Abedin Written by Imam Gazali (R), translated by Moulana Mujibur Rahman into Bengali and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-100.
June 1994

Price : Tk (US) Dollar :

মহাপরিচালকের কথা

বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক-তাত্ত্বিক হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাযালী (র) ইসলামের যুক্তিনিষ্ঠ ও সুগভীর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অমর গ্রন্থ 'কীমিয়ায়ে সাআদাত', এহইয়া উলুমুদ্দিন' এবং 'মিনহাজুল আবেদীন'-এ সেই সুগভীর চিন্তা-চেতনা ও প্রগাঢ় প্রজ্ঞার সুন্দরতম প্রকাশ ঘটেছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইমাম গাযালী (র)-র কীমিয়ায়ে সাআদাত-এর বাংলা অনুবাদ 'সৌভাগ্যের পরশমণি' প্রকাশের পর "মিনহাজুল আবেদীন" গ্রন্থটিও প্রকাশের আন্‌জাম দিতে পারছে, এজন্য দয়াময় রাব্বুল আলামীনের দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া। এই গ্রন্থে 'ইবাদত' সম্পর্কে যে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে, তা' প্রতিটি মুসলিমের জন্য হিদায়তের নির্ভুল পথ নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। আল্লাহ্ আমাদের এই গ্রন্থের ফয়েজ-বরকত লাভের তওফিক দিন। আমীন।

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

contents

প্রকাশকের কথা

ইসলামী মনীষার অগ্রনায়ক ইমাম গাযালী (র)-র বিখ্যাত গ্রন্থ 'মিনহাজুল আবেদীন' -এর বাংলা তরজমা ইতিপূর্বে দু'বার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ হতে এর দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর পঞ্চম (ইফাবা তৃতীয়) সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

ইমাম গাযালী (র) সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার চেষ্টা করা অর্থহীন। গ্রীক চিন্তাধারার সয়লাব থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর যুগে তিনি এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামী আদর্শ ও জীবনবাদের যে গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দান করেন, তার মূল্য চিরন্তন। গাযালীর রচনাবলীর মধ্যে 'মিনহাজুল আবেদীন'-এর অনন্য স্থান রয়েছে। এ গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশের সুযোগ লাভ করে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে জানাই লাখো লাখো শোকরিয়া।

প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাসাউফ ও ইমাম গাযালী (র)

তাসাউফের উৎপত্তি মহানবী (স)-র সময় থেকেই। তবে ইমাম গাযালী (র)-র সময় পর্যন্ত তার চর্চা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে ইমাম গাযালী (র) পর্যন্ত সময়ের তাসাউফের অবস্থা মোটামুটি নিম্নরূপ ছিলঃ

ইমাম কুশায়রী (র) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় 'সাহাবা' ছাড়া আর কোন উপাধিই প্রচলিত ছিল না। এরপর 'তাবেয়ীন' ও 'তাবে-তাবেয়ীন' প্রচলিত হয়। অতঃপর বুযুর্গানে দীনকে 'আবিদ' এবং 'জাহিদ' নামে অভিহিত করা হতে থাকে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, সকল ফেরকা ও জামা'আতের লোকই 'আবিদ' ও 'জাহিদ' দুইটিকে ব্যবহার করছেন, তখন আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা'আত তাঁদের জ্ঞানী-গুণীগণকে 'সূফী' বলে অভিহিত করতে শুরু করেন।

এই 'সূফী' উপাধি সর্বপ্রথম লাভ করেন আবু হাশিম (র)। তিনি ৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

'সওফ' শব্দ থেকেই যে 'সূফী' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 'সওফ' শব্দের মানে 'পশমী বস্ত্র'। কিন্তু তাই বলে 'পশমী বস্ত্র' পরিধান করাই সূফী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য নয়।

তাসাউফের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত যিন্নুন মিসরী (র) বলেছেনঃ সূফী সেই ব্যক্তি, যিনি দুনিয়ার সব কিছু পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র ইবাদতকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র) বলেনঃ যাঁর জীবন-মরণ শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গিত— তিনিই সূফী। মোটকথা, বিভিন্ন বুযুর্গ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাসাউফের ব্যাখ্যা দান করেছেন। কেউ কেউ আবার বৈরাগ্য, দীনতা ও তাসাউফ— এই তিনটিকে এক করে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথম যুগে তাসাউফ বলতে সংসারের প্রতি আকর্ষণহীনতা সৃষ্টি ও ইবাদতে মশগুল থাকার সাধনাকে বোঝাতো। যতই দিন যেতে লাগলো, ততই সংসারের প্রতি আকর্ষণহীনতা সৃষ্টির সাথে সাথে অন্যান্য

আধ্যাত্মিক গুণের উৎকর্ষ সাধনও তাসাউফের অন্তর্ভুক্ত হতে লাগলো। অবশেষে তাসাউফ অনেক কিছুর সমষ্টি হয়ে দাঁড়াল।

ইমাম গাযালীর আগে তাসাউফ শাস্ত্রের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বই ছিল ইমাম কুশায়রীর 'রিসালা'। কিন্তু তাতে কোন বিষয়েরই চরম অবস্থা ও তার তাৎপর্য বর্ণিত ছিল না। ইমাম গাযালীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তাসাউফকে একটি শিক্ষামূলক বিষয় হিসেবে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। আল্লামা ইবনে খালদূন লিখেছেনঃ ইমাম সাহেবই [ইমাম গাযালী (র)] প্রথম তাসাউফকে শিক্ষামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে সংকলন করেন। ইমাম গাযালী (র) তাঁর 'ইহ্য়াউল উলূম' গ্রন্থে তাসাউফের উভয় দিক বিশ্লেষণ করেন। বস্তুত তিনি 'তাকওয়া' সম্পর্কিত আহ্কাম বর্ণনার সাথে সাথেই তাকওয়া ইখতিয়ারকারীদের জন্য তার পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক আদব বাতলিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, তিনি এর পরিভাষাগত দিকটিও অত্যন্ত সহজভাবে বিশ্লেষণ করেন। ফলে, তাসাউফ যথারীতি একটি শাস্ত্রে পরিণত হয়। অথচ ইতিপূর্বে এটা ব্যক্তি পর্যায়ের এক শ্রেণীর ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ইমাম সাহেব তাসাউফের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে দেখালেন যে, শরীয়তের ন্যায় তাসাউফও দু'টি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। তা হলোঃ ইল্ম ও আমল। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, শরীয়তে ইলমের পরে আমল শুরু হয়, আর তাসাউফে আমলের পরে পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে ইলম।

মোটকথা, ইমাম গাযালী (র)-র আগে তাসাউফ শাস্ত্র সম্পর্কে যত গ্রন্থ লেখা হয়েছিল, তার সবটাতেই তাসাউফের একটা চারিত্রিক বর্ণনা থাকলেও তার পরিভাষাগত দিক, চরম অবস্থা বা তাৎপর্য—এ সবের কোন কিছুই বিবৃত হয়নি। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই মানুষ জটিলতার সম্মুখীন হতো। ইমাম গাযালী (র) তাঁর 'ইহ্য়াউল উলূম' গ্রন্থে প্রতিটি বিষয়কে এক একটি বিভাগে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আলাদা-আলাদা অধ্যায় সাজিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ আলোচনার মাধ্যমে সে সম্পর্কে এমন তাৎপর্য তুলে ধরলেন, যার বেশী আজ পর্যন্ত আর কারও পক্ষেই আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। এজন্যই ইবনে খালদুন বলেছেনঃ ইমাম সাহেব তাসাউফকে একটি আলাদা শাস্ত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তাসাউফ শাস্ত্র সম্পর্কে লিখিত ইমাম সাহেবের সর্বশেষ গ্রন্থটি হলো 'মিনহাজুল আবেদীন'। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইমাম গাযালী (র)-র খাস কিছু শাগরিদ ব্যতীত অন্য কেউ এ বিষয়ে জানতেন না। তাই অন্য কারও পক্ষে এই গ্রন্থের ফয়েয হাসিল করাও সম্ভব হয়নি।

'মিনহাজুল আবেদীন' সম্পর্কে বেশী কিছু বলার নেই। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে ইবাদত-গুযার ব্যক্তিদের জন্য জান্নাতের পথ প্রদর্শক। এই গ্রন্থ পাঠের পর পাঠক নিজেই অনুভব করতে পারবেন, তিনি কি লাভ করলেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে ইমাম গাযালী (র) নিজে যা বলেছেন, এখানে তা উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা যায়।

তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র পথে চলতে গিয়ে মানুষকে যে সংকট ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করে আমি আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করলামঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এমন একটি গ্রন্থ রচনার সামর্থ্য দান কর, যার দ্বারা সকল শ্রেণীর মানুষের উপকার হয় এবং তাদের মুশকিল আসান হয়ে যায়।

অতঃপর অসহায় ও দুর্বলের দোয়া কবূলকারী রাব্বুল আলামীন আমার এই দোয়াটিও কবূল করলেন এবং তাঁর সকল রহস্য আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত করে সেই সংকট ও জটিলতা কাটিয়ে উঠার এমন একটি সূক্ষ্ম পদ্ধতি বাতলিয়ে দিলেন, যা সত্যিই অভিনব। এ যেন দীনী ইল্‌মের প্রকৃত রহস্য-ভাণ্ডার। এই অভিনব পদ্ধতির প্রয়োগ এর আগে কোন গ্রন্থেই আমি করতে সক্ষম হইনি। কেবল এ গ্রন্থেই এর যথাযথ প্রয়োগ করা হলো।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল ইয্যতের জন্য, যিনি সবকিছুর মালিক করুণাময় ও দয়াবান। তিনিই মানুষকে সকল দিক থেকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজ হিকমতে আসমান-যমীন তৈরী করেছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য নিজ হিকমতে স্বীয় আহকামসমূহ জারি করেছেন। যাঁরা চান, তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র পথ অত্যন্ত পরিষ্কার। যাঁরা চোখ খুলে তাকান, তাঁদের জন্য আল্লাহ্‌র পথের উজ্জ্বল প্রমাণ সর্বত্রই বিরাজিত। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান, হিদায়ত করেন—যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। যাঁরা হিদায়ত পাবেন, তাঁদের তিনি ভাল করেই জানেন।

শান্তি বর্ষিত হোক নবী ও রাসূলদের নেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উপর, তাঁর বংশধরদের উপর এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উম্মতের উপর।

আমার সম্মানিত ভাইসব! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এবং আমাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের তওফীক দান করুন। একটি কথা অতি উত্তমভাবে অনুধাবন করবেনঃ ইবাদতে ইলাহী হচ্ছে ইল্‌মের ফল, জীবনের পরিণতি, শক্তিমান পুরুষের সঞ্চয়, আউলিয়া কিরামের পাথেয় এবং একিনের পথ। আর ইবাদত হচ্ছে সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য সৌভাগ্য, সাহসী ব্যক্তিদের মকসুদ, বুযুর্গ ব্যক্তিদের মূল্যবোধে গড়া ঐতিহ্য, মানুষের আসল পেশা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের মনোনীত জিনিস। এটাই সৌভাগ্যের পথ—এতেই জান্নাত প্রাপ্তি হয়।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ-

আমি তোমাদের পরওয়ারদিগার, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।

(সূরা আম্বিয়াঃ ৯২)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا -

এটা তোমাদের পুণ্যেরই ফল, (দুনিয়ায়) তোমরা যে চেষ্টা করেছিলে তা কবূল হয়েছে।

(সূরা দাহর ঃ ২২)

কিন্তু যখন আমি এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং ইবাদতের পদ্ধতি শুরু থেকে নিয়ে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য পর্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি; তখন দেখতে পাই যে, এটা অতি কঠিন রাস্তা। শত বাধা-বিঘ্নসংকুল; এ পথ অতিক্রম করা খুবই পরিশ্রম সাপেক্ষ। এ রাস্তার দূরত্বও অনেক; রাস্তাটি অতি বন্ধুর, পদে পদে এর শত কাঁটা বিছানো। আর তা হবেই বা না কেন? এটা যে নিশ্চিত জান্নাতের রাস্তা, এ পথ তো বন্ধুর হবেই। মহানবী (সা) স্বয়ং বলেছেনঃ

اَلاَوَاِنَّ الْجَنَّةَ حَفَّتْ بِالْمَكَارِهِ وَاِنَّ النَّارَ حَفَّتْ بِالشَّهْوَاتِ-

মনে রেখো, জান্নাত ক্লেশে পরিবেষ্টিত, আর জাহান্নাম পরিবেষ্টিত প্রবৃত্তির ইন্ধনের দ্বারা।

তিনি আরও ফরমিয়েছেনঃ

اَلاَوَاِنَّ الْجَنَّةَ حَزْنٌ بِرَبْوَةٍ اَلاَوَاِنَّ النَّارَسَهْلٌ بِهَوَةٍ-

মনে রেখো, জান্নাত লাভ বড্ড কঠিন, কিন্তু দোযখ লাভ অতি সহজ।

এসব ছাড়া আরও একটি বিষয় ভাববার আছে। তা এই যে, মানুষ বড্ড দুর্বল, সময়ের পরিক্রমা বড় নিষ্ঠুর, দীনের কাজের সংখ্যা বহু। ফুরসত কম, কিন্তু কর্তব্য কর্মের সংখ্যা অনেক; জীবন স্বল্পস্থায়ী, তাতেও আবার আমল করার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু সকল আমলের হিসাব গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ যে মৃত্যু, তা অতি নিকটবর্তী। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে, এ পথের সামান্য পাথেয় কেবল আল্লাহ্‌র রাস্তায় আনুগত্য থেকেই অর্জিত হয়। এ ছাড়া এ পথের আর কোনই সম্বল নেই। শীঘ্রই এ সম্বল হাসিল করা উচিত, নইলে আর তা হাসিল করারও সুযোগ থাকবে না। তাছাড়া আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য পুনরায় আর এখানে প্রত্যাবর্তনও সম্ভব হবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সফলকাম হয়েছে। চিরদিনের জন্য এবং সকল সময়ের জন্য সে সৌভাগ্য অর্জন করে ফেলেছে। আর যে ব্যক্তি তা অর্জন করতে পারেনি, সে অত্যন্ত ক্ষতিতে নিপতিত হয়েছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে তারও ধ্বংস হওয়া ছাড়া কোন পথ খোলা নেই।

আল্লাহ্‌র কসম! বর্তমানে আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। এতে বিপদ-আপদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। তাই এই রাস্তায় যাঁরা চলতে চান, তাঁরাও যেন বিব্রত হয়ে পড়েছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র পথের পথিকের সংখ্যা এখন অতি নগণ্য। তাছাড়া যাঁরাও বা এ পথের পথিক হওয়ার জন্য কৃতসংকল্প, তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী—যাঁরা এ পথে অভিযান শুরু করেছেন, তাঁরা পদে পদে বাধাগ্রস্ত; আর

দ্বিতীয় শ্রেণী—যাঁরা লক্ষ্যস্থান পর্যন্ত পৌঁছতে চান (অর্থাৎ সালেকীন), তাঁদের তো সংকটের অন্ত-ই নেই।

এই শেষোক্ত শ্রেণীই সেই সম্মানিত ব্যক্তিগণ, আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত তাঁর মারিফত ও মহব্বতের জন্য যাঁদের মনোনীত করেছেন এবং স্বীয় তওফীক ও হিফাজতের মাধ্যমে তাঁদের পাপ-পংকিলতা থেকে দূরে রেখেছেন। অতঃপর রাব্বুল আলামীন তাঁদের নিজ করুণাধারায় সিক্ত করে স্বীয় সন্তুষ্টি ও জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে বিশেষভাবে সাফল্য লাভকারী ওই জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন!

এখন আমরা যখন আল্লাহ্‌র রাস্তার গুণাগুণ ওয়াকিফহাল হলাম এবং জানতে পারলাম, এই পথের যেকোন গর্তে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা সতত বিদ্যমান, তখন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি এবং তা অতিক্রমের পন্থা নিরূপণে অগ্রসর হতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা যাতে করে তাঁর তওফীক দ্বারা নিরাপদ মন্‌যিলে মকসুদে পৌঁছিয়ে দেন, এই আশা নিয়েই বান্দার পক্ষে এই পথ অতিক্রমের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত এবং এই সঙ্গে চেষ্টা করা দরকার সকল বিপদাশঙ্কা ও অন্যান্য বাধা-বিঘ্নের বিবরণ জানবার।

এই প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই আমিও এই পথ অতিক্রম ও তাতে চলবার পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছি। কিতাবগুলোর মধ্যে 'ইহ্‌য়াউল উলূমুদ্দীন,' 'আলকুরবাতু ইলাল্লাহ্' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কিতাবগুলো সাধারণের বোধগম্য হবার মত নয়। ফলে সাধারণ মানুষ তাতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং যে সব বিষয় তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি, তা নিয়ে জটিলতার সম্মুখীন হয়।

আল্লাহ্‌র কালামের চাইতে উন্নত আর কার ভাষা হতে পারে? অথবা ভাষাগত সৌকর্যের দিক দিয়ে তার মুকাবিলায় দাঁড়াতে পারে, এমন ভাষাই বা কোথায় আছে? তা সত্ত্বেও বলা হয়েছেঃ

أَنَّهُ أَسَاطِيْرُ الأَوَّلِيْنَ

আর তাছাড়া, তোমরা হযরত যয়নুল আবেদীনের কথা কি শোননি? তিনি বলতেনঃ 'আমি আমার ইল্‌মের ঐশ্বর্যসমূহ গোপন রাখি, যাতে করে অজ্ঞ লোক তার দ্বারা ফিতনায় পতিত হয়ে না পড়ে।' এই ব্যাপারে আবূ হাসান আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। তিনি বলেছিলেনঃ আয় পরওয়ারদিগার! যদি ইল্‌মের ঐশ্বর্য আমি প্রকাশ করে দেই, তাহলে আমাকে বলা হবে যে, আমি বুঝি মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছি! আর মুসলমানরা আমাকে হত্যা করা জায়েয বলে গণ্য করে ফেলবে। তাছাড়া, তখন আমি

অতি উত্তমভাবে যে বিষয়টি উপস্থাপন করব, তাতেও মন্দ খুঁজে বের করা হবে। মোটকথা, দীনের রক্ষকগণ আল্লাহ্‌র কুল-মখলুকের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন এবং নিজেরা সব ব্যাপারেই আত্মপ্রবণতা বর্জন করবেন। এই হলো সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের দায়িত্ব।

এই দায়িত্ব তাঁদের এই জন্য যে, তাঁরাই মখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাই আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করলাম, তিনি যেন আমাকে এমন একটি কিতাব লিখার ক্ষমতা দান করেন, যাতে সাধারণের উপকার সাধিত হয়। তিনি আমার দোয়া কবূল করলেন এবং তাঁর করুণাধারায় আমার কাছে তাঁর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে এমন একটি উত্তম তরতীব বাতলিয়ে দিলেন, যা আমি আমার আগেকার কিতাবসমূহে প্রয়োগ করিনি। এক্ষণে সেই নয়া তরতীব অনুযায়ী এই কিতাব শুরু করছি।

প্রথমত, যে বান্দা ইবাদতের জন্য তৈরী হয় এবং সেই রাস্তায় অভিযানের উদ্দেশ্যে একাগ্রতা হাসিলে সক্ষম হয়, বুঝতে হবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার ইশারায়ই তা হচ্ছে এবং তাঁকে তিনি বিশেষ তওফীক দান করে থাকেন। আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত পবিত্র কালামে এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়ঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ –

যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন, তিনি (নিশ্চিতই) পরওয়ারদিগারের নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। (সূরা যুমার ঃ ২২)

হযরত রাসূলে করীম (সা) এই দিকেই ইশারা করে বলেছেনঃ

اِنَّ النُّوْرَ اِذَا دَخَلَ الْقَلْبَ اِنْفَسَحَ وَانْشَرَحَ وَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِذٰلِكَ عَلَامَةٌ تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ اَلتَّجَافِىْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَوْتِ –

কোন মুমিনের অন্তঃকরণে যখন নূর প্রবিষ্ট হয়, তখন তার হৃদয় প্রশস্তি ও ব্যাপ্তি লাভ করে। রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! এর কি কোন

আ[illegible] তিনি জবাব দিলেনঃ দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টি এবং জান্নাতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি আর মওত আসার আগেই মওতের জন্য তৈরী হওয়া।

মোটকথা, বান্দার অন্তঃকরণে যখন শুভ চিন্তার উদ্রেক হয়, তখন আমি নিশ্চিত যে, সে বিভিন্ন রকমের নিয়ামতের অধিকারী হয়ে পড়ে। যেমন হায়াত, কুদরত, আকেল, বাচন-ক্ষমতা এবং সকল সম্মানিত ও প্রিয় বস্তু। মোটকথা, এই বোধশক্তি ক্ষতিকারক এবং আপদের বস্তুসমূহকে নিশ্চিতভাবে দূর করে দেয়। আর সাথে সাথে এই সকল নিয়ামতের জন্য শোকর করার আবেদন সৃষ্টি করে। সুতরাং, আমি যদি তা না করে গাফিল হয়ে পড়ি, তবে নিশ্চিতই তিনি আমার থেকে সমস্ত নিয়ামত দূর করে দেবেন এবং তাঁর নির্ধারিত শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন। এই জন্যই তো তিনি আমার নিকট একজন নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁকে তিনি মানুষের স্বাভাবিক বিদ্যা-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে অলৌকিক শক্তিরও অধিকারী করে দিয়েছেন।

সাথে সাথে আমাকে বাতলিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমার একজন পরওয়ারদিগার আছেন, যাঁর মরতবা অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, মহান, প্রজ্ঞাবান এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী। তিনি যাকে চান, তার প্রতি হুকুম করেন, যাকে চান তাকে বিরত করেন। তিনি এ ব্যাপারেও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী যে, আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি, তাহলে তিনি আমাকে তার জন্য আটকাতে পারবেন, তেমনি আমি যদি তাঁর ফরমাবরদারি ও আনুগত্য প্রদর্শন করি, তবে তিনি তার জন্য সওয়াব দান করবেন। তাছাড়া, আমার সকল গোপন বিষয় ও কল্পনা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। তিনি একাধারে বান্দাকে পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন, আবার তেমনি হুমকিও প্রদর্শন করেছেন। তিনি যে সর্বশক্তিমান তা বান্দার মনে জাগ্রত রাখার জন্য শরীয়তের বিধি-নিষেধকে অবশ্য-পালনীয় বলেও হুকুম দিয়েছেন। তাছাড়া যৌক্তিকতার দিক থেকে এটা অসম্ভব নয়। সুতরাং, বান্দারও উচিত তাঁকে ভয় করা। অবশ্য ভীতির অর্থ এই হবে যে, সে সচেতন ও সাবধান হবে এবং নিদর্শনকে অবশ্য-গ্রহণীয় বলে গণ্য করতে থাকবে। তাহলে ওযর করার পথটিও তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে সে চিন্তা-ভাবনা ও দলীলকে আবশ্যক হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় উপনীত হলে বান্দা হয়রান ও পেরেশান হয়ে যায় এবং এ-অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ তালাশ করতে শুরু করে। যেসব বিষয় তার অন্তরে স্থায়ীভাবে ধারণ করে এবং কানে যার আওয়াজ শ্রুত হয়, তা থেকে সে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে। ফলে এমতাবস্থায় নিজের বোধশক্তি দ্বারা প্রমাণাদি নিরীক্ষণ ও নিজস্ব নৈপুণ্য দ্বারা বিশ্বনির্মাতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এতে করে তার অদৃশ্য বস্তুর উপরও ইল্‌ম হাসিল হয়ে যায় এবং তার জানা হয়ে যায় যে, তার একজন

পরওয়ারদিগার আছেন, যিনি তাকে বোধসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই সকল বিষয়ে হুকুম করেন এবং অনেক কিছু করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। ইবাদতের রাস্তায় এটিই প্রথম পদক্ষেপ। এটি হলো ইল্‌ম এবং মারিফতের ঘাঁটি। এখানেই দীনের কার্যাবলী সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি হাসিল হয় এবং বিনা তদবীরেই তা ফয়সালা করা শুরু করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, এই ঘাঁটিতেই শিক্ষা হয় প্রমাণাদি থেকে উত্তম দৃষ্টিভঙ্গি, পূর্ণাঙ্গ চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা, উলামায়ে হক, সত্যপথ অনুসারী এবং ইমামদের পন্থা থেকে জানবার ও শিখবার পদ্ধতি।

এইভাবে তাঁদের থেকে ফায়দা এবং তা উপলব্ধি করার তওফীক হাসিল করার সাথে সাথেই নেক দোয়া করাবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার তওফীক হাসিল করা দরকার— যাতে করে গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইল্‌ম হাসিল হয়ে যায়। গায়েবী বিষয় হচ্ছেঃ

বান্দার জন্য একজন প্রকৃত মাবুদ আছেন। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই বান্দাকে পয়দা করেছেন এবং তাঁর জন্য সমস্ত নিয়ামত ঢেলে দিয়েছেন। অতঃপর বান্দাকে এই নিয়ামতের জন্য শোকর-গুযারী করার হুকুম দিয়েছেন। তাছাড়া, জাহিরী ও বাতিনীতে খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথেই আবার বান্দাকে কুফরী ও গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার তাকিদ এবং সতত আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য অশেষ সওয়াবের ফয়সালাও জানিয়ে দিয়েছেন। আরও জানিয়ে দিয়েছেন, নাফরমানী ও আনুগত্যহীনতার জন্য শাস্তি ও যন্ত্রণার কথা। এমতাবস্থায় এই মারিফত ও গায়েবী ইলম বান্দাকে খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শন এবং ইবাদতের দিকে উৎসাহিত করতে থাকে। ফলে, সে লাভ করে তার দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু—সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত। শত মূর্খতা ঢাকা পড়ে তার অন্তর আলোকিত হয় মারিফতের উজ্জ্বল নূরে।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয়, বান্দা কিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে? সে জানে না জাহিরী এবং বাতিনী খিদমত করতে কি কি অবশ্য করণীয় তার আছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র মারিফতের এই ভীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর জাহিরী ও বাতিনী দিক থেকে শরীয়তে যেসব বিষয় তার জন্য অবশ্যকরণীয়, তা হাসিল করার জন্য সে চেষ্টা করতে থাকে। এইভাবে কোন বান্দা যখন শরীয়তের ফারায়েযসহ ইল্‌ম ও মারিফতের জন্য তৈরী হয়ে যায়, তখন সে ইবাদতে ইলাহী শুরু এবং তাকে তার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে সক্ষম হয়। কিন্তু কেবল এতেই শেষ হয় না। সে যখন গভীর চিন্তায় মশগুল হয়, তখন তার প্রথমেই মনে পড়ে যে, সে পাপ-পংকিলতায় জরাজীর্ণ হয়ে আছে— অধিকাংশ মানুষেরই এ অবস্থা হতে পারে। তখন সে ভাবে, কি করে আমি ইবাদতে ইলাহীতে মগ্ন হবো, আমি মস্তবড় গুনাহ্গার। সুতরাং, আল্লাহ্ তা'আলা

যাতে আমাকে এই পাপ-পংকিলতা থেকে মুক্ত করে আমার সমস্ত গুনাহ্ খাতা মাফ করে নিষ্কলুষ ও পবিত্র করে নেন, তজ্জন্য প্রথমেই আমার 'তওবা' করা দরকার।

তওবার ঘাঁটি

মনযিলে মকসূদে (ইবাদতে) পৌঁছার জন্য বান্দাকে নিশ্চিতই তওবার ঘাঁটি পার হওয়ার প্রয়োজন হয়। এইজন্য সে তওবার কর্তব্য ও শর্তাবলীসহ উহার মনযিলসমূহ অতিক্রম করা শুরু করে। এইভাবে সে তওবার সকল মনযিল পার হয়ে যায়। বস্তুত, যখন তার প্রকৃত তওবার সৌভাগ্য নসীব হয় এবং ঘাঁটিও পার হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পদক্ষেপ হিসেবে সে ইবাদতে ইলাহীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কিন্তু এখানে এসে সে দেখতে পায়, চারদিকেই তার নানা রকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা। প্রতিটি বাধাই তাকে পেরেশানীতে নিক্ষেপ করছে এবং তার অভীষ্ট ইবাদতের পথে অসুবিধার সৃষ্টি করছে। গভীরভাবে চিন্তার পর সে ধরতে পারে যে, এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী চার শ্রেণীর ঃ দুনিয়া, সৃষ্টি জগৎ, শয়তান এবং নফ্স। সুতরাং প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙ্গিয়ে ইবাদতের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আশু প্রয়োজন হয় এসবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার, নতুবা ইবাদতে সাফল্য লাভ সুকঠিন।

প্রতিবন্ধকতার ঘাঁটি

এইসব ঘাঁটি পার হওয়ার জন্য চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, সৃষ্টি জগতের সংস্রব বর্জন, শয়তানের সাথে দুশমনীর সংগ্রাম ঘোষণা এবং নফ্সকে দাবিয়ে রাখা।

এইসব জিনিসের মধ্যে নফ্সই সবচাইতে উত্তম নিয়ামত। সুতরাং এর থেকে আলাদা হওয়া সম্ভব নয়। আর এই নফ্স একদিনেই পরাজিত হবারও নয়। তেমনি শয়তানও একদিনেই পরাস্ত হবে না। মনে রাখতে হবে, এই নফ্সই শয়তানের কারসাজির কেন্দ্রস্থল, তেমনি তা ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার প্রধান হাতিয়ার। সুতরাং, বান্দা যে ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার জন্য সংকল্প করবে, তার সাথে নফ্সের মিল আছে কিনা তা বিবেচনা করে কোনই ফায়দা নেই। কেননা, নফস সব সময়ই উত্তম এবং ভাল কাজে বাধা সৃষ্টিরই চেষ্টা করে। বরঞ্চ, নফ্স যাতে উড়ো উড়ো ভাব না দেখাতে পারে, অনুগত ও দাসত্ব করতে বাধ্য হয় এবং উত্তম কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেও পংকিলতা এবং ধ্বংসকারী জিনিস থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য এই সময় নফ্সকে তাকওয়ার লাগাম পরিয়ে দেয়াই জরুরী কাজ। এইভাবে বান্দা এই গিরিসংকট

অতিক্রম করার চেষ্টা এবং এতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করতে থাকে।

অতঃপর বান্দা যখন এই সংকটও কাটিয়ে উঠে তখন পুনরায় অভীষ্ট ইবাদতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সময় চারদিক থেকে আবার কতক প্রতিবন্ধকতা ঘিরে ফেলে এবং তাকে অভীষ্ট ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দিতে বারণ করতে থাকে। শুধু তাই নয়, ইবাদতে ইলাহীতে মশগুল হওয়ার পথে সুস্পষ্ট বাধার সৃষ্টি করে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এই জিনিসগুলো চার রকমের ঃ প্রথমত, রিয্ক— নফ্স হরদম রিয্কের দাবি করে এবং বলতে থাকেঃ আমার জন্য রিয্ক এবং শক্তির প্রয়োজন। তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং মখলূক থেকে আলাদা হয়ে গেলে শক্তি ও রিযক আমার কোথা হতে আসতো? দ্বিতীয়ত, যে ব্যাপারে সে আশংকা করতো, যে ব্যাপারে সে আশা রাখতো কিংবা কিছু করতে চাইত বা কিছু অপছন্দ করতো, এইসব বিষয়ের পরিণামে ভাল-মন্দ না জানা থাকার জন্য প্রত্যেক ব্যাপারেই তার মনের উপর একটা মৌলিক প্রভাবও থেকে যায়। এটা কাটিয়ে উঠা মুশকিল। তার অন্তর ওইসব বিষয়ের সাথে ঝুলন্ত থাকে। পরিণামে অনেক সময় সে ফাসাদ ও ধ্বংসে লিপ্ত হয়ে যায়। তৃতীয়ত, প্রতিবন্ধকতা হলো কাঠিন্য ও রূঢ়তা। যদিও এটা মখলূকের প্রতি নফ্সের বিরোধিতার একটা প্রতিক্রিয়া এবং শয়তানের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকার জন্য প্রস্তুতি, তথাপি চারদিক থেকেই এই কাঠিন্য ও রূঢ়তার ধাক্কা আসতে থাকে। এমনিভাবে বহু উত্তেজনার মনোভাব হজম করে ফেলে এবং বহু কষ্টকেও বরদাশ্ত করে। বহু দুঃখ-দৈন্য ও বিপদ-মুসীবত তাকে নানাভাবে ঘিরে ফেলে। চতুর্থত, আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী নির্ধারিত ভাগ্যচক্র আবর্তিত হতে থাকবে। এতে নফ্স তার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে দ্রুত বিদ্রোহ ভাব ধারণ করতে চাইবে এবং ফিতনার দিকে পদক্ষেপ করতে পারে। সুতরাং এই সব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের বিষয়গুলোও সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

উপরিউক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অতিক্রম করার জন্য চারটি জিনিসের প্রয়োজন। রিয্ক এবং রুযীর ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। বিপদের সম্মুখীন হলে নিজস্ব বিষয়ের ভার আল্লাহ্ তা'আলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। যত মুসীবতই আসুক না কেন, সবর ইখতিয়ার করতে হবে এভং তকদীরে ওলট-পালটের ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে হবে। এমনিভাবে বান্দা এই সংকটও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী এবং তাঁর উপর নির্ভরশীলতায় অতিক্রম করতে শুরু করবে। সত্যিকারভাবে সে যখন এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়, তখন সে পুনরায় সেই অভীষ্ট ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু নফ্স তার এই

সময় অতি দুর্বল ও আলসে হয়ে পড়ে। সজীবতা বলতে তার আর কিছুই বাকি থাকে না। সকল মহৎ গুণ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর ঝোঁক বেড়ে যায় আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা, আরাম ও বিদ্রোহের প্রতি। বরঞ্চ নফ্সের মধ্যে এই সময় ঔদ্ধত্য, বেহুদাপনা ও মতিচ্ছন্ন ভাব এসে যায়। এই অবস্থায় নফ্সকে সঠিক ও উত্তম পথে পরিচালনা করা এবং মহৎ কাজে বারবার উৎসাহ দানের জন্য একটি পরিচালকের অবশ্যই প্রয়োজন দেখা দেয়। আরও প্রয়োজন দেখা দেয় একজন ভয় প্রদর্শনকারীর, যে তাকে মন্দ ও পাপ কাজ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করবে। এই দু'টি জিনিসের নাম হলো 'রেযা' (সন্তুষ্টি) এবং 'খওফ' (ভীতি)।

আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্টি মস্তবড় সওয়াবের জিনিস এবং কারামতের মধ্যে একটি উত্তম উপাদান। এর প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা দিয়েছেন। তাছাড়া, এ সন্তুষ্টি স্বয়ং একটি সক্রিয় জিনিস—যা সব সময় বান্দাকে নসীহত করে, তাকে সজীব রাখে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতি প্রেরণা যোগায়। এমনকি অন্তরে অপূর্ব পুলক জাগিয়ে তুলতেও সমর্থ হয়।

অপরপক্ষে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় সংশ্লিষ্ট এবং সেইসব পরিণতি ও যিম্মাদারী, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ ভয় দেখিয়েছেন, তা হলো এক ধরনের ক্লেশ মাত্র। এর সাথেও একজন ভয় প্রদর্শনকারী থাকেন, যিনি সব সময় বান্দাকে গুনাহ্ থেকে ভয় দেখান, তা থেকে দূরে রাখেন এবং তাড়িয়ে নিয়ে যান।

এই ঘাঁটিও উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা, এই গিরিখাদও (সংকটময় স্থান) অতি কষ্টে অতিক্রম করতে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত নেক তওফীকের সাহসে বান্দা এই সংকটস্থল অতিক্রম করা শুরু করে দেবে। এই ঘাটে সাফল্য লাভ করতে পারলে তবে সহজেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়। এই সময় ইবাদতের পথে আর কোন বাধা-বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকতা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং ইবাদতে ইলাহীতে মশগুল হওয়ার জন্য নিজেকে উৎফুল্ল বিবেচিত হতে থাকে।

অতঃপর বান্দা ইবাদতে ইলাহী শুরু করে দেবে। পূর্ণ আগ্রহ ও মুগ্ধতাসহ তাতে নিমগ্ন হয়ে যেতে পারবে। এমনিভাবে সে এই ইবাদতে নিজেকে স্থিতিশীল করে তুলতে সক্ষম হবে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এই মহান ইবাদতের বোঝা সহ্যকারীর জন্যও দু'একটি গুরুতর মুসীবত আছে— একটি রিয়া; অপরটি আত্মগর্ব। কখনো কখনো মানুষ তার ইবাদতকে লোক দেখানোর (রিয়া) ব্যাপারে পরিণত করে। এতে তার ইবাদত ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যায়। আবার কখনো লোক দেখানো ভাব থেকে

বিরত থাকে সত্য, কিন্তু এই কারণে নিজের নফ্‌সকে মালামত করে। এইভাবেই নফ্‌সের মধ্যে আত্মগর্ব সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে তারও ইবাদত ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং, এই বিষয়গুলোও আমি এখানে আলোচনা করছি।

হাম্‌দ ও শোকর

বান্দা যতটুকু নেক আমলই করুক না কেন, তা যেন সংরক্ষিত এবং নিরাপদ থাকে, তজ্জন্য এই বিপদসংকুল স্থানটিও ইখলাস এবং দৃঢ়চিত্ততার সাথে অতিক্রম করার প্রয়োজন হয়। বান্দা এ-স্থানটিও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তওফীকের নির্ভরতায় চেষ্টা এবং সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে আল্লাহ্‌র হিফাজতে অতিক্রম করতে থাকে।

মোটকথা, এই সকল ব্যাপার থেকে মুক্ত হতে পারলে বান্দার জন্য ইবাদতের সেই মকামটি হাসিল হয়, যা তার কাম্য ও অভিপ্রেত। এই সময় সে সকল আপদ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। পরে আবার যখন সে চিন্তায় মগ্ন হয়, তখন সে দেখতে পায় যে, সে আল্লাহ তা'আলার ইহসানের দরিয়ায় নিমজ্জিত। তাঁর সীমাহীন সাহায্য ও করুণাধারাসহ তওফীক ও সম্মানের যে সকল নিয়ামত তিনি দান করেছেন, বান্দা তারই মধ্যে নিজেকে নিমজ্জমান প্রাপ্ত হয়।

শুধু তাই নয়, আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহানুভূতির বিশেষ দু'টি বিষয়—মর্যাদা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি লক্ষ্য করে ভয় হয় যে, এই নিয়ামতের জন্য শোকর আদায় করার ব্যাপারে না-গাফলতি প্রকাশ পায়! আর যদি তাই হয়, তবে তো সেটা না-শোকরীর পর্যায়ভুক্ত হবে। ফলে যে মকাম আল্লাহ্‌র খালেস খাদিমদের জন্য এবং যেখানে নাযিল হয় আল্লাহ্‌র করুণাধারা অবিরত ও যে মকামের দিকে তাঁর দৃষ্টি সতত স্নেহপূর্ণ—সেই মহা নিয়ামতপূর্ণ মকাম লাভের সৌভাগ্য থেকে হবো বঞ্চিত—আমাকে বুঝি তা থেকে নামিয়ে দেয়া হবে! এ ব্যাপারে সুষ্ঠু আলোচনার প্রয়োজন। নিম্নে খানিকটা আলোকপাত করা হচ্ছে।

অতঃপর বান্দা এই সংকটও পাড়ি জমাতে শুরু করে। আর আল্লাহ্‌র অসংখ্য নিয়ামতের যতখানি সম্ভব শোকরিয়া আদায় করতে থাকে। এইভাবে এই সংকটটিও যখন পার হয়ে যায় এবং চিন্তামুক্ত হয়ে পড়ে, তখনই সে দেখতে পায় তার সামনে অবস্থান করছে তারই অভীষ্ট বস্তু। এই সময় আনন্দ ত্রাস পায়। এমন কি ফযীলতের প্রাঙ্গণ, আগ্রহের সাহারা ও মহব্বতের ইমারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর সন্তোষের ফুল্লকানন, প্রীতির বাগিচা, আনন্দের মেলা, কুদরতের মোহময়ী সংস্রব এবং নিয়ামত ও কারামতের মধ্যে সে ভ্রমণ করতে থাকে। এইভাবে সে এই সকল অবস্থা ও মকামাতের

আনন্দ ও সন্তোষ ভোগ করতে পারে। এই আনন্দ ও সন্তোষ তার দুনিয়ায় অবশিষ্ট জীবন ও আখিরাতের নিত্য-সাথী হয়ে যায়।

এই অবস্থায় পৌঁছে দিনের পর দিন সে প্রতীক্ষা করে শেষ সফরের (মৃত্যুর)। সমস্ত মখলুকাত থেকে মন তার উঠে যায়। দুনিয়ার প্রতি বিরক্তি এসে যায়, কামনা থাকে শুধু মৃত্যুর। এইভাবে মালায়ে আ'লার আগ্রহ তার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। এমতাবস্থায় রাব্বুল আলামীনের দূতগণ তার সামনে রাওহ রায়হান ও রাব রাজীর তরফ থেকে খোশ-খবর পেশ করা শুরু করেন। অতঃপর তাকে পবিত্র নফ্স এবং খোশ-খবরসহ নশ্বর দুনিয়ার ফিতনা জর্জরিত স্থান থেকে হযরত ইলাহীর দিকে নিয়ে যায় এবং জান্নাতের বাগিচায় স্থান করে দেয়। সেখানে গিয়ে এই ব্যক্তি লাভ করে নিজের তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র নফ্সের জন্য চিরন্তন নিয়ামত এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্য। আর লাভ করে স্বীয় করুণাময় মহান রবের এমন সব করুণা, রহমত, নৈকট্য-সুখ, নিয়ামত ও কারামত, যার গুণাবলী কোন বর্ণনাকারীই বর্ণনায় শেষ করতে পারবে না। কোন বিবরণ দানকারীর পক্ষেই তার যথাযথ বিবরণ দেয়া সাধ্যে কুলাবে না। শুধু কি তাই, এই সকল নিয়ামত সব সময় ও প্রতিদিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কি আর বলব, এ যে কত বড় সৌভাগ্য, কত বড় গৌরবের কথা, তা বলে শেষ করা যায় না। এ সৌভাগ্য যাঁর লাভ হয়, তাঁর সাথে হিংসা হয়, এটা তাঁর সত্যিই পরম গৌরব, চরম সৌভাগ্যের স্থান। এটাই তাঁর খোশ-খবরীর মকাম।

পরিশেষে আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের খিদমতে আরয করছি। আমার ও তোমার প্রতি তিনি যেন এই মহান নিয়ামতের ভাগী হওয়ার তওফীক দান করেন—করুণাময় আল্লাহ্র পক্ষে এই তওফীক দান করা মোটেই কষ্টকর নয়। আরও আরয করছি, তিনি যেন আমাদের তাদের মধ্যে পরিগণিত না করেন, যাদের পক্ষে এই নিয়ামতের কেবল গুণাবলী জানা, শোনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্যতীত আর কোন ফায়দা হাসিল হয়নি। আর যা কিছু আমরা শিখেছি, তাই যেন কিয়ামতে আমাদের জন্য প্রমাণার্থে ব্যবহৃত না হয়, বরং তাতে আমাদের আমল করার ও দৃঢ়তাবদ্ধ থাকার তওফীক দান করা হয়। কেননা, তাঁর ইচ্ছা এটাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা করুণার আধার ও দয়ার সাগর।

আর আমাদের পিয়ারা নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ ও রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁকে শরাফত ও কারামতের দ্বারা সরফরাজ করা হোক। কেননা, আমার প্রকৃত মাবুদ এই বর্ণনার ব্যাপারে আমাকে উপরিউক্ত তরতীবই শিক্ষা দিয়েছেন।

এবার আল্লাহ্র প্রদত্ত তওফীক দিয়ে একটা বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করুন যে, উপরিউক্ত আলোচনার সারকথা হলোঃ ইবাদতের পথে মোট ৭টি ঘাঁটি আছে। যথা—(১) ইল্মের ঘাঁটি, (২) তওবার স্থান, (৩) মুশকিলের ঘাঁটি, (৪) প্রতিবন্ধকতার স্থান, (৫) প্রেরণাদানকারী, (৬) মন্দের ঘাঁটি এবং (৭) হামদ্ ও শোকরের মকাম।

সূচী

মিনহাজুল আবেদীন

[ইবাদত সোপান]

প্রথম সোপান

ইল্‌ম ও তার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তৌফিক ও সাহায্যে শুরু করছি। ওহে, আল্লাহ্‌র ইখলাস ও ইবাদতের প্রার্থী, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নেক তৌফিক দান করুন!

মনে রেখো, প্রথমেই ইল্‌ম অপরিহার্য ও জরুরী। কেননা এটাই সব কিছুর ভিত্তিমূল। আর ইল্‌ম ও ইবাদতে ইলাহী— এ দু'টি এমন মূল্যবান বস্তু, যার জন্য এ সৃষ্টি-জগতের সকল ব্যবস্থাপনা। আমরা যা চোখে দেখছি ও কানে শুনছি, তার সবকিছু এজন্যই। গ্রন্থ রচনাকারীদের গ্রন্থ থেকে হোক, শিক্ষকের শিক্ষা থেকে হোক কিংবা বক্তার বক্তৃতা বা পরীক্ষকের পরীক্ষা থেকেই হোক, যেভাবেই আমরা যা কিছু জানছি, শুনছি— সবকিছু এ উদ্দেশ্যেই। বরং এ কারণেই করা হয়েছে আসমান-যমীন তথা সমস্ত মখলূকাত পয়দা।

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত দু'টি আয়াত গভীরভাবে অনুধাবন করুন! আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا -

আল্লাহ্ তিনিই, যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপভাবে যমীনও। এসবের মধ্যে আল্লাহ্‌র আহকাম নাযিল হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুকেই তাঁর ইল্‌মের দ্বারা ঘিরে রেখেছেন।

(সূরা তালাক ঃ ১২)

এ আয়াতটি ইল্‌মের ফযীলত সম্পর্কে একটি যথার্থ প্রমাণ। এরপর আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন করে না — বিশেষ করে ইলমে তওহীদ সম্পর্কে।

অপর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

আমি জিন ও মানুষকে এ জন্যই পয়দা করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

এ আয়াতটি ইবাদতে ইলাহীতে মশগুল হওয়া এবং তাতে দৃঢ়বদ্ধ থাকার তাগিদের সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে, ইল্‌ম ও ইবাদতে ইলাহী এমন দু'টি জিনিস-- যে জন্য এ দুনিয়া ও আখিরাতের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বান্দার উপর এটা ওয়াজিব এবং জরুরী যে, কিছুতেই ইল্‌ম ও ইবাদতে ইলাহী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মশগুল হবে না। তার সকল প্রচেষ্টা ও শ্রম এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে এবং এ দু'টি বিষয়ের চিন্তা-ভাবনাই তার ব্রত হবে। এ দু'টি ছাড়া অবশিষ্ট সকল বিষয় বাজে ও মূল্যহীন; এগুলোতে কোন লাভালাভ নেই। আরও মনে রাখতে হবে, উপরিউক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যে আবার ইল্‌মেরই বিশেষ মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। এ জন্যই নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

ان فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى من امتي-

সাধারণ একজন উম্মতের চাইতে আমার মর্যাদা যতখানি ঊর্ধ্বে একজন ইবাদত-গোযারের চাইতে একজন আলিমের মর্যাদাও ততখানি ঊর্ধ্বে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

نظرة الى العالم احب الى من عبادة سنة صيامها وقيامها -

আলিমের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা আমার নিকট রোযা ও কিয়ামসহ এক বছরের ইবাদতের চাইতেও উত্তম।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

اَلَا اُدُلُّكُمْ اَشْرَفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُمْ عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ ـ

আমি তোমাদের নিকট জান্নাতের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন দলের কথা(তাদের পরিচয়) বলব? সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ নিশ্চয়ই ইয়া রসূল্লাহ্! অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের আলিমগণ।

সুতরাং একথা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, ইল্‌ম ও ইবাদত— এ দু'টির মধ্যে ইল্‌মের মর্যাদাই অধিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইবাদতের জন্যই ইল্‌মের প্রয়োজনীয়তা নতুবা শুধু ইল্‌ম একটা বিরাট বোঝা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, ইল্‌ম বৃক্ষ আর ইবাদতে ইলাহী তার ফল। স্বভাবতই বৃক্ষের মর্যাদা সমধিক। কেননা বৃক্ষই ভিত্তি। তবুও উপকৃত হওয়া যায় কেবল তার ফলের দ্বারাই। এ পরিপ্রেক্ষিতে উভয় বিষয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করা বান্দার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

এ বিষয়েই আলোকপাত করতে গিয়ে হাসান বসরী (র) বলেছিলেন ঃ এমনভাবে ইল্‌ম হাসিল কর, যাতে তা ইবাদতে ইলাহীর পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে না দাঁড়ায় এবং ইবাদতে ইলাহীও এমন পদ্ধতিতে করো, যাতে তা ইল্‌ম হাসিলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। এখন একথা যখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, বান্দার জন্য ইল্‌ম ও ইবাদতে ইলাহী— এ দু'টোরই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তখন নিশ্চিতই ইল্‌মের স্থান আগে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা ইল্‌মই উৎস ও বুনিয়াদ

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত ফরমানের দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ

اَلْعِلْمُ اِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهٗ ـ

ইল্‌ম হলো আমলের ইমামস্বরূপ আর আমল হচ্ছে ইল্‌মের অনুসরণকারী। অতএব প্রকৃতপক্ষে ইল্‌মই মূল এবং ভিত্তি।

ইল্‌মের অগ্রাধিকারের দু'টি কারণ

দু'টি উপায়ে ইল্‌মকে ইবাদতে ইলাহীর উপরে স্থান দেয়া ওয়াজিব এবং জরুরী। প্রথমত, এর দ্বারাই ইবাদতের পথ নির্দিষ্ট করতে হয়। দ্বিতীয়ত, এর

দ্বারাই প্রতিবন্ধকতা ও বাধা সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে হয়। কেননা প্রথমে প্রকৃত মাবূদকে জানতে হবে, তারপর তাঁর ইবাদত ওয়াজিব ও জরুরী। যদি আল্লাহকে তাঁর আসমায়ে হুসনা, নির্দিষ্ট গুণাবলী এবং তাঁর প্রতি হক ও ওয়াজিবসমূহসহ জানতে না পারা যায়, তাহলে তাঁর ইবাদত কি করে সম্ভব?

কেননা অনেক সময় ইল্‌মের অভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে এমন ভ্রান্তিপূর্ণ আকীদার সৃষ্টি হয়, যার ফলে সমস্ত ইবাদত ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যায় (আল্লাহ্ এমন যেন না করেন)। এ সকল ভয়াবহ বিপজ্জনক বিষয় সম্পর্কে 'ইয়াহ্উল উলমুদ্দীন' গ্রন্থের 'বাবুল খওফ'-এ বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

যা হোক, অতঃপর তোমার জন্য আরও একটি বিষয় ওয়াজিব ও জরুরী মনে করবে। তা হলো, তোমার উপর যেসব বিষয় শরীয়ত অনুযায়ী ওয়াজিব, সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইল্‌ম হাসিল করবে এবং যেসব বিষয় আদায় করার হুকুম আছে তা যথাযথ পালন করবে। তাছাড়া যেসব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আছে, তা থেকে বিরত থাকবে।

এসব বিষয় ছাড়া ইবাদতে ইলাহীতে স্থির থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেননা তোমার জানাই নেই, তুমি কি করবে, কি সে জিনিস, কিভাবে তা আদায় করতে হয় আর কিভাবে পালন করা ওয়াজিব ও জরুরী।

তাছাড়া, কিসে গুনাহ হয়, কিভাবে তোমার কাজ গুনাহে পরিণত হয়—এসব জানা না থাকলে কি করে তুমি তা থেকে নিজেকে রক্ষা করবে? সুতরাং শরীয়ত অনুযায়ী ইবাদত, পবিত্রতা, নামায, রোযা— এ সবের আহকামসমূহ, শর্তাদি শিক্ষা করা প্রাথমিক কর্তব্য— ওয়াজিব। এসব ব্যাপার পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করার জন্য এটা অপরিহার্য নতুবা অনেক সময় এমনও হয় যে, বছরের পর বছর ধরে, যুগের পর যুগ ধরে একজন ইবাদত করে আসছে, কিন্তু তা এতটুকুও কবূলের যোগ্য হয়নি। কেননা তার ইবাদত ও পবিত্রতা হাসিলের পদ্ধতির কোনটিই সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেনি। অথচ তার ইবাদত যে এমনভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, একথাও সে জানতে পারছে না। আবার কখনো উপরিউক্ত বিষয়সমূহ পালন করতে গিয়ে মুশকিল দেখা দিতে পারে, অথচ তা

দূর করার পদ্ধতিও তোমার জানা নেই। এর ফলে সারা ব্যাপারটাই এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, তুমি আদৌ কিছু হাসিল করতে পারছ না। তদুপরি উপরিউক্ত ইবাদত ও আহকামসমূহের সাথে বাতেনী ইবাদতের সম্পর্ক সুগভীর। এ জন্য সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ ও তা হাসিল করাও জরুরী। বাতেনী ইবাদতের ফলে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় কতকগুলো উত্তম বৈশিষ্ট্য। যথা— তাওয়াক্কুল(নির্ভরশীলতা), তাফবীজ (সমর্পণ), রেযা (সন্তুষ্টি), সবর (ধৈর্য), তওবা এবং ইখলাস প্রভৃতি। পরবর্তীতে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর বিপরীত দিকগুলো হলো— অতি লোভ, রিয়া ও অহংকার। এগুলোর স্বরূপ জানা ও তা থেকে বিরত থাকাও তোমার জন্য জরুরী। কেননা এর সবই ফরয। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামে ও তাঁর প্রেরিত নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুখে যেসব বিষয় করতে বলেছেন এবং যা করতে নিষেধ করেছেন, তার সবই অবশ্য পালনীয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ *

وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ *

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ *

وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا *

যদি তুমি পূর্ণ ঈমানদার হও, আল্লাহ্র উপরই ভরসা করো।

(সূরা মায়িদাঃ ২৩)

আল্লাহ্ তা'আলার শোকর করো, যদি তুমি তাঁরই ইবাদত কর।

(সূরা বাকারা ঃ ১৭২)

এবং সবর করো, আর (মনে রেখো) আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত তুমি সবর করতে সক্ষম হবে না অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে ইখলাসের সম্পর্ক গড়ে তোল। (সূরা নাহল ঃ ১২৭)

এছাড়াও কালামে পাকে এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে। যেমন নামায, রোযা প্রভৃতি আদায় করার প্রেরণা দানকারী বহু আয়াত আছে। কিন্তু তুমি করছ কি, নামায ও রোযার প্রতি তো মনোযোগ দান করছই, কিন্তু ঐসব ফরয বিষয় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বসেছ। অথচ একই আল্লাহ্ তাঁর একই কিতাবে উভয় বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তুমি ওসব থেকে তো সম্পূর্ণ উদাসীনই হয়ে পড়েছ। এর কোন একটা বিষয়ও সে ব্যক্তির ন্যায় জানতে পারোনি, যার সকাল হয় তার প্রাপ্য অংশ নিয়েই। এমনকি, তুমি তো হালালকে হারাম আর হারামকেই হালাল বানিয়ে নিয়েছ। আর যে ব্যক্তি এমনভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে বর্ণিত উজ্জ্বল হিকমত ও হিদায়েতরূপী ইল্মকে ত্যাগ করেছে এবং হারাম কাজকে গ্রহণ করেছে, সে নিশ্চয়ই নিজেকে দোযখের ইন্ধন হিসেবে প্রস্তুত করছে। ওহে ইবাদতের তলবগার! তোমার কি এ জন্য ভয় হচ্ছে না যে, তুমি ওয়াজিবসমূহকে উপেক্ষা করে চলেছো? বরং ওয়াজিবসমূহের অধিকাংশ বাদ দিয়ে নফল নামায ও রোযায় মশগুল হয়ে পড়েছ – যার ফলে তোমার এ শেষোক্ত ইবাদতও তো অস্তিত্বহীনের পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হবে। আর অধিকাংশ লোকই তো এ পাপের যে কোন একটাতে লিপ্ত হতে থাকে। এর ফলে দোযখ ওয়াজিব হয়ে যায়। অধিকন্তু খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসার ক্ষেত্রেও সেসব উত্তম বিষয়কে ত্যাগ করে, যার দ্বারা আল্লাহ্'র নৈকট্য লাভ হয়। এমন অবস্থায় পৌছার পর তোমার মধ্যে কোন কাজের যোগ্যতা আর অবশিষ্ট থাকে না।

এ সবের চাইতেও গুরুতর ব্যাপার এই যে, আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ বৃদ্ধিই পায়, আর মানুষ আশার কুহকিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। অথচ আকাঙ্ক্ষা বস্তুটিই একটি পাপ। কিন্তু এতে পার্থক্য ধরতে না পারার এবং এর সাথে কতিপয় বিষয় জড়িত থাকার ফলে এটিকে মানুষ উত্তম ধারণার মধ্যে গণ্য করে। এমনিভাবে নানা অবস্থায় নিপতিত থেকেও মনে করে যে, বুঝি আল্লাহ্র সান্নিধ্যের আনন্দ লাভ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রিয়া ও দেখানো বিষয়কেই আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা আদায় মনে করতে থাকে অথবা মনে করে, এর দ্বারা মানুষকে উত্তম এবং নেক পথে আহবান করা হচ্ছে। ফলে আল্লাহ্র নিকট পাপকে নেকী মনে করে পেশ করা হয়। অধিকন্তু নিন্দা ও শাস্তির মকামে সওয়াবের আশায় প্রহর গোণে। এ সময় সে মস্তবড় ধোঁকা, মারাত্মক ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্র

কসম, ইল্‌ম ব্যতীত যারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত তাদের জন্য সত্যিই এটা মারাত্মক বিপদের স্থান— হতাশা এবং আফসোসের মকাম।

এর পরেও আছে সমস্ত জাহের ইবাদতের জন্য বাতেনী বিষয় সংশ্লিষ্ট। যেমন— ইখলাস এবং রিয়া, অহংকার ও বিনয় প্রভৃতি।

সুতরাং যে ব্যক্তি জাহেরী ইবাদতের সময় সকল বাতেনী দ্বন্দ্বের বিষয়কে উপেক্ষা করে চলবে এবং সেসব পরিহার করা এবং তা থেকে নিজের আমলকে নিরাপদ রাখার বিষয় চিন্তা না করেই এগিয়ে যাবে, তিনি তাঁর জাহেরী আমলকেও নিরাপদে রাখতে খুব বেশী সক্ষম হবেন না। বরং এমতাবস্থায় জাহেরী এবং বাতেনী— উভয় প্রকার ইবাদতই ধ্বংস হয়ে যায়। তখন তার হাতে বঞ্চনা ও অসন্তোষ ব্যতীত আর কিছুই বাকি থাকে না। এ ধরনের ক্ষতি মারাত্মক। এ জন্যই নবী আকরাম (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ نَوْمًا عَلٰى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلٰوةٍ عَلٰى جَهْلٍ -

ইল্‌ম হাসিলের পর নিদ্রা যাওয়া মূর্খতা নিয়ে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম।

কেননা ইল্‌ম ব্যতীত আমলকারী অধিক বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, মহানবী (সা) ইল্‌ম সম্পর্কে আরও বলেছেন ঃ এ জিনিসটি নেক-বখতকে দান করা হয় এবং বদ-বখতকে এ থেকে করা হয় বঞ্চিত। অর্থাৎ অবাধ্যতার প্রথম জিনিসটি হলো ইল্‌ম হাসিল না করা। সুতরাং এরপর যদি কেউ বিনা ইল্‌মেই ইবাদতের চেষ্টায় লিপ্ত হয়, তবে তার চাইতে অবাধ্যতা আর কি হতে পারে?

যে ইল্‌ম ও আমলের দ্বারা কোন উপকার হয় না, তা থেকে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করা উচিত। এ জন্যই সমগ্র মানবজাতির প্রতি উলামায়ে কিরাম, সাধক ও ইবাদত গোযারগণের অনুগ্রহ ও মেহেরবানী রয়েছে-- বিশেষ করে ইল্‌মের প্রতি প্রেরণা দানের ব্যাপারে; কেননা ইবাদতের ভিত্তি, তার পূর্ণতা ও আল্লাহ্‌ তা'আলার খেদমত সবকিছুই ইল্‌মের উপর নির্ভরশীল। দৃষ্টিসম্পন্ন ও তৌফিকমন্দ ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রও এটাই।

সুতরাং একথা যখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইবাদতে ইলাহী বান্দার করা উচিত এবং ইল্‌ম ছাড়া তা সঠিক ও নিরাপদভাবে করা সম্ভব নয়, তখন ইল্‌মকে ইবাদতের অগ্রে স্থান দান করা ওয়াজিব এবং জরুরী।

ইলমকে ইবাদতের আগে স্থান দেয়ার দ্বিতীয় কারণটি হলো এই যে, ফলপ্রসূ ইল্ম মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ ভীতি জাগ্রত করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ-

বস্তুত আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই তাঁকে ভয় করেন।

কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর মারেফত অনুযায়ী স্বরূপ চিনতে পারবে না, সে কিছুতেই আল্লাহ্র হায়বত ও জালাল মুতাবিক ভয় এবং মহত্ত ও উদারতা অনুযায়ী সম্মান করতে পারবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইল্মের দ্বারাই আল্লাহর মারেফত, আজমত এবং তাঁর প্রতি ভয় সৃষ্টি হতে পারে। ইল্মই সকল নেকীর প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন করে এবং সকল পাপে আল্লাহ্ প্রদত্ত তৌফিকের দ্বারা বাধা প্রদান করে।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের দ্বারা বান্দার এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যও নেই। সুতরাং ওহে আল্লাহ্র পথের অভিযাত্রী! আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের শুরুতেই তোমাকে হিদায়েত করুন। (মনে রেখো) ইল্ম হাসিল করা অবশ্য কর্তব্য— আর আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর রহমত ও করুণার দ্বার উন্মুক্ত করে ইল্ম হাসিলের তৌফিক দান করতে পারেন।

ইবাদতের জন্য ইল্ম

হযরত রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ-

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইল্ম হাসিল করা ফরয।

এখন তোমার জানা দরকার-- কোন্ ইল্ম হাসিল করা ফরয এবং ইবাদতে ইলাহীতে বান্দার জন্য কোন ইল্মের প্রয়োজন। মোটামুটি একটি কথা মনে রাখ, যেসব বিষয় হাসিল করা ফরয এবং জরুরী তা তিন প্রকার। যথা-- তওহীদ সম্পর্কিত ইলম, অন্তঃকবণ ও অন্তঃকরণের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত গোপন ইলম এবং শরীয়ত সম্পর্কিত ইল্ম।

এ তিন প্রকারের ইল্‌মের আবার প্রত্যেকটারই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হাসিল করা ফরয ও জরুরী। ইল্‌মে তওহীদের ততটুকুই হাসিল করা ফরয, যার দ্বারা তোমার দীনের মূলনীতি জানা হয়। দীনের মূলনীতি হলো ঃ তোমার একজন প্রকৃত মা'বুদ আছেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন; তিনি চিরঞ্জীব এবং এক, অদ্বিতীয়; তাঁর কোন শরীক নেই, সকল পরিপূর্ণ গুণে তিনিই গুণান্বিত এবং সকল প্রকার কমতি-দুর্বলতা বা ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তিনিই। মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রসূল, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আহকামসমূহের বর্ণনা এবং আখিরাতের ঘটনাবলী সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করেছেন তা সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য। তিনি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত।

অতঃপর তোমার জানা দরকার নবীজী (সা)-র সুন্নতের কিছু মূলনীতি। এটা জানা শুধু দরকারই নয়-- অপরিহার্যও। আর কালামুল্লাহ্ ও সুন্নতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে কোন কিছু যতক্ষণ পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে নিজের রায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। তা না হলে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টির আশংকায় পতিত হবে। তাছাড়া তওহীদের সমস্ত মূল বিষয় আল্লাহ্‌র কিতাবেই মজুদ রয়েছে। তদুপরি আমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানিগণ দীনের মূলনীতি সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, তাতেও এসব বিষয়ের প্রয়োজনীয় বিবরণ রয়েছে।

সারকথা, তুমি বিশেষভাবে মনে রাখবে যে, যে বিষয়েই তুমি নিজের অজ্ঞতার কারণে ধ্বংস থেকে নিরাপদ নও, তার ইল্‌ম হাসিল করা ফরয ও জরুরী— এটা পরিত্যাগ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নয়।

গোপন ইল্‌মের মধ্যে জরুরী হচ্ছে তার ওয়াজিবসমূহ, তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা। তা হলেই তুমি লাভ করবে এমন জিনিস যা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব অনুধাবনের বোধ, ইখলাস ও বিনীত ভাবসহ তোমার অন্যান্য নেক আমলকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখতে সক্ষম হবে। ইনশাআল্লাহ, সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা সামনের অধ্যায়গুলোতে করা হবে।

এখন অবশিষ্ট রইল ইল্‌মে শরীয়ত। ইল্‌মে শরীয়তের মধ্যে শিক্ষা লাভের জন্য জরুরী হলো ঃ তোমার উপর যেসব কাজ ফরয তা তুমি যাতে সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে পার, তজ্জন্য সে সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা। যেমন

পবিত্রতা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ। এসব কাজ যদি তোমার উপর ফরয হয়ে থাকে, তবে এসবের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করাও তোমার জন্য ওয়াজিব; নতুবা এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইল্ম হাসিল করা জরুরী।

মোটকথা, ইল্ম যে ফরয তা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং ইল্ম ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

এখন তুমি যদি জানতে চাও যে, আমার জন্য ইল্মে তওহীদের ততটুকু অংশ হাসিল করা কি ফরয, যার দ্বারা আমি ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত করে সমস্ত কাফির জাতিকে মিটিয়ে দিতে পারি এবং সকল প্রকার বিদ'আতের মূলোৎপাটন করে সুন্নতের রাস্তায় চলতে তাদের বাধ্য করতে সক্ষম হই?

মনে রেখো, ততখানি ইল্ম হাসিল ফরযে কিফায়া আর তোমার জন্য শুধু এতটুকু ফরয, যার দ্বারা দীনের মূলনীতিতে তুমি তোমার আকীদা রাখতে সক্ষম হও— এর অধিক কিছু নয়। তেমনি দীনের সকল শাখা-প্রশাখা এবং তার হাকীকত হাসিল করা এবং সকল মাস'আলার উপর দখল রাখা ফরয নয়। হ্যাঁ, যদি দীনের মূলনীতির মধ্যে কোনটায় তোমার সন্দেহ এসে যায়, যার ফলে তোমার আকীদায় সন্দেহ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তাহলে ততটুকু তথ্য তোমার তখন জানা ফরয হবে, যার দ্বারা তোমার সে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। তবে এসব ব্যাপারে বিতর্ক ও পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদ অবশ্যই পরিত্যাগ হওয়া উচিত। কেননা এ বিতর্ক একটা রোগ। এতে কোন ফায়দা নেই। নিজের উদ্যমকে এ থেকে দূরে রাখা দরকার। কারণ এতে যে একবার লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার জন্য নাজাত ও সাফল্য লাভ খুবই মুশকিলের ব্যাপার-- যদি না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অশেষ করুণা ও রহমত দিয়ে তাকে উদ্ধার করেন।

তাছাড়া আহ্লে সুন্নতের দাবিদারগণের ব্যাখ্যা দ্বারাই যখন সন্দেহ দূর হয়ে যেতে পারে, বিদ'আতীদের কথার জবাব পাওয়া যায়, ইলম শক্তিশালী হয় এবং আহলে হকদের অন্তর থেকে বিদ'আতীদের ধোঁকা দূরীভূত হয়, তখন এ জন্য অন্যদের পক্ষে তওহীদ সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন আর ফরয থাকে না। তেমনিভাবে সমস্ত ইলমের গূঢ় তত্ত্ব ও কলবের আশ্চর্যজনক সব কথা সম্পর্কেই জ্ঞান হাসিল জরুরী নয়। কিন্তু তা না জানা থাকায় তোমার ইবাদতে যদি শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তবে ফাসাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তখন তোমার সে সব

জানা জরুরী। আর তাছাড়া ইবাদতে ইলাহী যাতে সুষ্ঠুভাবে আদায় করা যায়, তজ্জন্য ইবাদত ও ইবাদত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হুকুম-আহকাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হাসিল অবশ্যই জরুরী। যেমন— হামদ ও শোকর এবং তাওয়াক্কুল। এছাড়া, অন্য কিছু সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল জরুরী নয়।

এখন আমাদের জানা দরকার, ইল্‌মে তওহীদের উপরিউক্ত পরিমাণ শিক্ষা কি ওস্তাদ বা শিক্ষক ছাড়াই সম্ভব? ওস্তাদ সাহায্য ও সহযোগিতাকারী হিসেবে কঠিন জায়গায় সহজ করে বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন। ফলে ওস্তাদের সাহায্যে ইল্‌ম হাসিল সহজ ও উত্তম হয়। অবশিষ্ট, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান, তার উপর ইল্‌মের বারি বর্ষণ করেন। আসলে আল্লাহ্ই প্রকৃত শিক্ষক।

মনে রাখতে হবে, ইল্‌মের ঘাঁটি অত্যন্ত সংকুল। এর দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এর উপকারের শেষ নেই। সেজন্য এ সংকুল ঘাঁটির অতিক্রমণও তেমনি কঠিন ও কষ্টসাধ্য।

এজন্যই দেখা যায়, বহু ব্যক্তি ইল্‌মের কঠিন কাজ থেকে দূরে সরে গেছে। ফলে তারা হয়ে গেছে মূর্খ, অজ্ঞ। আবার অনেকেই এ পথ অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেননি— পা পিছলে পড়ে গেছেন। অধিকাংশ ইল্‌ম হাসিলকারীই এতে অত্যন্ত পেরেশান ও ভয়ে এগিয়েছেন— আবার এমনও ব্যক্তি আছেন, যাঁরা অতি অল্প সময়ে এ ঘাঁটি পার হয়ে গেছেন। অপরপক্ষে, এমন অনেক ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা হয়তো জীবনের দীর্ঘ সত্তর বছর এ সংকুল ঘাঁটির মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছেন। মনে রাখতে হবে, সকল ব্যাপারই সাফল্য লাভের চাবিকাঠি সে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার হাতে।

ইল্‌মের উপকারিতা এতক্ষণ বর্ণনা করা হলো। তাতে প্রমাণিত হলো যে, বান্দার জন্য ইল্‌ম হাসিল কত প্রয়োজন, কত জরুরী? ইবাদত সম্পূর্ণ নির্ভর করে ইল্‌মের উপর-- বিশেষ করে ইল্‌মে তওহীদ ও গোপন ইল্‌মের উপর। বর্ণিত আছে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত দাঊদ (আ)-এর উপর ওহী নাযিল করে বললেন ঃ আয় দাঊদ! উপকারী ইল্‌ম হাসিল কর। হযরত দাঊদ (আ) আরয করলেন ঃ হে পরওয়ারদিগার! উপকারী ইল্‌ম কোনটা? জবাবে বলা হলোঃ

আমার (আল্লাহ্‌র) ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব, আমার উদারতা এবং সব বিষয়ের উপরই আমার শক্তি আছে— একথা উপলব্ধি করা। কেননা এসব বিষয়েই তোমাকে আমার নৈকট্য লাভে সহায়তা করবে।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি চাই না যে, বড় হয়ে আল্লাহ্‌র মারেফত হাসিলের আগে শৈশবেই আমি ইন্তেকাল করে জান্নাতে চলে যাই। কারণ মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচাইতে বেশি আল্লাহ্‌র মারেফত রাখে, সে-ই আল্লাহ্‌কে সবচাইতে বেশি ভয় করে, সবচাইতে অধিক ইবাদত করে এবং সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র রাস্তায় সবচাইতে বেশি চলতে সক্ষম।

ইল্‌মের কঠিন দিক হলো এই যে, শুধুমাত্র রেওয়ায়েত হাসিলেই তা যেন সীমাবদ্ধ না থাকে এবং বুদ্ধি ও মারেফতের অনুসন্ধান স্পৃহার উৎকর্ষ দানে সক্ষম হয়। তজ্জন্য ইল্‌মের অনুসন্ধানে নিজের নফস ইখলাসের শক্তি সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়। তাছাড়া ইল্‌ম হাসিলে আরও বহু বিপদাশঙ্কা থাকে। কেউ যদি নিজের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আমীর এবং বিত্তশালীদের মধ্যে স্থান করে নেয়া এবং মানুষের সাথে অহংকার প্রদর্শন ও দুনিয়ার অন্যান্য স্বার্থের জন্য ইল্‌ম হাসিল করে, তবে তার এ ব্যবসায়ে কোন লাভ হবে না-- তার সকল প্রচেষ্টা কেবল ক্ষতিই বহন করে আনবে। হযরত রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُفَاخِرَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِىَ السُّفَهَاءَ
اَوْ لِيَصْرِفَ بِهٖ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ -

যে ব্যক্তি এ জন্য ইল্‌ম হাসিল করে যে, তার দ্বারা আলিমদের সাথে দ্বন্দ্ব প্রকাশ করবে বা তার দ্বারা বেকুফদের সাথে ঝগড়া করবে কিংবা মানুষকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

আবূ ইয়াযিদ বোস্তামী (র) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি দীর্ঘ ত্রিশ বছর মুজাহাদায় কোশেশ করেছি। এর মধ্যে ইল্‌মের বিপদের চাইতে অধিক কোন কঠিন বিষয় পাইনি।

তাছাড়া, ইল্‌ম হাসিলের আরও একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। তা এই যে, শয়তান তোমার জন্য সৌন্দর্য পরিপূর্ণ জিনিস যোগাড় করে এনে তোমাকে

এলোমেলোতে ফেলে দেবে। সুতরাং যখন ইল্‌মে এসব বিপদ দেখা দেবে, তখনই তা পরিত্যাগ করবে। তাহলে এগুলো তোমাকে আর ধোঁকায় নিপতিত করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَطَّلَعْتُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ عَلَى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ

قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنَ الْمَالِ قَالَ لَا بَلْ مِنَ الْعِلْمِ -

শবে মি'রাজে দোযখের ধারে গিয়ে দেখতে পেলাম, অধিকাংশ দোযখীই ফকীর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ আয় আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কি অর্থের দিক থেকে ফকীর? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ না, ইলমের দিক থেকে ফকীর।

সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করবে না, তার পক্ষে ইবাদতের আহকাম পালন করতে যাওয়া মোটেই শোভা পায় না। সে কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে ইবাদতের হক আদায় করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আসমানের ফেরেশতার ন্যায় বিনা ইল্‌মেই আল্লাহ্‌র ইবাদত শুরু করবে, তাকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যেই পরিগণিত করা হবে।

ইল্‌ম হাসিলের জন্য অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে একাগ্রতা ও উদ্যমের সাথে চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে আলস্য ও নৈরাশ্য সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। নতুবা (আল্লাহ না করুন) তোমার জন্য মূর্খতার সীমা অতিক্রম করাই সম্ভব হবে না। স্পষ্ট কথা এই যে, যখন তুমি সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করবে, তখন তুমি পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারবে যে, তোমার, আমার--সকলের জন্যই একজন প্রকৃত স্রষ্টা আছেন, যিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি চিন্ময়, দ্রষ্টা ও সব কিছুই শুনতে পান, তিনি সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে। তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মখলূকের কোন জিনিসের সাথে তাঁর তুলনা হতে পারে না কিংবা তাঁর দ্বারাও মখলূকের জিনিসের তুলনা করা যায় না। তিনি অভাবহীন, কোন কিছুরই তাঁর প্রয়োজন নেই। যে কোন প্রকারের পংকিলতা ও প্রতিবন্ধকতা তাঁর সংশ্লিষ্ট হতেই পারে না।

তেমনি যখন তুমি রসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযা, নির্দশন ও নবূওতের আলামতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করবে, তখন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবে যে, তিনি সত্যিই আল্লাহ্‌র রসূল। ওহীর বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সত্যবাদী ও আমীন এবং যেসব বিষয়ে সলফে সালেহীন আকীদামন্দ, তার সবই সত্য। তা এই যে,

আখিরাতে মুসলমানগণ আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যতের দীদার লাভ করবেন, আল্লাহ্ বিদ্যমান এবং তিনি কোন কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। আল-কুরআন আল্লাহ্র কালাম এবং তা মখলূক নয়।

আর যেহেতু আল্লাহ্র রাজ্য ও তাঁর শাসন বিধানে কোন ধোঁকাবাজের ধোঁকা এবং কোন বাধাদানকারীর বাধা কোন কাজেই আসে না, কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও কুদরতেই সবকিছু পরিচালিত হয়, তাঁর নিকট থেকেই ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, ঈমান-কুফর সব কিছুর আগমন হয় এবং আল্লাহ্র মখলূকে তিনি ব্যতীত কারো কিছু করার সাধ্য নেই। সুতরাং তিনি যাকে চান, সওয়াব ও অনুগ্রহ এবং রহমত দান করেন, যাকে চান, শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত করেন। এটাও সাধিত হয় তাঁরই ন্যায় বিচারানুযায়ী আর রসূলুল্লাহ (সা)-এর পাক জবানে আখিরাতের বিষয় সম্পর্কে যেসব আহকাম প্রকাশ পেয়েছে তার সবই সত্য। সুতরাং সেগুলোকে অটুট বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে হবে। যেমন হাশর-নশর, কবরের আযাব, মুনকির-নকীরের সওয়াল-জওয়াব, আমলের জন্য মীযান এবং পুলসিরাত। সলফে সালেহীন এসব বিষয়ে পূর্ণ আকীদামন্দ ছিলেন এবং তাঁরা এগুলোকে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাসের জন্য উৎসাহিতও করে গেছেন। তাছাড়া, এসব মূল বিষয় সম্পর্কে কোন প্রকার 'বিদ'আত' প্রকাশ পাওয়ার আগেই এগুলোর উপর 'ইজমা'ও (যুগের উলামাদের সর্বসম্মত রায়) হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা আল্লাহ্র দরবারে এই মুনাজাত করছি, তিনি যেন দীনের ব্যাপারে কোন 'বিদ'আত' উদ্ভাবন ও নিজের আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করার ন্যায় কাজ থেকে আমাদের মুক্ত রাখেন।

এরপর তুমি 'আমলে কলব' এবং নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করবে এবং যেসব বিষয়ে এ ব্যাপারে অতি জরুরী তা হাসিল করবে যথা পবিত্রতা, নামায, রোযা ইত্যাদি। অতঃপর তুমি তোমার উপর যা কিছু দায়িত্ব আরোপিত আছে, তা আদায় করবে। মনে রাখবে, মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের দৃঢ় বিশ্বাসী উলামাগণ এভাবেই এ পথে আমল করে আসছেন। সুতরাং তুমি ইল্ম মুতাবিক আমল কর এবং আখিরাতের ভিত্তি নির্মাণের প্রতি মনোযোগী হও, তাহলে তুমি আল্লাহ্ তা'আলার আহকাম সম্পর্কে পূর্ণ দূরদৃষ্টিসহ একজন আলিম বান্দা হিসেবে আমলকারীদের মধ্যে পরিগণিত হতে সক্ষম হবে— অন্ধ অনুসরণ ও নিষ্প্রাণ আমলের সাথে তোমার কোনই সম্পর্ক থাকবে না।

এমতাবস্থায় তোমার জন্য মহান মর্যাদা তোমার ইলমের মহামূল্য এবং তোমার ইবাদতের জন্য অশেষ সওয়াব নির্ধারিত হবে অর্থাৎ এখন তুমি সকল সংকট অতিক্রম করে ফেলেছ এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত তৌফিকের দৌলতে তোমার উদ্দেশ্য পুরোপুরি হাসিল করেছ।

পরিশেষে, আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত করছি, তিনি যেন আমাদের তাঁর নেক তৌফিক দান করেন। কেননা তিনিই তো পরম করুণাময়।

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

তওবার মকাম

আল্লাহ্‌র ইবাদতে যিনি মশগুল হতে চান, তাঁকে অবশ্যই তওবা করে নিতে হবে। ইবাদতে ইলাহীতে মশগুল হওয়ার জন্য তওবা জরুরী ও অতীব প্রয়োজনীয়। দুটো কারণে এ তওবার প্রয়োজন হয়। প্রথমত, গুনাহ্ মানুষকে দুর্ভাগ্য ও বঞ্চিত অবস্থায় নিপতিত করে, অতঃপর তা দুর্ভোগ ও অপমানের দিকে ঠেলে দিতে থাকে। শুধু তাই নয়, গুনাহ্‌র আকর্ষণ মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে ও তাঁর ইবাদতে এগিয়ে যেতে বাধার সৃষ্টি করে। কেননা গুনাহ্‌র বোঝা বান্দাকে এমনি অবস্থায় পৌঁছিয়ে দেয় যে, সে তা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র পথের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া, গুনাহ্ মানুষের কলবকে কালো করে দেয়, ফলে তার অন্তরে জুলমাত আর পাষাণত্ব ঘাঁটি স্থাপন করে। অতঃপর তার মধ্যে সততা, হৃদয়বত্তা ও আল্লাহ্‌র পথে চলার স্বাদ ও মধুরতা উপভোগের ক্ষমতাও আর অবশিষ্ট থাকে না। এ সময় তার উপর যদি আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়া বিরাজমান না থাকে, তবে সে কুফরী ও কহরের চরম অবস্থায় নিমজ্জিত হতে থাকে। আর এ তো চরম তাজ্জবের বিষয় যে, যে ব্যক্তি কুফরী ও কহর অবস্থায় নিপতিত, সে কি করে ইবাদতে ইলাহীর তৌফিক হাসিল করবে; যে ব্যক্তি গুনাহর পংকিলতায় নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে, সে কি করে ইবাদত ও খেদমতের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে? তেমনি যে ব্যক্তি পাপ-পংকিলতার ঘৃণ্য অবস্থায় পতিত হয়েছে, তার পক্ষেই বা মুনাজাতে ইলাহী কি করে করা সম্ভব?

রসূলুলাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَ كَذِبَ الْعَبْدُ تَنَحَّى عَنْهُ الْمَلَكَانُ مِنْ فَمِ مَا خَرَجَ مِنْ فِيْهِ -

বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন তার হেফাজতকারী ফেরেশতাগণ তার মুখ নির্গত দুর্গন্ধ সইতে না পেরে দূরে চলে যায়।

এরপর সেই জবানের কি আর আল্লাহ্‌র যিকিরের যোগ্যতা থাকে? গুনাহতে লিপ্ত ব্যক্তি তো আল্লাহ্‌র সেই তৌফিকের নিকটবর্তীও হতে সক্ষম নয়, যার

দ্বারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য তার কাজে সাহায্য হতে পারে। আর যদি তৌফিক হাসিলও হয়, তবুও তা বিশেষ কার্যকর হয় না। কেননা তার মধ্যে সততা ও ইবাদতের স্বাদ গ্রহণের যোগ্যতাই তো বিদ্যমান নেই। পাপে লিপ্ত হওয়া এবং তওবা না করার জন্যই মানুষকে এতো সব দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসাত্মক জিনিসের সম্মুখীন হতে হয়। এ জন্যই কোন এক ব্যক্তি ঠিকই বলেছেন ঃ

'তুমি যখন রাতে ইবাদত ও দিনে রোযা রাখার শক্তি পাবে না, তখন বুঝে নেবে যে, তুমি কমজোর এবং আলসে হয়ে গেছ— তোমার গুনাহ্‌ই তোমাকে এমন কমজোর করে দিয়েছে এবং এতসব অবাঞ্ছনীয় বিষয়ের সম্মুখীন করেছে।'

তোমার ইবাদত যাতে কবূল হয় সেজন্যও তওবা জরুরী। তওবার প্রয়োজনীয়তার এটা দ্বিতীয় কারণ। কেননা যে ব্যক্তির নিকট তুমি ঋণী সে তোমার উপঢৌকন কবূল করবে না। তাছাড়া গুনাহ্ করলে তা স্বীকার করা ও তজ্জন্য তওবা করা ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য। আর, অন্যান্য ইবাদত হলো নফল। সুতরাং যতক্ষণ তুমি ফরযরূপী ফরযকেই আদায় কর নাই, তখন কি করে তুমি আশা করতে পার যে, উপঢৌকনরূপী তোমার নফল ইবাদত কবূল হবে?

অতএব যারা হালাল ও জায়েয কাজকে পরিত্যাগ করে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত রয়েছে, তারা কি করে আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করবে? তিনি যখন তোমার প্রতি নারায (আল্লাহ্ যেন এমন না করেন), তখন মুনাজাতে লিপ্ত হয়ে কি ফায়দা? যারা সব সময় গুনাহ্‌তে লিপ্ত থাকে, তাদের অবস্থাই এমন হয়ে থাকে।

তওবার অর্থ ও শর্তাবলী

যদি জানতে চাও যে, তওবায়ে নসূহর অর্থ কি এবং তার সংজ্ঞাই বা কি? আর গুনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য কি করা দরকার?

তাহলে আমি বলব, তওবা হচ্ছে কলবের একটি প্রক্রিয়ার নাম। উলামায়ে কিরামের মতে, এটা হাসিল হলে মানুষ গুনাহ্ থেকে পবিত্র ও মুক্ত হয়ে যায়। আমাদের শায়খ (র) তওবার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব জাগ্রত হওয়া এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য পূর্বে গুনাহ্ বলতে যা কিছু হয়ে গেছে তাতে পুনরায় লিপ্ত না হওয়াই তওবা।

তওবার শর্ত চারটি

প্রথম শর্ত ঃ গুনাহ্তে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা অর্থাৎ মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করবে যে, কিছুতেই আর এ গুনাহ্তে লিপ্ত হবে না। নিজের এ মতকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেউ গুনাহ্ হয়তো পরিত্যাগ করলো, কিন্তু মনে এমন একটা ভাব থাকলো যে, পুনরায় তাতে লিপ্ত হবে অর্থাৎ নিজের মতের উপর দৃঢ়তা নেই, বরং সন্দেহ ও আশঙ্কা বিরাজমান কিংবা এমন একটা ভাব আছে যে, পুনরায় তাতে লিপ্ত হতেও পারে, তবে তাকে বলতে হবে তিনি গুনাহ্ থেকে বিরত থাকছেন ঠিকই, কিন্তু তার তওবা হলো না। অর্থাৎ এ অবস্থায় তিনি তওবাকারী বলে পরিগণিত হবেন না।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ যে ধরনের গুনাহ্ পূর্বে হয়ে গেছে, তা থেকেই তওবা করবে। যে গুনাহ্তে কখনো লিপ্ত হয়নি, তা থেকে তওবা করলে তাকে তওবা বলা হবে না। এ ধরনের তওবাকারীকে 'মুত্তাকী' বলে পরিগণিত করা হবে।

যেমন রসূলুল্লাহ (স)-কে متقى عن الكفر অর্থাৎ 'কুফর থেকে পরহিযগার' বলা সঠিক ও জায়েয হবে, কিন্তু তাঁকে 'কুফর থেকে তওবাকারী' বলা কিছুতেই জায়েয হবে না। কারণ তাঁর থেকে কোনক্রমেই কুফরীর লেশমাত্রও প্রকাশ পায়নি। তবে হযরত উমর (রা)-কে 'কুফর থেকে তওবাকারীর' মধ্যে পরিগণিত করা যেতে পারে। কেননা তাঁর থেকে এটা প্রকাশ পেয়েছিল।

তৃতীয় শর্ত ঃ এখন যে গুনাহ্তে লিপ্ত হওয়াকে পরিত্যাগ করছে, তার সাথে তার দ্বারা আগে যা সাধিত হয়েছে, তার গুরুত্ব ও মরতবা সমান হতে হবে, আকৃতিগত সামঞ্জস্য থাকলেই চলবে না। যেমন একজন অতি বৃদ্ধ যার থেকে যিনা ও পথভ্রান্তির গুনাহ্ হয়ে গেছে, সে যদি তওবা করতে চায়, তবে তা অবশ্যই হাসিল হবে। কেননা তওবার দরজা তার জন্য বন্ধ হয়নি। তদুপরি যিনা ও পথভ্রান্তিতে লিপ্ত হওয়াকে সে 'পরিত্যাগ' করতেও সমর্থ নয়। কারণ এ সময় সে তা করতেই পারছে না। সুতরাং এ ইখতিয়ারকে পরিত্যাগের বিষয়টিও তার কর্তৃত্বে নয়। এ ক্ষেত্রে তাকে এ গুণেও গুণান্বিত করা যায় না যে, সে এ কাজ পরিত্যাগ করছে বা তা থেকে বিরত থাকছে। আদতে এসব কাজে লিপ্ত হওয়ার সামর্থ্যই তো তার নেই। এ ব্যাপারে তার ক্ষমতাই নেই। তবে সে সঙ্গে তার এমন কতগুলো কাজ করার ক্ষমতা আছে, মরতবা ও গুরুত্বের দিক থেকে যা

যিনা এবং পথভ্রান্তির সমান। যেমন— মিথ্যা অপবাদ, গীবত ও চোগলখুরী। এসবও মারাত্মক গুনাহ্‌র কাজ। যদিও গণনার দিক দিয়ে এগুলো ভিন্ন তথাপি এসব গুনাহ্‌র অংশসমূহ একটি মহাপাপের স্থলাভিষিক্ত। অবশ্য তা বিদ'আতের চাইতে মরতবায় নিচে। কেননা বিদ'আত কুফর ও শিরকের নিচের পর্যায়ের গুনাহ্। যা হোক, যিনা ও পথভ্রান্তি যাবতীয় পূর্ব গুনাহ্ (যদিও তার পক্ষে বাস্তবে সে গুনাহ্‌র নজীর পেশ করা বর্তমানে সম্ভব নয়) থেকে তওবা জায়েয হবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব উপলব্ধি, তাঁর অসন্তুষ্টি ও ভয়াবহ আযাব থেকে পরিত্রাণই গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া চাই। দুনিয়ার কোন লোভ, সামাজিক ভয় বা সামাজিক শাস্তির আশঙ্কা কিংবা নফসের দুর্বলতা বা মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য অথবা ফকিরীর কারণে করলে হবে না।

এগুলো তওবার শর্ত ও আরকান। সুতরাং এসব পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালিত ও পূর্ণাঙ্গ হাসিল হলে তবেই বুঝতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে এটাই খাঁটি তওবা।

তওবার প্রারম্ভিকা

তওবার প্রারম্ভিক হিসেবে তিনটি কাজ করতে হয়। প্রথমত, পাপের সর্বাপেক্ষা মন্দ দিকটি নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের ভয়াবহতা বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির এমন পর্যায়টিকে স্মরণ করবে যা সহ্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য কোন মানুষেরই নেই। তৃতীয়ত, নিজের দুর্বলতা ও স্বল্পস্থায়ী জীবনের কথা স্মরণ করবে। মনে করবে, যে মানুষ সূর্যের উত্তাপ, শীতের প্রকোপ এবং পিপীলিকার দংশন পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না, সে কি করে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক দোযখের আযাব এবং ফেরেশতাদের নির্মম প্রহার সহ্য করতে সক্ষম হবে? অথচ সেই দোযখের মধ্যে যে সর্প দংশন করবে, তার এক-একটার আকার হবে উটের ন্যায়, যে বিচ্ছু দংশন করবে, তার এক-একটার আকৃতি হবে গাধার ন্যায়। দোযখের অগ্নির সর্বাপেক্ষা তীব্র দহন অবস্থা থেকে এ সকল জীব সৃষ্টি করা হয়েছে।

যখন তুমি এ সকল বিষয়ে চিন্তার দিকে অগ্রসর হয়ে থাকবে এবং রাতদিন সর্বক্ষণ এগুলো স্মরণ রাখতে সক্ষম হবে, তখন তুমি খাঁটি তওবা লাভ করতে পারবে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, লজ্জা ও অনুতাপ তওবার পদক্ষেপ। অথচ তওবা সম্পর্কে উপরোল্লিখিত শর্তাদির মধ্যে তো তা অন্তর্ভুক্ত করা হলো না?

এ ব্যাপারে প্রথমত একটি বিষয় খুবই উত্তমভাবে লিপিবদ্ধ করা দরকার যে, অনুশোচনা বান্দার করায়ত্তেই নয়। অবশ্য অনেক সময় কতিপয় মানসিক কারণে অনুতাপ-অনুশোচনা এসে যেতেও পারে এবং সে হয়তো উক্ত পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য চেষ্টাও করতে পারে।

কিন্তু তওবার ব্যাপারটিই আলাদা। এটা মানুষেরই সামর্থ্যের অধীন। সে ইচ্ছা করলে এ কাজটা সমাধা করতে পারে। তাছাড়া একথা তো সবারই জানা যে, গুনাহ্‌র পর যদি অনুতাপ-অনুশোচনা আসেও তাতে মানুষের নিকট তার মর্যাদার বিলুপ্তি হয় না। কিংবা তার কোন আর্থিক লোকসানও হয় না। সুতরাং এটা কিছুতেই তওবা নামে অভিহিত হতে পারে না। তাছাড়া, একথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উক্ত হাদীসের অর্থ অন্যরূপ, শব্দানুযায়ী বাহ্যত যা উপলব্ধি করা সম্ভব নয় তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও তাঁর আযাবের ভয়েই অনুশোচনা হওয়া উচিত (তওবায়ে নসূহ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে)। কারণ এটি তওবাকারীদের গুণ ও হালতেরই অন্তর্ভুক্ত। তওবার প্রারম্ভিকায় যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা যখন স্মরণ করবে তখন সে অবশ্যই অনুতপ্ত হয়ে পড়বে। এই অনুতাপ গুনাহ্‌তে লিপ্ত হওয়া থেকে তাকে বিরত থাকতে বাধ্য করবে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের জন্য এ অনুশোচনার প্রভাব তার অন্তরে বিদ্যমান থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তওবার গুণাবলীর ও তওবাকারীর গুণাবলীর মধ্যে এসব বিষয় এসেই পড়ে। রসূলুল্লাহ (সা) এ জন্যই তাকে তওবা বলে অভিহিত করেছেন।

মোটকথা, এসব বিষয় আল্লাহ্ প্রদত্ত তৌফিক অনুযায়ী খুব ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

এরপর আরও একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামাহু আলায়হিম যাঁদের থেকে কখনো ছোট বা বড় কোন রকমের গুনাহ্ই সাধিত হয়নি, তাঁরাও এমন উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নে উলামায়ে কিরাম একমত নন। তাহলে সাধারণ একজন মানুষ কি

করে তা হাসিল করতে পারবে? অথচ নবীগণই তো আল্লাহ্‌র মখলূকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

এর জবাব এই যে, এ জিনিসটি মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে অসম্ভব নয়, বরং সহজ। তবে রাব্বুল ইয্‌যত তাঁর অনুগ্রহ অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে তাকে এ মর্যাদা দান করেন।

তওবার আরও একটি শর্ত এই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পাপেই আর লিপ্ত হতে পারবে না। তবে যদি ভুলক্রমে কিছু হয়ে যায় আল্লাহ্ তা'আলা তা তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার দ্বারা মাফ করে দেবেন। মনে রাখবে, এ শর্তটি পালন করাও কঠিন কিছু নয়, যদি আল্লাহ্ তৌফিক দান করেন।

পুনরায় পাপে লিপ্ত হতে পারবে না, এ কারণে যদি কেউ মনে করে যে, আমার দ্বারা তওবাই সম্ভব নয়। কারণ নিজের নফসের খবর আমার জানা আছে, তওবার উপর দৃঢ় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, আমি হয়তো পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ব। সুতরাং তওবা করে আমার কি লাভ? তাহলে মনে রাখবে, এটা হচ্ছে শয়তানের ধোঁকা।

পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়

পাপ তিন প্রকারের ঃ প্রথমত, আল্লাহ্‌র ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করা— যথা নামায, রোযা, যাকাত, কাফ্ফারা। যতদূর সম্ভব এ সকল আদায় করা দরকার।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে যা সংঘটিত হয়-- যথা মদ্যপান, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, সূদ খাওয়া ইত্যাদি। এসব কাজে লিপ্ত হলে পরক্ষণেই অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং পুনরায় যাতে তাতে লিপ্ত না হতে হয়, তজ্জন্য মনকে দৃঢ় করা দরকার।

তৃতীয়ত, মানুষের পরস্পরের উপর পরস্পরের যে হক আছে, সে ব্যাপারে পাপে লিপ্ত হওয়া। এ পর্যায়টি বড় কঠিন ও মারাত্মক।

শেষোক্ত পর্যায়ের পাপ আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। কখনো এ পর্যায়ের পাপ আর্থিক ব্যাপারে সংঘটিত হয়। আবার কখনো জীবন, মান-ইয্‌যত ও ধর্মের ব্যাপারে সংঘটিত হয়। যদি বিষয়-সম্পদ সম্পর্কিত কোন কাজ হয়, তবে সে মাল ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি কেউ দারিদ্র্য ও সহায়-সম্বলহীনতার জন্য মাল ফিরিয়ে দিতে না পারে তবে এ জিনিস তারই থাকবে। যদি মালের মালিক

অনুপস্থিত বা ইন্তেকাল করে থাকে, তবে সদকা করতে পারলে সদকা দিতে হবে। সদকা-খয়রাত করার সামর্থ্যও যদি না থাকে, তবে অধিক নেকী করে আল্লাহ্‌র সামনে সেজন্য অনুশোচনা করবে, যাতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয়।

আর যদি কোন মানুষের নিজের হক সংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারে তোমার দ্বারা অন্যায় সাধিত হয় তবে তাকে অথবা তার প্রতিনিধিদের কাউকে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেবে, যাতে অন্যায়ের বদলা নিতে পারে অথবা মাফ করে দেয়ার সুযোগ পায়। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহ্‌র দরবারে আহাজারী করবে, কিয়ামতের দিন যাতে আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তিকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করিয়ে দেন। ইয্‌যত ও মর্যাদা সম্পর্কিত কোন কিছু যদি হয়ে যায়-- যেমন তুমি কারো গীবত করলে কিংবা কারো উপর অপবাদ দিলে অথবা কাউকে গালিগালাজ করলে-- এ ক্ষেত্রে তুমি যার সামনে এ কাজ করেছ, তার সামনেই আবার তোমাকে তার অসত্যতা প্রমাণিত করে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে জানাতে হবে এবং যদি সামর্থ্যে কুলায় তবে তোমার সেই সঙ্গী ব্যক্তির নিকট থেকে তাকে মাফ করিয়ে নেবে-- অবশ্য যদি এতে কোন ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। যদি ঝগড়া-ফ্যাসাদের ভয় থাকে, তবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সব কিছু জানিয়ে রাখবে এবং নিজের সঙ্গীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন এবং তার বদলে দান করেন অসংখ্য পুণ্য।

এর পরে আসে সম্মানহানি বা সতীত্বহানির প্রশ্ন। যে ব্যক্তির পরিবার পরিজনের সাথে এ ব্যাপারে কোন খেয়ানত হয়ে যায়, তার নিকট বিষয়টি অবশ্য প্রকাশ করা বা তার থেকে মাফ নেয়ার উপায় থাকে না। কারণ এতে ফিতনা-ফাসাদ দেখা দেয়ার আশঙ্কা বেশি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিকট সব বিষয় প্রকাশ করে তার জন্য দোয়া করা দরকার, যাতে আল্লাহ্ পাক তাকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন এবং বদলে তাকে দান করেন পুণ্য। আর যদি ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে তার নিকট থেকে মাফ নেয়া দরকার। তবে শেষোক্ত পরিবেশ খুব কমই পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যদি কোন পদস্খলন হয়, যেমন তুমি যদি কাউকে বিদ'আতী, গোমরাহ প্রভৃতি বলে অভিহিত কর, তবে এ পাপ থেকে পরিত্রাণ

লাভ খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে তুমি যার সামনে এ ধরনের মন্তব্য করেছ, তারই সামনে নিজেকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করবে। যদি সামর্থ্য থাকে, তোমার সঙ্গীর থেকে মাফ করিয়ে নেবে নতুবা আল্লাহ্ পাকের সামনে অনুতপ্ত মনে আহাজারী করবে, যাতে তিনি তোমার প্রতি সে ব্যক্তিকে রাযী কবিয়ে দেন।

সারকথা এই যে, এ সকল ক্ষেত্রে যার হক নষ্ট হবে, তাকে যদি সন্তুষ্ট করার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকে, তবে তা-ই করতে হবে। নতুবা আল্লাহ্ পাকের নিকট বিনয়, নম্রভাব ও অনুশোচনা এবং দান-খয়রাতের সাথে বিষয়টি পেশ করবে, যেন আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তিকে তোমার প্রতি রাযী করিয়ে দেন। আল্লাহর ইচ্ছায়ই এসব বিষয় কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে।

সাথে সাথেই আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহ ও সীমাহীন করুণা সম্পর্কে গভীর আশাবাদী থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ্ পাক যখন বান্দার সততার পরিচয় পাবেন, তখন তিনি যার হক নষ্ট করা হয়েছে, স্বীয় করুণাধারায় সিক্ত করে তাকে রাযী করিয়ে দেবেন। এতে তারও উত্তম হক আদায় হয়ে যাবে। এসব বিষয়কে অপরিহার্য মনে করা উচিত।

মোটকথা, উপরিউক্ত বর্ণনা অনুযায়ী যদি কেউ আমল করে এবং ভবিষ্যতে সে পাপে পুনরায় লিপ্ত হওয়া থেকে মনকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়, তবে সকল গুনাহ্ থেকেই পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু যদি কেবল মনকে আয়ত্তে আনা হলো, আর উপরিউক্ত বিষয়গুলো পালন করা হলো না, যার হক নষ্ট হয়েছে তাকেও রাযী করা হলো না, তাহলে সেই পাপের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তবে হ্যাঁ, সকল গুনাহ্ থেকেই পরিত্রাণ লাভ সম্ভব কিন্তু এখানে এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নয়। কারণ কিতাবের আয়তন বেড়ে যাবে।

যদি কারো এ সকল বিষয় জানার গভীর আগ্রহ থাকে, তবে তিনি 'কিতাবুত্তাওবা' 'কিতাবুল কুরবাতু ইলাল্লাহি তা'আলা' 'আলগায়াতুল কাসওয়া' 'ইয়াহয়াউল উলূমুদ্দীন' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করতে পারেন। এগুলো পাঠ করলে অত্যন্ত উপকার সাধিত হবে এবং বহু অভাবিতপূর্ব ও রহস্যপূর্ণ বিষয় জানতে পারবেন। কিন্তু এখানে যতটুকু বর্ণিত হলো, তা অবশ্যই আমল করতে হবে। কারণ এছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

তওবায়ে নসূহ

অতঃপর আর একটি বিষয় খুব ভালভাবে জেনে রাখতে হবে। যে ঘাঁটিটি অত্যন্ত কঠিন, এটা অতিক্রম অত্যন্ত ক্লেশপূর্ণ। এখানে সাফল্য লাভ করতে পারলে যেমন আজিমুশ্‌শান মরতবা হাসিল হয়, তেমনি ব্যর্থতায় ভীষণ ক্ষতির কারণও হয়।

আমি ওস্তাদ আবূ ইসহাক আল-আসফেরায়নীর (তিনি একজন গভীর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ও ইবাদতগোযার ব্যক্তি) নিকট থেকে শুনতে পেয়েছি-- তিনি বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট ত্রিশ বছর ধরে মুনাজাত করছিলাম তওবায়ে নসূর তৌফিক দানের জন্য। অতঃপর আমি মনে মনে তাজ্জব হলাম যে, সুবহানাল্লাহ্! ত্রিশ বছর আল্লাহ্ পাকের দরবারে একটি মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য মুনাজাত করলাম, তাও কবূল হলো না। এ সময় আমি দেখতে পেলাম,(স্বপ্নে যেমন মানুষ দেখতে পায়) একজন আমাকে উদ্দেশ করে বলছেন, "এতেই তুমি তাজ্জব হয়েছ, তুমি কি বিবেচনা করে দেখেছ যে, তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কি জিনিসের প্রত্যাশা করছ? তুমি তো আদতে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসাই কামনা করছ! কারণ তুমি কি জান না , আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্ পাক অবশ্যই তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।' তুমি কি সেই সব ইমামের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যারা মনের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য কত যত্নবান এবং আখিরাতের প্রস্তুতির ব্যাপারে কত ব্যস্ত?"

তওবার ব্যাপারে বিলম্ব করায় যে ভীষণ ক্ষতি সাধিত হয়, তা বর্ণনাতীত। গুনাহ্‌র শুরুই হয় ধ্বংস ও কাঠিন্যের মাধ্যমে, আর পরিণামে ডেকে আনে সীমাহীন বঞ্চনা আর দুর্ভাগ্য। ইবলিসের ব্যাপারটিকেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। কেননা এতদুভয়েরই কাজের শুরু ছিল কেবল দুনিয়ায়, আর পরিণতি লাভ করেছে কুফরীতে। ফলে তারা চিরদিনের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

সর্বদা সচেতন থাকবে। তোমার এ প্রচেষ্টায় হয়তো বা তোমার মন নিষ্কলুষ হয়ে যাবে, হয়তো বা তোমার কাঁধ থেকে সকল গুনাহ্‌র ভার নেমে পড়বে। মনে রেখো, গুনাহ্‌র ফলে তোমার মনে কাঠিন্য সৃষ্টি হতে পারে। এ ব্যাপারেও তুমি সতর্ক থাকবে। সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ গুনাহ্ দ্বারাই হৃদয়

কালিমালিপ্ত হয়। আর হৃদয় কালিমালিপ্ত হওয়ার নিদর্শন এই যে, এ অবস্থায় পাপে কোন ভয়ের উদ্রেক হবে না। আল্লাহ্ পাকের পথে চলার কোন সুযোগই সে গ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত হবে না এবং কোন প্রকার নসীহতই মনের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে না।

কোন গুনাহ্‌কে ছোট জ্ঞান করো না। যেন এমন না হয় যে, নিজেকে তুমি তওবাকারী ভাবছ, আসলে পড়ে আছ কবীরা গুনাহ্‌র মধ্যে।

আবূ আবদুল্লাহ্ বিন আল-হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার দ্বারা একটি গুনাহ্ হয়েছিল, সে জন্য আমি চল্লিশ বছর ধরে সব সময় ক্রন্দন করে আসছি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আয় আবূ আবদুল্লাহ। কি গুনাহ্ হয়েছিল।

তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার এক ধর্মীয় ভ্রাতা একদা আমার সাথে মোলাকাত করতে আগমন করেন। আমি তাঁর জন্য মৎস্য খরিদ করি। অতঃপর উভয়েই তা আহার করি। আহারের পর আমি আমার এক প্রতিবেশীর দেয়ালের নিকট দাঁড়িয়েছিলাম। অতঃপর সেই দেয়াল থেকে একটু মাটি নিয়ে তাতে আমার হাত পরিষ্কার করেছিলাম। সুবহান আল্লাহ্!

সুতরাং সকলেই নিজ নিজ নফসের সাথে বোঝা-পড়া ও হিসাব-নিকাশে লিপ্ত হও। তওবার প্রতি এগিয়ে যাও অতি দ্রুত। কারণ কখন মৃত্যু আসবে, কারো তা জানা নেই। দুনিয়া একটি ধোঁকা মাত্র। মনে রাখবে, নফস ও শয়তান—উভয়েই মনের পরম শত্রু। আর আল্লাহ্ সকাশে সর্বদাই কাকুতি-মিনতি কর।

আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস সালামের ঘটনাকে স্মরণ করো। আল্লাহ্ পাক তাঁকে নিজ হাতে পয়দা করেন এবং স্বীয় রূহ তাঁর মধ্যে ফুঁকে দেন। অতঃপর তাঁকে জান্নাতে সম্মানের সাথে অবস্থানের সুযোগ দান করেন। কিন্তু একটি মাত্র পদস্খলনের জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁর উপর কি রকম শাস্তি নাযিল করেন। বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক আদম (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ আয় আদম! কে তোমার প্রতিবেশী? তিনি জবাব দিলেনঃ আমার প্রতিবেশী অতি উত্তম। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন ঃ আদম। আমার প্রতিবেশীর যোগ্যতা হারিয়েছ, তুমি এখান থেকে চলে যাও এবং তোমার মাথা থেকে আমার কারামতের মুকুট খুলে ফেল। কারণ আমার যে না-ফরমানী করে, সে আমার প্রতিবেশী থাকতে পারে না। অধিকন্তু এমনও বর্ণিত আছে যে, আদম (আ) তাঁর উক্ত গুনাহ্‌র জন্য দু'শ' বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের দরবারে রোনাজারী করলে তিনি তাঁর তওবা কবূল করেন।

এ দু'শ বছরের রোনজারীতে হযরত আদম (আ)-এর একটি মাত্র গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়!

আল্লাহ্‌র নবী ও খাস বান্দাদের একটি গুনাহ্‌র বেলায় যদি এমন হয়ে থাকে, তবে অন্যদের—যাদের গুনাহ্‌র শেষ নেই, তাদের কি হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

তওবাকারীদের জন্যই এটি রোনাজারীর স্থান। সুতরাং গুনাহ্‌তে লিপ্ত ব্যক্তিদের অবস্থা এখানে কি হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোন এক ব্যক্তি ঠিকই বলেছেন ঃ

তওবাকারী নফসের প্রতি ভয় রাখে অথচ সে ব্যক্তির কি দশা হবে, যে তওবাও করে না?

যা হোক, তওবা করার পর পুনরায় যদি সে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে অতি দ্রুত পুনরায় তওবা করবে এবং মনে মনে বলবে, আহা। পুনরায় পাপে লিপ্ত হওয়ার আগেই যদি এ তওবার অবস্থায় মৃত্যু হতো, তবে কতই না ভাল হতো! এভাবে তিনবার কি চারবারও যদি হয়, তবুও তওবা করা উচিত অর্থাৎ যখনই গুনাহ্ হয়, তখনই তওবা - পুনরায় গুনাহ্‌তে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই পুনরায় তওবা করতে থাকবে। মনে রাখবে, গুনাহ্ ও তওবা এ দুটোর মধ্যে তওবায় যেন বিলম্ব না হয়। তওবার ব্যাপারে যেন শৈথিল্য না দেখা দেয়। শয়তান সব সময়ই তওবায় বিলম্ব সৃষ্টির চেষ্টা করে। কারণ তওবা নেক কাজেরই পূর্বাভাস দান করে।

আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত কালামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ

'যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ কিংবা নিজের নফসের কোন ক্ষতি সাধন করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চায়, সে আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত ক্ষমাকারী ও করুণাময় হিসেবেই পাবে।'

সুতরাং আল্লাহ্ পাকের তৌফিকের কথা স্মরণ রেখে এসব বিষয় ও এর বিপরীতধর্মী বিষয় সম্পর্কে সজাগ হয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

গুনাহ্ থেকে মাফ চাওয়ার তরীকা

পরিষ্কার কথা এই যে, যখন তুমি এ কাজ শুরু করবে এবং তোমার আত্মা পাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্রতা হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে তুমি দৃঢ় সংকল্প হবে

যে, কিছুতেই আর গুনাহ্তে লিপ্ত হবে না, তখন লক্ষ্য করবে আত্মার পবিত্রতার সাথে সাথেই তোমার সংকল্পের দৃঢ়তার সততা কতটুকু? কারণ এক্ষেত্রে পূর্ণ সততা থাকা চাই। আর এদিকে যার হক নষ্ট হয়েছে তাকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করে নেবে এবং অন্যান্য যেসব নিয়ম-পদ্ধতি বলা হয়েছে, তা পালন করবে। অবশিষ্ট গুনাহ্র জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে রোনাজারী করবে, যাতে এ ব্যাপারে আর কোন খুঁত না থাকে। অতঃপর গোসল করে পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করবে। তারপর চার রাকাত নফল নামায আদায় করবে। এ নামাযের জায়গাটি হতে হবে খুবই নির্জন, কেবল্ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। তারপর আল্লাহ্ পাকের সামনে নিজের মস্তক সিজদাবনত করবে এবং মাথা ও চেহারায় মাটি মলতে হবে। যেহেতু তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মুখমন্ডলই বেশি প্রিয়—এ জন্য মুখমণ্ডলে অধিক মাটি মাখবে। অপরদিকে তোমার চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হতে থাকবে, হৃদয় থাকবে দুঃখে ভারাক্রান্ত। এমন অবস্থায় উপনীত হবে যে, সশব্দে কাঁদতে আরম্ভ করবে আর প্রতিটি গুনাহ্র কথা স্মরণ করে নফসকে অভিশাপ দিতে থাকবে।

আর নফসকে ডেকে বলবে, ওহে নফস! এখনো কি সচেতন হওয়ার সময় আসেনি? এখনো তওবার প্রয়োজন হয়নি? আল্লাহ্র আযাবের সামনে তুমি টিকতে পারবে? তোমার শক্তি কতটুকু? আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিই কি তুমি কামনা কর?— এ ধরনের বহু কথা বলে ক্রন্দন করতে থাকবে। অতঃপর পরম করুণাময়ের দরবারে মুনাজাতের জন্য হাত উঠাবে এবং বলবে ঃ আয় আল্লাহ্! তোমার পলাতক বান্দা আজ তোমার সামনে হাযির হয়েছে। তোমার পাপী বান্দা আজ ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তোমারই নিকট ফিরে এসেছে। হে আল্লাহ্! তোমার পাপী বান্দা আজ ওযরসহ হাযির হয়েছে। আয় রহমানুর রহীম! তোমার অশেষ করুণায় সিক্ত করে আমাকে ক্ষমা করো। তোমার অশেষ অনুগ্রহ দিয়ে আমার ওযর কবূল করো। হে আল্লাহ্! আমার দিকে তোমার রহমতের দৃষ্টিতে তাকাও। আয় রাব্বুল আলামীন! আমার আগের সকল গুনাহ্ মাফ করে দাও এবং বাকি জীবনের জন্য আমাকে পাপ থেকে হেফাজত করো। আয় আল্লাহ্! সকল উত্তম নিয়ামতের তুমিই মালিক। তুমিই দয়াবান ও করুণার আধার।

অতঃপর একান্ত সযত্নে নিম্নোক্ত দোয়া করবে ঃ

ওহে সর্বশক্তিমান! তুমি সকল কাজই তো করতে সক্ষম। ওহে ব্যথিতের আশ্রয়দাতা! তুমি যা বল তাই তো হয়ে যায়। আমি পাপচক্রে পতিত হয়েছি। পাপ আমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিয়েছে। আমি সকল পাপ-তাপ নিয়েই তোমার নিকট হাযির হয়েছি। তুমি আমার তওবা কবূল করো— এ পাপচক্র থেকে আমাকে উদ্ধার করো। তুমিই তো তওবা কবূলকারী, তুমিই দয়াবান।

তারপর খুব অনুতাপ করবে এবং নিজের অসহায় অবস্থার বিষয় যতদূর সম্ভব প্রকাশ করতে থাকবে এবং বলবে ঃ ওহে আল্লাহ্! কথা দিয়ে তোমাকে আকর্ষণ করার সাধ্য নেই বা কোন পরিস্থিতিই তোমাকে তার দিকে টেনে নিতে সক্ষম নয়। হে প্রভু! অতিরিক্ত সওয়াল করেও তোমাকে কেউ ভ্রান্তিতে নিপতিত করতে পারবে না কিংবা জোর করেও কেউ তোমার নিকট থেকে কিছু আদায় করতে সক্ষম হবে না। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার ক্ষমার যোগ্য করো এবং তোমার করুণাধারায় সিক্ত করে তোমার মাগফিরাতের ছায়ায় স্থান দাও। হে প্রভু! তুমিই রহমানুর রহীম। তুমিই সর্বশক্তিমান।

অতঃপর নবী আকরাম (সা), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের প্রতি দরূদ পাঠ করবে। এরপর সকল মুমিন নর-নারীর জন্য মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

এভাবে তুমি তওবায়ে নসূহ সম্পন্ন করবে। এ তওবায়ে নসূহ তোমাকে এমনভাবে নিষ্পাপ করে দেবে যে, তুমি যেন আজই ভূমিষ্ঠ হয়েছ। আল্লাহ্ পাক তোমাকে তাঁর প্রেমের সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত করবেন আর দান করবেন অসংখ্য সওয়াব ও পুরস্কার। তাছাড়া আল্লাহ পাক তোমার উপর তাঁর রহমত ও বরকতের এমন ধারা বর্ষণ করতে থাকবেন যে, কোন ভাষায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তুমি লাভ করবে শান্তি ও নিরাপত্তার মহান নিয়ামত আর পরিত্রাণ লাভ করবে আল্লাহর আযাব ও গযবের মহাবিপদ থেকে। তোমার দুনিয়া ও আখিরাত হবে শান্তিময়— শুধুই শান্তিময়।

এমনিভাবেই তুমি আল্লাহ্র অনুমতিতে এ সংকটও অতিক্রম করে ফেলবে। মনে রাখবে, আল্লাহ্ই তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দিয়ে বান্দাকে হিদায়েত করে থাকেন।

এরপর আল্লাহর ইবাদতের অভিযাত্রীকে বহুতরো বিপদের সম্মুখীন হতে হবে এবং ইবাদতে স্থিতিশীলতা হাসিলের জন্য এ সকল বিপদ অতিক্রম করতে হবে।

বিপদাপদের ঘাঁটি

এরপরেই আল্লাহ্‌র ইবাদতের অভিযাত্রীকে বহুতরো বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু এসব বিপদাপদে দমে গেলে চলবে না। এগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে করে ইবাদতে ইলাহীতে স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিপদাপদ চার প্রকার।

দুনিয়া বর্জন

দুনিয়া ও তার অপ্রতিরোধ্য দাবি থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো দুনিয়াকে উপেক্ষা করা ও দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। এখন আমাদের জানা দরকার, দুনিয়া থেকে কিভাবে আলাদা হওয়া যায়। মনে রাখবে, দুনিয়া থেকে আলাদা হওয়ার দরকার দুটো কারণে।

প্রথমত, এতে আল্লাহ্‌র ইবাদতে স্থিতিশীলতা ও আধিক্য (অর্থাৎ বেশি বেশি ইবাদতের) লাভ হয়। কারণ দুনিয়ার আকর্ষণ ইবাদতে ইলাহী থেকে মানুষকে অন্য দিকে ব্যাপৃত রাখে। প্রকাশ্যে দুনিয়া পাওয়ার চেষ্টা আর অভ্যন্তরীণ দুনিয়া পাওয়ার লালসার ধোঁকা এ দুটো জিনিসই এমন যে, ইবাদতে ইলাহীর পথে মস্তবড় বাধাস্বরূপ। কারণ একটি নফস ও একটি অন্তঃকরণ যখন একটি কাজে ব্যাপৃত তখন তার বিপরীতটির অস্তিত্ব কোথায়? এক নফসে ও এক অন্তঃকরণে দুটো বিপরীত বিষয় থাকতেই পারে না। সুতরাং দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকলে আল্লাহ্‌র ইবাদতের কথা বৃথা। অধিকন্তু দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সতীনের সম্পর্ক বিদ্যমান। একজনকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলে দ্বিতীয় জন বিরক্ত হয়ে যায়। তেমনি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দুনিয়া লাভের চেষ্টা-- এ দুটোর বৈপরীত্য পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায়। একদিকে অগ্রসর হলে অন্যদিকে পিছনে পড়ে যায়। পূর্ব ও পশ্চিমে একসাথে অগ্রসর হওয়া কিছুইতে সম্ভব নয়। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাত-- এ দুটোর যে-কোন একটার দিকে মনোযোগ দিলেই অপরটি হাতছাড়া হয়ে যাবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। মনে রাখা দরকার, আখিরাতের সামানা হলো ইবাদত।

এ তো গেলো অন্তরের ব্যাপার। বাইরের দিকেই লক্ষ্য করুন--দেখবেন, একই অবস্থা। যেমন হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেছেনঃ আমি একসাথে ইবাদত ও ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু দু'টো একসাথে পাওয়া গেল না। অবশেষে আমি ইবাদতকেই অবলম্বন এবং দুনিয়া পরিত্যাগ করলাম।

হযরত উমর (রা) বলেনঃ এ দু'টো জিনিস যদি কোন ব্যক্তির নিকট একসাথে ধরা দিত, তাহলে আমার কাছেই ধরা দিত। কারণ আল্লাহ্ আমাকে শক্তি ও বিনয়— এ দু'টো জিনিসই দান করেছেন।

এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, দুনিয়া এবং আল্লাহ্র ইবাদত দু'টো একসাথে হবার নয়। সুতরাং ধ্বংসশীল জিনিসকে ত্যাগ করে চিরন্তন ও সংরক্ষিত জিনিস লাভের চেষ্টাই করা উচিত।

অবশিষ্ট হইল দুনিয়ার জন্য গোপনীয় ব্যস্ততার কথা। মানুষের সংকল্পের অনুরূপ ব্যস্ততা বিদ্যমান থাকে, যা আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে— তিনি বলেছেনঃ

مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا تَفْنِىْ-

যে ব্যক্তি দুনিয়ার মোহে আবদ্ধ হবে আখিরাতের দিক থেকে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হবে, দুনিয়ায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এখানে সে খাটোই থাকবে। সুতরাং স্থায়ী জিনিসকে অস্থায়ী ও ধ্বংসশীলের উপর অগ্রাধিকার দাও।

অতএব একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যখন কেউ বাইরের দিক থেকে দুনিয়া লাভের চেষ্টা এবং অন্তরে দুনিয়ার কামনায় ব্যাপৃত থাকবে তখন সে ব্যক্তির পক্ষে পুরোপুরি আল্লাহ্র ইবাদতের সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যখন বাহ্যত দুনিয়ার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনের যোগ্যতা হাসিল করবে এবং অন্তরকে তার আকর্ষণ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে তখনই তার জন্য আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করে দেবে।

হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কোন বান্দা যখন জাগতিক বিষয়ের আকর্ষণ মুক্ত হয়, তখন তার অন্তর হিকমতের আলোকে

প্রজ্বলিত হয়ে যায়। আর তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও তাঁকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। সুতরাং স্থায়ী জিনিসকেই অস্থায়ী জিনিসের উপর প্রাধান্য দেয়া উচিত।

দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, তাতে করে তোমার আমলের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং তার মর্যাদা ও সম্মানও বেশী হবে। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

اَ كْعَتَا نِ مِنْ رَجُلٍ عا لِم زَ ا هِدٍ قَلْبُهُ خَيْر و ا حَبَّ ا لَى اللّٰه جَلَّ

جِلا لَهُ مِنْ عِبَا دَ ةِ ا لْمُتَعَبِّدِ بْنَ الِىٰ ا خِرِ الذِّ كْرِ اَبدَ ا سَرْ مَدَ ا -

সংসার নিরাসক্ত 'আলিমের দুই রাকাআত নামায, শেষ দিন পর্যন্ত নিরত ইবাদত গোযারদের ইবাদতের চাইতেও আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রিয় ও উত্তম।

যে জিনিসের জন্য ইবাদত এতখানি গ্রহণযোগ্য ও মর্যাদাবান হয়, ইবাদতকারীদের জন্য তা হাসিল করা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ততা অবলম্বন ও দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া তাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তির অর্থ কি?

দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি বলতে কি বোঝায় এবং তার খাঁটি রূপই বা কি— এক্ষণে তা-ই আলোচনা করা যাক।

আমাদের উলামায়ে কিরামের নিকট উহা দুই প্রকার। এক প্রকারের নিরাসক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা মানুষের আওতাধীন, ইচ্ছা করলে সে তা কার্যকর করতে সক্ষম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারটি মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

মানুষের আয়ত্তাধীন নিরাসক্তি তিন রকমে কার্যকর হতে পারে— প্রথমত, যা নেই, তাকে পাওয়ার চেষ্টা ত্যাগ করা। দ্বিতীয়ত, যা কিছু জমা হয়েছে, তা পৃথক করে দেয়া এবং তৃতীয়ত, সে সবের প্রতি সকল আকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা।

এরপর আসে মানুষের ক্ষমতার বাইরে থেকে যে নিরাসক্তি সৃষ্টি হয়, তার কথা। এ অবস্থাটি মানুষের মনে কোন একটি বিষয়ে সন্তুষ্টির ভাব সৃষ্টি করে দেয়। তবে মনে রাখতে হবে, মানুষের আয়ত্তাধীন যে কাজটুকু তাকেই দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করতে হবে; এর ফলেই দ্বিতীয় প্রকার, যেটা মানুষের আয়ত্তে বাইরে, তাও এসে যাবে। শেষোক্ত অবস্থাটি অত্যন্ত উঁচু দরজার।

মানুষ যখন এ অবস্থাটি হাসিল করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ দুনিয়ার যা কিছু তার আয়ত্তের মধ্যে, তাকে লাভ করার চেষ্টা পরিত্যাগ করে, দুনিয়ার যে সকল জিনিস তার নিকট জমা হয়েছে, তা বন্টন করে দেয় এবং অন্তর থেকে সে সবের আকাঙ্ক্ষা ও তাদের উপরের কর্তৃত্বাধিকার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সওয়াবের আশায় এবং অন্যান্য বিপদ-মুসিবতের বিষয়কে স্মরণ রেখে সব কিছু বিসর্জন দিতে সক্ষম হয়, তখন তার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। মানুষের ঠিক এ অবস্থার নাম দুনিয়ার প্রতি খাঁটি নিরাসক্তি।

উপরিউক্ত তিনটি স্তরের মধ্যে শেষোক্তটি পালন করা খুবই কঠিন। অর্থাৎ অন্তর থেকে সকল আকর্ষণ বিসর্জন দেয়া। অনেক সময় দেখা যায় যে, বহু লোক বাহ্যত দুনিয়াকে পরিত্যাগ করেছেন, তার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছেন ঠিকই, কিন্তু অন্তরে পোষণ করে চলেছেন দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ, ভালবাসা ও পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এ অবস্থাটি নফসের পক্ষে খুবই মারাত্মক ও ক্লেশপূর্ণ। আর সকল কিছু নির্ভরও করে এ অবস্থাকে কাটিয়ে উঠার উপর। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في

الأرض ولا فسادا -

এ আখিরাতের ঘর আমি বানিয়েছি তাদেরই জন্য, যারা দুনিয়ায় অহংকার ও ফাসাদ করতে চায় না। (সূরা কাসাসঃ ৮৩)

লক্ষণীয় যে, উপরিউক্ত আয়াতের ইচ্ছার অনুপস্থিতিকেই সিদ্ধান্তের জন্য নির্ভরশীল করা হয়েছে। দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা বা আখিরাত পাওয়ার জন্য কোন ক্রিয়ার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِيْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ

حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ -

যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে এরই কিছু দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না। (সূরা শূরাঃ ২০)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ -

আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ভাল চায়, তাকে আমার ইচ্ছানুযায়ী দুনিয়ায়ই অতি তাড়াতাড়ি তা দান করি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৮)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেনঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ

كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا -

আর যে ব্যক্তি আখিরাতের কল্যাণ প্রত্যাশা করে এবং সেজন্য যথারীতি চেষ্টা করে— সে যদি মুমিন হয়, তবে এ ধরনের ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা কবূল করা হয়।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে সর্বত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সংকল্পের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে সংকল্পের গুরুত্বের আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। বিষয়টি কঠিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু বান্দা যদি 'যাহা নাই' তার জন্য প্রচেষ্টা থেকে বিরত ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্কছেদের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাতে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে দুনিয়ার এরাদা ত্যাগ করার তৌফিক দিয়ে তার অন্তরকে এদিকে ধাবিত করাবেন। কেননা তিনিই বান্দার প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা প্রদর্শনকারী। দুনিয়াকে পরিত্যাগ করার জন্য নিজের মনে উৎসাহ সৃষ্টির

উদ্দেশ্যে দুনিয়ার খারাপ দিকগুলো অধিক আলোচনা এবং সেই সম্পর্কে জ্ঞানী, গুণীদের বিভিন্ন অভিমত অধিক স্মরণ করবে। দুনিয়ার কদর্যতা ও খারাবি সম্পর্কে আলিমগণ বহু মন্তব্য করে গেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেনঃ দুনিয়ার পাপমত্ততা ও সর্বত্র নাফরমানী ভাব দেখে এবং তাতে অংশগ্রহণকারীদের অবিলম্বে অপমানিত হতে হবে জেনে আমি দুনিয়া পরিত্যাগ করেছি।

উপরিউক্ত মন্তব্যটিতে যেন দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণের ভাব প্রকাশ পায়। কারণ যে ব্যক্তি বিচ্ছেদের জন্য অভিযোগ উত্থাপন করে, তার মনে থাকে মিলনের কামনা। তেমনি যে ব্যক্তি কোন বিষয়কে সংখ্যাধিক্যের অংশ গ্রহণের কারণে পরিত্যাগ করে, তার কামনা থাকে সে জিনিসকে একা পাওয়ার।

সুতরাং দুনিয়া সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য থেকে যেন এক ধরনের দুর্গন্ধই নাকে আসে। বরং এ সম্পর্কে আমাদের শায়খের মন্তব্যই অধিক পছন্দনীয়। তিনি বলেছেনঃ দুনিয়া আল্লাহ্‌র দুশমন। সুতরাং দুনিয়াকে তুমি কি করে ভালবাসতে পার? অথচ কেউ যদি কাউকে ভালবাসে, তাহলে সেই প্রিয়পাত্রের দুশমনের প্রতি তার স্বভাবতই ঘৃণা থাকার কথা। তিনি আরও বলেছেনঃ দুনিয়া একটি বিকৃত লাশ। তুমি কি জান না যে, দুনিয়ার চূড়ান্ত পর্যায় হলো বিপর্যয়? প্রকৃত কথা এই যে, দুনিয়া পুঁতিগন্ধময়, পংকিলতাপূর্ণ একটি সম্পূর্ণ অপবিত্র জায়গা। কিন্তু লালসাপূর্ণ সামগ্রী, ঐশ্বর্য ও মোহনীয় জিনিস দিয়ে একে করা হয়েছে জৌলুসপূর্ণ। ফলে অচেতন মানুষ এতেই ধোঁকায় পতিত হয়েছে, আর সচেতন বুদ্ধিমানরা এ থেকে দূরে সরে গেছে।

মোটকথা, আমাদের মতে দুনিয়ায় যা হালাল ও হারাম—এতদুভয়ের ব্যাপারেই নিরাসক্তি প্রদর্শন করা যেতে পারে। হারামের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন নফলের পর্যায়ে পড়ে। হারাম পরিত্যাগ আল্লাহ্‌র রাহে স্থিতিশীলতা অর্জনকারীদের জন্য মল ও দুর্গন্ধময় বস্তু ত্যাগ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে প্রয়োজনের খাতিরে কেবল কোন ক্ষতির আশঙ্কাকে দূরীভূত করার জন্য তার প্রতি আগ্রহশীল হতে পারে। আর যা হালাল, তার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন তো ওলী-আল্লাহ্‌র নিদর্শন। কেননা তাঁদের নিকট হালাল বিষয়ও লাশের পর্যায়ভুক্ত। তারা কেবল প্রয়োজনের তাকীদেই তা থেকে প্রয়োজন মত ফায়দা গ্রহণ করে থাকেন। ওলী-আল্লাহ্‌র কাছে হারাম বিষয় দোযখের ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়। তাঁদের মনে তৎপ্রতি আগ্রহের সামান্যতম ছায়াও প্রবেশ করতে সক্ষম নয়। এ

অবস্থাকেই বলা হয় 'মনের নিরাসক্ত ভাব'। এ সময় মনে এ সব বিষয়ের প্রতি কোন আগ্রহ বা আসক্তি বিদ্যমান থাকে না এবং তৎপ্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি জমতে থাকে। অবশেষে এসবের প্রতি সামান্যতম আকাঙ্ক্ষাও সম্পূর্ণরূপ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যদি কারো মনে জাগে যে, যে দুনিয়া এমন অপরূপ লালসা ও কামনার সামগ্রীতে ভরা, যার জন্য মানুষ একেবারে মত্ত এবং পাগল, তা কি করে দোযখ, অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় লাশ সদৃশ হতে পারে?

এ সম্পর্কে একটি কথাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ যাকে বিশেষ তৌফিক দান করেছেন, তিনি অতি সহজেই দুনিয়ার আসল রূপ, তার অপবিত্রতা ও পুঁতিগন্ধময়তা ধরে ফেলতে পারেন—তাঁর কাছে দুনিয়ার এ দুর্গন্ধময় লাশ সদৃশ রূপটি কিছুতেই গোপন থাকতে পারে না। বরং দুনিয়ার এ আসল রূপ যারা ধরতে পারে না, তার কৃত্রিম জৌলুসে যারা মাতোয়ারা হয় এবং লালসার ধোঁকায় নিপতিত হয়ে যারা অন্ধভাবে দিন গুযরান করতে থাকে—পূর্বোক্ত লোক তাদের দেখে কেবল বিস্ময়ই বোধ করে। এ প্রসঙ্গে একটি উপমা দিয়ে বিষয়টিকে আমি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ধরুন, কোন এক দোকানদার খুব সুন্দর করে রসগোল্লা তৈরী করল, কিন্তু তাতে কিছু বিষ মিশিয়ে দিল। একই সাথে দুই ব্যক্তি সেখানে অবস্থান করছিল। এক ব্যক্তি ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করল—অপর ব্যক্তির দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হলো না। অতঃপর দোকানদার রসগোল্লাগুলো থালায় সাজিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত করল। যে ব্যক্তি রসগোল্লায় বিষ মিশিয়ে দিতে দেখেছে, সে তো নিশ্চয়ই তা স্পর্শও করবে না। তার কাছে এ জিনিস রসগোল্লা হয়েও অগ্নিবৎ, বরং তার চেয়েও ভয়ঙ্কর বোধ হবে এবং এতে যে বিষ আছে, এ সম্পর্কে তার মনে সন্দেহও সৃষ্টি হবে না। সুতরাং সে কখনো ধোঁকায় পড়বে না। সে এর গোপন রহস্য জানে। তাই এ রসগোল্লা বাহ্যিকভাবে যত লোভনীয়ই হোক, তাতে সে বিভ্রান্ত হতে পারে না।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি—যে বিষের কথা জানে না, সে অবশ্যই রসগোল্লার বাহ্যিক লোভনীয়তা দেখে বিভ্রান্ত হবে এবং লোভের বশবর্তী হয়ে ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। শুধু তাই নয়, সে হয়তো তার উল্লিখিত সাথীর ব্যবহারে আশ্চর্যই বোধ করবে। এমনকি দ্বিতীয় ব্যক্তিই হয়তো প্রথম ব্যক্তিকে

একজন বেওকুফ মনে করে বসবে। আল্লাহ্‌র পথের অভিযাত্রী ও তাতে স্থিতিশীলতা অর্জনকারী এবং দুনিয়াদার মানুষের অবস্থাও সব সময় অনুরূপ হয়ে থাকে।

এখন কথা হলো, যদি উক্ত রসগোল্লায় বিষ না দিয়ে থুথু জাতীয় অপবিত্র জিনিস মিশিয়ে খুব উত্তমভাবে তা সাজিয়ে দেয়া হয়, তাহলে যে তা প্রত্যক্ষ করেছে, সে তাও স্পর্শ করবে না। সে এ রসগোল্লাকেও ঘৃণিত বস্তু বলে মনে করবে; বিশেষ প্রয়োজন এবং নেহায়েত জরুরী না হলে সে তৎপ্রতি কোনই আকর্ষণ অনুভব করবে না। অপরপক্ষে যে কোন অপবিত্র জিনিস মিশিয়ে দিতে দেখেনি, সে রসগোল্লার বাইরের পারিপাট্য দেখে ধোঁকায় নিপতিত এবং লোভের বশবর্তী হয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে। দুনিয়ার হালাল বিষয় সম্পর্কে এই শেষোক্ত উদাহরণটি প্রযোজ্য।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ও সংযমী এবং লিপ্সাওয়ালা ও দুর্বলমনা— এ উভয় শ্রেণীর মানুষেরই প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য একই রকম হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থার মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হলো। কারণ এক শ্রেণী জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তি কাজে লাগিয়েছে, আর অপর শ্রেণী মূর্খতা ও ঔদাসীন্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে। শেষোক্ত শ্রেণীও যদি জ্ঞান ও দৃষ্টিক্ষমতা সম্প্রসারিত করে, যাহেদ যা অবলম্বন করেছেন— তবে তাদের অবস্থাও তেমনই হবে। অপরপক্ষে যদি যাহেদ স্বীয় দৃষ্টি ও সংযম কাজে না লাগায়, তবে তার অবস্থাও লিপ্সু ও মূর্খের ন্যায়ই হবে। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, ভাল-মন্দের পার্থক্য বিচার করে নেয়াটি স্বভাবের উপর নির্ভর করে না— নির্ভর করে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির উপর। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করে চলার পন্থাটিই অত্যন্ত উপকারী ও পরম বাঞ্ছিত। যার মধ্যে সামান্যতমও বিবেক ও ন্যায় বিচারের ক্ষমতা আছে, সে নিশ্চয়ই এ পন্থাটি অবলম্বন করবে। বাকী হিদায়ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পরম অনুগ্রহ ও করুণার দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দুনিয়ারও তো কিছু প্রয়োজন আছে। কারণ বেঁচে থাকার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতেই হয়। সুতরাং পূর্ণ 'যুহদ' তাহলে কিভাবে হাসিল করা সম্ভব?

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, জীবন ধারণের জন্য যার প্রয়োজন নেই, সে বিষয় পরিত্যাগ করলেই চলবে। মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার ততটুকুই গ্রহণ করা যাবে,

যা শুধু জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন অর্থাৎ প্রকৃত লক্ষ্য থাকবে শুধুমাত্র জীবনী শক্তিকে সজীব রাখা। কেননা আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্যও এ শক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু খানাপিনা ও স্বাদ গ্রহণই যেন সার হয়ে না দাঁড়ায়। কারণ এটা প্রকৃত লক্ষ্য নয়। আর তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে কোন জিনিস বা কোন কারণের মাধ্যমেও যেমন শক্তি দান করতে পারেন, তেমনি বিনা উপাদান ও বিনা কারণেও শক্তি প্রদান করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করা যায়।

আর যদি শক্তি ও সামর্থ্য কোন উপাদানের ভিত্তিতে দান করা হয়, তবে তাও দুই রকমের হতে পারে। প্রথমত, মানুষের চেষ্টা, অনুসন্ধান ও কামাইকৃত উপাদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা শক্তি ও সামর্থ্য দান করতে পারেন। আর দ্বিতীয়ত, তিনি যদি চান, তাহলে মানুষের কল্পনারও বাইরে, অনুসন্ধানেরও ঊর্ধ্বে, মানুষের আয়ত্তের বহির্ভূত কোন উপাদানের মাধ্যমেও শক্তি ও সামর্থ্য দান করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কেই ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কোন-না-কোন একটি পন্থা বের করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেন, যে জায়গা সম্পর্কে কল্পনাও করতে সক্ষম নয়।

(সূরা তালাকঃ ২-৩)

এমতাবস্থায় চেষ্টা ও অনুসন্ধানের তো কোনই সুযোগ বিদ্যমান থাকে না। যা হোক, এ উচ্চ পর্যায়ের 'যুহদ' যদি হাসিল না করতে সক্ষম হও আর চেষ্টা ও তদবীরেরই প্রয়োজন হয় রিযিকের জন্য, তবুও চেষ্টা তদবীরসহ অকুতোভয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া উচিত। তবে লক্ষ্য থাকবে—চেষ্টা ও তদবীরের উদ্দেশ্য যেন ভোগ-লিপ্সায় পর্যবসিত না হয়। কেননা তা হলে ভোগ-লিপ্সা ব্যতীত তোমার চেষ্টা ও তদবীরকেও উত্তম কাজের মধ্যেই পরিগণিত করা হবে এবং এগুলোতেও আখিরাতের জন্য চেষ্টা করা হয়েছে বলে ধরা হবে। অবশ্য দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক-প্রবণতা থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতেই হবে।

ঠিক এমনি অবস্থায় পৌঁছাতে পারলে তোমার দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য হাসিল (যুহদ) সম্পর্কে আর কোন তর্কের অবকাশ থাকবে না। তবে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, এ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে অতি উত্তমভাবে বুঝে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী শান্ত ও নিরাসক্ত মনে আমল করতে হবে।

দ্বিতীয় সোপান

মখলূক

এরপর সৃষ্টিজগৎ থেকেও স্বাতন্ত্র্য ও সংশ্রবহীনতা অবলম্বন করা উচিত। সৃষ্টিজগৎ থেকে স্বাতন্ত্র্য ও সংশ্রবহীনতা লাভেরও দু'টি কারণ আছে।

প্রথম কারণ-- সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের পথে অন্তরায় সৃষ্টি ও তৎপ্রতি ঔদাসীন্য আনয়ন করে।

কোন এক বুযর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি একদা এক দল মানুষকে তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করতে দেখলাম। দেখি, বহু লোক উক্ত কার্যে ব্যাপৃত রয়েছে। কিন্তু তার কিছু দূরে আবার এক ব্যক্তি চুপচাপ বসে আছে। আমি তার কাছে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, তার সাথে কিছু আলাপ করব। কিন্তু তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরে লিপ্ত থাকা তোমার সাথে কথাবার্তা বলার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় ও উত্তম। আমি বললাম, তবে কি আপনি একাই আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করতে চান? তিনি জবাব দিলেনঃ আমার সাথে আমার পরওয়ারদেগার ও দু'জন ফেরেশতা আছেন। আমি বললাম, এ ধরনের মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি কে আগে অগ্রসর হতে পারে? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ মাগফিরাতের দরজায় পৌছার পন্থা কি? তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে ইশারা করে আমাকে বলে দিলেন এবং আমাকে পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

এ কথাবার্তার ফল এই দাঁড়ায় যে, মখ্লূক মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে উদাসীন করে দেয়-- এমনকি, তাতে বাধার সৃষ্টি করে এবং মানুষকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। হাতেম আসেম বলেছেনঃ আমি মখ্লূকের নিকট পাঁচটি জিনিস দাবি করেছিলাম। কিন্তু তার একটিও এখনও পরিপূর্ণভাবে লাভ

করা সম্ভব হয়নি। আমি মখলূকের নিকট আল্লাহর পথে আনুগত্য প্রদর্শন ও যুহ্দ দাবি করলাম। কিন্তু সে তা দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করল। অতঃপর আমি আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে বললাম, কিন্তু তাতেও সে রাযী হলো না। তখন আমি বললাম, আচ্ছা, তাহলে আমি আল্লাহ্র রাস্তায় আনুগত্য প্রদর্শন ও যুহ্দ অবলম্বন করি, তাতে তুমি সম্মতি দাও। কিন্তু সে তাও স্বীকার করল না। অতঃপর আমি বললাম--আচ্ছা, অন্তত আমি উপরিউক্ত কার্যে লিপ্ত হই, তুমি তাতে বাধা দিও না, কিন্তু সে বাধা দেয়া হতেও বিরত হলো না। শেষে আমি বললাম--আচ্ছা, তাহলে অন্তত আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বিষয়ে নিষেধ করেছেন, তার প্রতি আমাকে আহ্বান জানিও না এবং তোমার অনুসরণ না করায় তুমি আমার পশ্চাদ্ধাবন করো না। কিন্তু 'মখলূক' এ প্রস্তাবেও রাযী হলো না। ফলে, নিরুপায় হয়ে আমি সব কিছুকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেলাম।

ভাইসব, মনে রাখবেন, হযরত রসূলে করীম (সা) কোন্ যুগে সংসার ত্যাগ করতে হবে, তা বাতলিয়ে দিয়েছেন। তিনি সে যুগের ও সে যুগের মানুষেরও বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে গেছেন। সে সঙ্গে তিনি সে যুগে সংসার ত্যাগ করে একা জীবন যাপনের নির্দেশও দিয়ে গেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) নিশ্চিতভাবেই পুণ্যের বিষয় সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং আমাদের জন্য আমাদের চাইতে অধিক উপদেশ ও উত্তম পন্থা বাতলিয়ে দেয়ার যোগ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার সাথে যদি তোমার যুগ মিলে যায়, তবে তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য অগ্রসর হও এবং তাঁর এ মহান উপদেশ শিরোধার্য করে লও। সাবধান, এ ব্যাপারে তোমার মনে যেন সামান্যতমও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। কেননা, তোমার যুগে তোমার পক্ষে কি কর্তব্য সঠিক, সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। বরং তাঁর নির্দেশের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধোঁকায় নিপতিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে এনো না।

যে যুগে সংসার ত্যাগ ও একা জীবন যাপন করতে হবে, তার পরিচয় নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ

بينما نحن حول النبي صلى الله عليه و سلم اذ ذكر الفتنة فقال اذا رأيتم الناس مرجت عهودهم و خفت اماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه قلت ما اصنع عند ذلك جعلني الله فداءك قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما يعرف ودع ما تنكر وعليك بامر الخاصة ودع عنك امر العامة -

আমরা রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসেছিলাম। তিনি ফিতনার সময়ের কথা উল্লেখ করে বললেনঃ যখন দেখবে যে, মানুষের মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ শুরু হয়ে গেছে, আমানত বিনষ্ট করছে— (এ সময়) রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর এক হাতের অংগুলিসমূহ অপর হাতের অংগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে বললেন যে, এ রকম হয়ে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) এ সময় আরয করলেনঃ আমার প্রাণ আপনার জন্য কুরবান হোক। হুযূর, সে সময় আমাদের কি করতে হবে? জবাবে রসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ (সে সময়) গৃহেই সব সময় অবস্থান করবে এবং যে জিনিস মন্দ বিবেচিত হবে, তা পরিত্যাগ করবে। এ সময় কেবলমাত্র নিজেকেই সামলাতে থাক, সাধারণের সকল ব্যাপার থেকে দূরে অবস্থান করো।

অন্যত্র রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

ذلك ايام الهرج قيل و ما ايام الهرج قال حين لايامن الرجل جليسه -

এরূপ হবে ফিতনার যুগে--তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ ফিতনার যুগের পরিচয় কি? জবাবে তিনি বললেনঃ যখন কোন ব্যক্তি তার সাথী সম্পর্কে নিরাপত্তা বোধ করতে পারবে না।

আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ (রা) হারিস বিন উমায়রা (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন— তুমি যদি জীবিত

থাক, তাহলে তোমার সামনেই এমন যুগ আগমন করবে, যখন খোতবাদাতা ও বক্তা বেশী হবে, কিন্তু আলিমের সংখ্যা হবে নগণ্য; সওয়ালকারী হবে বেশী, দাতার সংখ্যা হবে অল্প। রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ সে যুগটা কখন আগমন করবে? তিনি জবাব দিলেনঃ যখন নামাযের কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করা হবে না, সূদের কারবার সরগরম হয়ে ওঠবে এবং ধর্মকে দুনিয়ার সামান্য মালমাত্তার বদলে বিকিয়ে দেয়া হবে। এ অবস্থা থেকে নাজাত কামনা করা উচিত।

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে যে দৃশ্য ফুটে উঠে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ এ যুগ ও এ-যুগের মানুষের মধ্যে সঠিকভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই ভাবনা-চিন্তা করা উচিত নয় কি? সলফে সালেহীনগণও তাঁদের নিজ নিজ যুগে এসব বিষয়কে ভয় করার জন্য এক বাক্যে তাকীদ করে গেছেন এবং এমন অবস্থা দেখা দিলে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকেই সেক্ষেত্রে উত্তম বলে বিবেচনা করেছেন এবং তা পালনের নির্দেশও দিয়েছেন।

এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই, সলফে সালেহীনগণই ছিলেন উত্তম উপদেশদাতা ও সবচাইতে অধিক দূরদর্শী। অর তাছাড়া, তাঁদের যুগের পরের যুগগুলো তাঁদের চাইতে উত্তম তো নয়ই, বরং অপেক্ষাকৃত মন্দ।

ইউসুফ বিন আসবাতের একটি বর্ণনা থেকে উক্ত বিষয়টির সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "আমি সুফিয়ান সওরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেনঃ আমি সে পাক যাতের কসম করে বলছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এ যুগে সংসার বর্জন ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন সম্পূর্ণ হালাল।"

আমি বলছি, যদি হযরত সুফিয়ান সওরী (রা)-র যুগে সংসার বর্জন ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন হালাল হয়, তবে আমাদের যুগে তা ওয়াজিব এবং ফরয।

সুফিয়ান সওরী (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর বিশেষ খাদিমের নিকট এক পত্রে বলেছেনঃ

তুমি এমন একটি যুগে অবস্থান করছ, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীগণ যে যুগ থেকে সর্বদা নাজাত কামনা করতেন—যাতে তাঁরা জীবিত থাকতেই সে যুগের আগমন না হয় অথচ তাঁদের যে জ্ঞান ছিল, তা নিশ্চয়ই আমাদের নেই। সুতরাং আমরা যখন ইলমের স্বল্পতা, সবরের দৈন্য, নেককারের নগণ্য সংখ্যা

এবং আনুগত্যহীনতায় মানুষের মধ্যে গোলযোগের বিভীষিকাময় একটি যুগে উপনীত, তখন আমাদের কি করা উচিত?

হযরত উমর ফারূক (রা) এজন্যই বলেনঃ মন্দ লোকের সাহচর্য গ্রহণের চাইতে সংসার-বর্জন ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে অনেক বেশী আনন্দ ও আরাম। তিনি আরও বলেছেনঃ 'হযরত কা'ব ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের ভাষায় আমরা যে যুগে বাস করছি, তাতে সত্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত আর সর্বত্র বিস্তৃত কেবল জুলুম ও আনুগত্যহীনতা।

যুগের অবস্থা সম্পর্কে বধির ও অন্ধরা আজ পেরেশান। তবে হ্যাঁ, ইবলিসের উন্নতি ও প্রভাব সর্বত্রই দেদীপ্যমান। যদি এ অবস্থাই চলতে থাকে এবং এর কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে যে, কোন মৃত ব্যক্তির জন্যই আর শোক প্রকাশ করা হবে না এবং কোন নবজাতকের জন্যও আর আনন্দ করা হবে না।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনীয়া সুফিয়ান সওরী (রা)-কে বলেছিলেনঃ আমাকে কিছু ওসীয়ত করে যান। তখন তিনি বললেনঃ মানুষের সাথে সম্পর্ক কম রাখুন। তখন সুফিয়ান ইবনে উয়াইনীয়া আরয করলেনঃ আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। হাদীসে কি একথা নেই যে, মানুষের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করো? কেননা প্রত্যেক মুমিনই শাফা'আত করার অধিকার লাভ করবেন। সুফিয়ান সওরী (রা) বললেনঃ তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা অনুরূপই। আমি মনে করি, তুমি যে সব বিষয় সহ্য করতে পারো না, মানুষের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করলে তোমার বন্ধু-বান্ধবের তরফ থেকেই তা উদ্ভূত হবে এবং তোমাকে সে অসহনীয় বিষয়েরই মুকাবিলা করতে হবে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনীয়া বলেনঃ আমি তখন বললাম, ঠিকই বলেছেন। অতঃপর হযরত সুফিয়ান সওরী (রা) ইন্তেকাল করার পর আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি যেন কিছু আহকাম-আরকান বর্ণনা করছিলেন। আমি আরয করলাম, আয় আবূ আবদুল্লাহ্! আমাকে কিছু ওসীয়ত করুন। তিনি সেই পূর্ব ওসীয়তেরই পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি আরো বললেনঃ যতদূর সম্ভব মানুষের সাথে কম সম্পর্ক রক্ষা করে চলো। কেননা মানুষের সাথে সম্পর্ক জড়িয়ে গেলে, তা থেকে মুক্তিলাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত কতিপয় কবিতা উল্লেখ করলেনঃ

'আমি বরাবর মখলূকের প্রতীক্ষায় ব্যস্ত ছিলাম এবং মানুষের সাথে আমার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু যখনই আমার মধ্যে বৃদ্ধ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল, তখন পরিচিত সকলকেই আমি মন্দ মনে করতে লাগলাম।'

'আমি যাদের জানি না, আল্লাহ্ তাদের উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন। আমার এমন কোন গুনাহ্ নেই, যার জন্য আমার ক্লেশ বা দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হবে।' কারণ যাদের সাথে কোন পরিচয় নেই, নিশ্চয়ই তাদের কোন হক নষ্ট করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। সুতরাং তাদের সাথে পরিচয় না হয়েই পাপ থেকে বেঁচে গেছেন বলে কবি মনে করেছেন।

অপরপক্ষে আমি (সুফিয়ান ইবনে উয়াইনীয়া) এমন সব ব্যক্তিকে ভালবাসতে শুরু করেছি, যাদের মধ্যে ইনসাফের উৎসই বিলুপ্ত। কথিত আছে, অতঃপর তিনি তাঁর গৃহের দরজায় লিখে দিলেনঃ আমাকে যারা চিনে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কল্যাণ করুন। আর আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য কল্যাণের কোন কিছুই দান করো না। কেননা আমার যত ক্লেশ, দুর্ভোগ ও কষ্ট তার মূল কারণ এরাই।

অন্যত্র একটি কবিতায় বলা হয়েছেঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা সে সব ব্যক্তির কল্যাণ ও মঙ্গল করুন, যাদের সাথে আমার কোন বন্ধুত্ব বা পরিচয় হয়নি। কেননা মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ও বন্ধুত্বের দরুনই আমাকে কষ্ট, বিপদাপদ ও ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়।

হযরত ফুযায়েল (রা) বলেছেনঃ এটা এমন একটি সময় যে, এখন নিজের জিহবাকে সংযত রাখো, নিজেকে বড় মনে করো না, নিজের অন্তঃকরণের চিকিৎসা করো এবং সেই সঙ্গে হুকুম-আহকাম দৃঢ়ভাবে পালন করতে থাক ও নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিত্যাগ করে চলো।

সুফিয়ান সওরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হও, আখিরাতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ এবং মানুষ থেকে এমনভাবে পলায়ন কর, যেরূপ ব্যাঘ্র দেখে পলায়ন করা হয়।

হযরত আবূ উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ এমন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই দেখলাম না, যিনি আলোচনার শেষে এ কথাটি বলেন না যে, তুমি যদি

'আমি বরাবর মখ্লূকের প্রতীক্ষায় ব্যস্ত ছিলাম এবং মানুষের সাথে আমার সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু যখনই আমার মধ্যে বৃদ্ধ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল, তখন পরিচিত সকলকেই আমি মন্দ মনে করতে লাগলাম।'

'আমি যাদের জানি না, আল্লাহ্ তাদের উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন। আমার এমন কোন গুনাহ্ নেই, যার জন্য আমার ক্লেশ বা দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হবে।' কারণ যাদের সাথে কোন পরিচয় নেই, নিশ্চয়ই তাদের কোন হক নষ্ট করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। সুতরাং তাদের সাথে পরিচয় না হয়েই পাপ থেকে বেঁচে গেছেন বলে কবি মনে করেছেন।

অপরপক্ষে আমি (সুফিয়ান ইবনে উয়াইনীয়া) এমন সব ব্যক্তিকে ভালবাসতে শুরু করেছি, যাদের মধ্যে ইনসাফের উৎসই বিলুপ্ত। কথিত আছে, অতঃপর তিনি তাঁর গৃহের দরজায় লিখে দিলেনঃ আমাকে যারা চিনে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কল্যাণ করুন। আর আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য কল্যাণের কোন কিছুই দান করো না। কেননা আমার যত ক্লেশ, দুর্ভোগ ও কষ্ট তার মূল কারণ এরাই।

অন্যত্র একটি কবিতায় বলা হয়েছেঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা সে সব ব্যক্তির কল্যাণ ও মঙ্গল করুন, যাদের সাথে আমার কোন বন্ধুত্ব বা পরিচয় হয়নি। কেননা মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ও বন্ধুত্বের দরুনই আমাকে কষ্ট, বিপদাপদ ও ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়।

হযরত ফুযায়েল (রা) বলেছেনঃ এটা এমন একটি সময় যে, এখন নিজের জিহবাকে সংযত রাখো, নিজেকে বড় মনে করো না, নিজের অন্তঃকরণের চিকিৎসা করো এবং সেই সঙ্গে হুকুম-আহ্কাম দৃঢ়ভাবে পালন করতে থাক ও নিষিদ্ধ বিষয়কে পরিত্যাগ করে চলো।

সুফিয়ান সওরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হও, আখিরাতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ এবং মানুষ থেকে এমনভাবে পলায়ন কর, যেরূপ ব্যাঘ্র দেখে পলায়ন করা হয়।

হযরত আবূ উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ এমন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই দেখলাম না, যিনি আলোচনার শেষে এ কথাটি বলেন না যে, তুমি যদি

প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান হওয়াটাকে পছন্দ না কর, তবে বুঝবে, এটা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি আনন্দের সওগাত।

যা হোক, এ ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্য পরিলক্ষিত হয়। তার সব কিছু এ গ্রন্থে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এ বিষয় সম্পর্কেই আমি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করছি। গ্রন্থটির নাম হলো—'কিতাব আখলাকুল আবরার ওয়ান্নাজাতু মিনাল আশরায়ে'। যদি এ সম্পর্কে আরো অধিক বিষয় জানতে চান, তবে উক্ত গ্রন্থটি পাঠ করুন। তাতে অনেক আশ্চর্যজনক ও অমূল্য বিষয় জানতে পারবেন। এখানে কেবল আভাস দিলাম — কাবণ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় কারণ--মখ্‌লূক থেকে স্বাতন্ত্র্য ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বনের দ্বিতীয় কারণ এই যে, মখ্‌লূকের সাথে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা শামিল না হয়, তবে এমতাবস্থায় রিয়া, আত্মপ্রদর্শনী প্রভৃতি কারণ উদ্ভূত বিষয় এসে আল্লাহ্‌র ইবাদতের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে—এ সবই বান্দার মধ্য থেকে সামনে এসে হাযির হয়।

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মায আর্‌রাযী সত্যই বলেছেনঃ মানুষের সাথে মেলামেশাই রিয়ার একটি প্রধান উপজীব্য। যারা সত্যিকারের যাহেদ (দুনিয়া ত্যাগী), তারা এসব বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাকতেন—এমনকি এজন্য তারা মানুষের সাথে মেলামেশাই পরিত্যাগ করেছেন।

হরমে হায়ান হযরত উয়ায়েস করনী (র)-র নিকট আরয করেছিলেন, 'আপনি সাক্ষাৎ দান করে আমাকে গৌরবান্বিত করুন। জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ আমি তোমার সাথে এমন একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছি যা সাক্ষাতকারের চাইতে অনেক বেশী উপকারী। এ সম্পর্কটি হলো, তোমার অসাক্ষাতেই তোমার জন্য দোয়া করা। কেননা সাক্ষাৎ ও প্রদর্শনের মধ্যে রিয়া ও প্রর্দশনী প্রকাশের আশংকা বিদ্যমান থাকে।

ইব্রাহীম আদহাম (র) যখন একবার আগমন করেছিলেন তখন সুলায়মান খাওয়াসকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন না কেন? তিনি জবাব দিলেনঃ আমি একটি বিদ্রোহী শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ করাকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার চাইতে বেশী পছন্দ করি। সুতরাং আমি কি করে তাঁর সাথে

সাক্ষাৎ করতে আসবো? সুলায়মান খাওয়াসের এ মন্তব্য উপস্থিত সকলের নিকটই অসহ্য বোধ হতে লাগল। তখন তিনি ব্যাখ্যা করে বললেনঃ আমার আশংকা এই যে, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার ফলে আমি তার জন্য একটি গৌরব ও প্রদর্শনীমূলক বস্তু হয়ে না পড়ি। অপরপক্ষে যদি শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ হয়, তবে তাকে তাঁর নিকট আগমন করার পথে আমি বাধা দিব।

আমার ওস্তাদ এক মারেফাত-পন্থীর সাথে একদা সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রথমে কিছুক্ষণ তাঁরা উভয়ে কথাবার্তা বলে কাটিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয়েই দোয়া শুরু করলেন। দোয়ার মধ্যে আমার ওস্তাদ সাহেব বলতে লাগলেনঃ আমরা যে মজলিসে এখন বসে আছি, এর চাইতে ফযীলতপূর্ণ মজলিসের কথা আমার স্মরণেই আসে না। তখন সেই মারেফত পন্থী বলতে লাগলেনঃ আমি এমন কোন বৈঠকেই থাকি নাই, যে বৈঠকে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভয় জন্মেছে — কেবল এ বৈঠকে ব্যতীত। কেননা আপনি কি উত্তম শিক্ষাপ্রদ এবং মূল্যবান কথা আমার সামনে বর্ণনা করেন নাই? আমিও তো তাই করেছি। তাহলে নিশ্চয়ই এতে করে রিয়া হয়ে গেছে। এ কথা শুনে আমার ওস্তাদ সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর হিঁচকি দেখা দিল। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেনঃ

"আহা, যদি এমন তৌফিক হাসিল হতো যার দ্বারা অত্যন্ত ভীত অবস্থায় সর্বনিয়ন্তার দরবারে ইনসাফের দরখাস্ত পেশ করতে পারা যায়। আল্লাহ্ তা'আলার সামনে নিজের গুনাহ্ খাতা নিয়ে অনুতপ্ত হয়ে হাযির হয়েছি। তিনি ছাড়া তো আমার উপর দয়া প্রদর্শনের আর কেউ নেই। আয় বিশ্ব-প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট সে সব গুনাহ্গারের প্রত্যেকের জন্যই মাগফিরাত কামনা করছি, যারা গুনাহ্র বাড়াবাড়ি করেছে সত্য, কিন্তু অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে রাতের আঁধারে এই বলে দোয়া করছেঃ কি অনুতাপ এমন গুনাহ্ যে সমগ্র বিশ্বকেই ঘিরে ফেলেছে। যাহেদ ও আবেদ ব্যক্তিদের সাক্ষাতকারেরই এ অবস্থা। তাহলে বুঝতেই পারা যায় নাফরমান ও দুনিয়া লোভী ব্যক্তিদের সাক্ষাতকার কোন পর্যায়ে পড়ে? তাছাড়া মূর্খ ও বদকারদের তো কথাই নেই।

অত্যন্ত গোলযোগ ও জটিলতা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে এ কালটি? বর্তমানে মানুষ কেবল লোকসান আর লোকসানেই লিপ্ত রয়েছে। এ সব

গোলযোগ ও জটিলতা তোমাকেও ইবাদতে ইলাহী সম্পর্কে উদাসীন করে ফেলবে, অথচ মানুষের সাহচর্যে লাভজনক কিছুই হবে না। অধিকন্তু আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য যতটুকু অগ্রসর হয়েছিলে, তাও ধ্বংস করে দেবে। কেননা আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য যে সব গুণ অর্জন করেছ, যুগের হাওয়ায় নিপতিত হলে তাও সংরক্ষণ করতে তোমার মুশকিল হবে, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়বে।

সুতরাং মানুষ থেকে নিঃসঙ্গ ও একা জীবন যাপন এবং এ গোলযোগপূর্ণ যুগের আবহাওয়া থেকে দূরে অবস্থান অবশ্য কর্তব্য। এমতাবস্থায় পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর করুণাধারায় তোমার হেফাজতের ব্যবস্থা করবেন।

নির্জনতা ও নিঃসংগতা জীবন অবলম্বন নির্দেশ

এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সামনে মখলূক অর্থাৎ সৃষ্ট-জগতের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কোন্ পর্যায়ে কিভাবে আমাদের নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন করা উচিত, সে সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, এমন অনেকেই আছেন, যাদের মখলূক থেকে জ্ঞান অথবা অন্য কোন কিছু গ্রহণের প্রয়োজনই নেই এবং তাদের কাছেও মানুষের কোন প্রয়োজন নেই। এই শ্রেণীর মানুষের পক্ষে মানুষ থেকে নিঃসঙ্গতা অর্জনই উত্তম। জুম'আ, জামা'আত, ঈদ, হজ্জ ও ইলমের মজলিস-এ সব ব্যতীত আর কখনো মানুষের সাহচর্যে তার না যাওয়াই উত্তম। তবে সাংসারিক বিষয়ের মধ্যে যদি এমন কোন জরুরী ব্যাপার দেখা দেয়, যা না হলেই চলে না—তাহলে সে ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। সব সময় নিজেকে আত্মগোপন রাখার এবং যে বিষয়ে জ্ঞান নেই অথবা যে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়, তার প্রকৃত রূপটিকেই দৃঢ়বদ্ধভাবে আঁকড়িয়ে থাকাই তার কর্তব্য।

এ শ্রেণীর ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন করতে চান এবং মখলূক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে কোন অবস্থাতেই কোনক্রমেই কারো সাথে যেন সাক্ষাৎ না করেন-- এমনকি, জুম'আ জামা'আতেও নয়। অবশ্য যদি মানুষ সাক্ষাৎ পরিত্যাগ ও সম্পূর্ণ নির্জনতা অবলম্বন লাভজনক বিবেচিত হয়।

এ ব্যবস্থাটি (অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের জন্য জামা'আত, জুমা পরিত্যাগ করা) দুইভাবে কার্যকরী করা যেতে পারে। প্রথমত, এমন কোন জায়গায় চলে যেতে হবে, যেখানে উক্ত আহকামগুলো আদৌ ফরয হবে না। যেমন, কোন নির্জন পাহাড়ের চূড়া-- যেখানে কোন জনবসতি নেই। ইবাদত গোযার ব্যক্তিগণ মানুষ ও অন্যান্য মখ্‌লূক থেকে দূরে থাকার জন্য এ উপায়টিই বেশি অবলম্বন করে থাকেন-- এটা অধিক কার্যকরীও হয়।

দ্বিতীয়ত, যদি সত্যিকারভাবে জানতে পারা যায় যে, উক্ত আহকামগুলো আদায় করতে গিয়ে মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে যে ক্ষতি সাধিত হবে, তা আহকামগুলো পরিত্যাগ করার চাইতে মারাত্মক--তাহলে তাঁর পক্ষে আহকামগুলো পরিত্যাগ করার একটি কৈফিয়ত পাওয়া যেতে পারে।

আমি স্বয়ং মক্কায় কতিপয় এমন ব্যক্তিকে দেখেছি যারা বায়তুল্লাহ্‌র নিকট অবস্থান করা সত্ত্বেও এবং সুস্থ শরীরে থাকা অবস্থায়ও জামা'আতে হাযির হতেন না। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে আমার মনে সন্দেহের উদয় হলে আমি একদিন তাঁদের একজনের নিকট বিষয়টি প্রকাশ করলাম। তখন তিনি সে ওজরই জানালেন, যা আমি এই মাত্র বলে এসেছি (অর্থাৎ যদি সত্যিকারভাবে কেউ উপলব্ধি করতে পারেন যে, জামা'আত পরিত্যাগ করার চাইতে তাতে যোগদানের ফলে মানুষের সাথে মেলামেশায় অধিক ক্ষতি হবে।)

একথার পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি সত্যিকারভাবে বুঝতে পারা যায় যে, মসজিদে জামা'আতে হাযির হওয়ার অর্জিত সওয়াবের দ্বারা মসজিদে যেতে ও মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে যে গুনাহ্ হবে তার ক্ষতিপূরণ হবে না।

আমি বলছি, এসব ব্যাপারে অপারগের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অপারগতা সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল। তিনি মানুষের অন্তঃকরণের খবর সবচাইতে বেশী জানেন। মোটকথা, জুম'আ ও জামা'আতে মানুষের সাথে মেলামেশা করবে। তবে নির্জনতা অবলম্বনের সুষ্ঠু উপায় হল মানুষ ও মখ্‌লূকাত থেকে দূরে কোথাও গিয়ে অবস্থান করা— যাতে কোন প্রকারেই এ সবের ঝঞ্ঝাটে পড়তে না হয়। যেখানে গেলে জুম'আ-জামা'আত— এ সব দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনই না হয়, তেমন জায়গায়ই চলে যাওয়া উচিত।

কেননা কোন শহরে বা জনসমাজে অবস্থান এবং সকলের মধ্য থেকে কোন ওজরের ভিত্তিতে জুম'আ ও জামা'আতে হাযির না হওয়ার যে (অধিকতর ক্ষতির আশঙ্কায়) অবস্থাটি বর্ণিত হলো, তা উপলব্ধি করা কঠিন কাজ। কারণ এ বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষমতা ও অন্য ধরনের উপলব্ধি শক্তির প্রয়োজন। তা না হলে তার উপর থেকে উক্ত আহকামের বাধ্যবাধকতা দূর হলো কিনা, তা সঠিকভাবে বুঝতেই পারবে না। তাছাড়া, এ ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও কু-ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কাও বিদ্যমান। প্রথম দু'টি পন্থাই বরং নিরাপদ ও সহজ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক

যে ব্যক্তি জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের নিকট প্রত্যাশী অথবা তার নিকটই মানুষ জ্ঞান লাভেচ্ছু কিংবা ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর নিকট মানুষের প্রয়োজন রয়েছে— যেমন, কোন ব্যক্তি জনসমাজে থাকলে তিনি হয়তো কোন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন বা কোন বিদ'আত দূর করতে সক্ষম কিংবা কথায় বা কাজে মানুষকে নেক কাজের দিকে আহবান করতে পারেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার ক্ষমতাও রাখেন— এমতাবস্থায় এ শ্রেণীর লোকের পক্ষে মানুষের সঙ্গ ত্যাগ ও নির্জনতা অবলম্বন কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। বরং মানুষের মধ্যেই তার অবস্থান করা উচিত। কারণ তাতে আল্লাহ্ তা'আলার মখ্লূকের নসীহতের কার্য হবে, আল্লাহ্র দীনের হেফাজত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দ্বারা আহকাম-আরকানও বর্ণিত হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ وَسَكَتَ الْعَالِمُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ -

যখন বিদ'আত আত্মপ্রকাশ করে এবং আলিম নীরবতা অবলম্বন করে তেমন আলিমের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ নাযিল হোক।

যখন কোন আলিম বিদ'আতপূর্ণ সমাজে অবস্থান করে নীরবতা অবলম্বন করবেন, তখন তাঁর বেলায়ই উপরিউক্ত হাদীস প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায় তিনি সেখান থেকে দূরে চলে গিয়ে নির্জনতা ও নীরবতা অবলম্বন করতে চাইলেও তা জায়েয হবে না।

ওস্তাদ আবি বকর বিন ফুরক সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি স্থির করলেন যে, আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য মখলূক থেকে আলাদা অবস্থান করবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি পাহাড়ে উঠছিলেন। এমন সময় তাঁকে সম্বোধন করে আওয়াজ এলোঃ 'আয় আবূ বকর! যখন তুমি আল্লাহ্ তা'আলার মখলূকের মধ্যে তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শনের পর্যায়ে উপনীত হয়েছ, তখনই তুমি আল্লাহ্র বান্দাদের পরিত্যাগ করে চলেছ। এ আহবান শুনে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং এ কারণেই ওস্তাদ আবি বকর বিন ফুরক তাঁর অবশিষ্ট জীবন মানুষের সাহচর্যেই কাটিয়েছেন।

মামুন বিন আহমদ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ওস্তাদ আবি-ইসহাক কোন এক ইবাদত গোযার ব্যক্তিকে বলেছিলেনঃ

جبل لبنان يا اكلة الحشيش –

তুমি তো মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতদের বিদ'আতের হাতেই সমর্পণ করেছ, আর নিজে এখানে এসে বনের ঘাস চিবিয়ে দিন গোযরান করছ।

ইবাদত-গোযার ব্যক্তি এ কথার জবাবে বললেনঃ মানুষের সাথে অবস্থানের শক্তি ও ক্ষমতা আমার নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বরং সেই ক্ষমতা ও শক্তি দান করেছেন।

অতঃপর আবি ইসহাক মানুষের মধ্যে অবস্থানকেই স্বীকার করে নেন এবং শরীয়তের একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এ বুযুর্গদের মধ্যে ইলমের যেমন পরিপূর্ণতা ঘটেছিল তেমনি আমলের ব্যাপারেও তাঁরা নজীর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া, আখিরাতের খাঁটি পথ অবলম্বনের ব্যাপারে তাঁদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিক্ষমতা ছিল। আল্লাহ্ এ সকল বুযুর্গ ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

এখানে আরও একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণীয় যে, যে ব্যক্তির নিকট ধর্মীয় ব্যাপারে সমাজ নির্ভরশীল, মানুষের মধ্যে অবস্থানের জন্য তাঁর দু'টি জিনিসের অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রথমত, অসীম ধৈর্য, বিপুল সহিষ্ণুতা, উদার দৃষ্টি ও সকল ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের যোগ্যতা। দ্বিতীয়ত, সমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারে যদিও তিনি সশরীরে স্বয়ং অবস্থান করবেন, তথাপি তাঁকে

সকল বিষয় থেকে আলাদা থাকতে হবে। সুতরাং যখন তিনি কথাবার্তা বলবেন, তিনি ধর্মীয় বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেবেন। যদি কেউ সাক্ষাৎ করতে আসে, তবে তার মর্যাদা ও সম্মান অনুযায়ী তাকে মর্যাদা দান ও সম্মান প্রদর্শন করবেন। যদি মানুষ তাঁকে উপেক্ষা করে বা তাঁর সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়, তবে এ অবস্থাকে সৌভাগ্য মনে করবে। সমাজ যদি নেক ও সত্য কাজে ব্যাপৃত হয়, তবে তার বিরোধিতা করবে অথবা তা থেকে দূরে অবস্থান করবে। অবশ্য যদি দেখা যায় যে, উপদেশ কাজে আসবে, তবে উক্ত কার্যে বাধা দান করবে বা নিজের গোস্বা প্রকাশ করবে। এমনিভাবে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে তাঁকে তাঁর হক আদায় করতে হবে। মানুষের সাক্ষাৎ বা ইবাদতে অংশ গ্রহণ করে হোক অথবা সমাজে যে বিষয়ের অভাব আছে, তা পূরণ করেই হোক--ধর্মীয় ব্যাপারে সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব তাঁর আছে, তা পালন করবে। মনে রাখবে, এর কোন বদলার প্রত্যাশী হতে পারবে না। এ ধরনের কোন ধারণা রাখা এবং ধর্মীয় ব্যাপারে মানুষের মনে অসঙ্গত ধারণা সৃষ্টি করাও চলবে না। যদি সামর্থ্য থাকে, তবে ধর্মীয় ব্যাপারে হক আদায়ের জন্য অকুণ্ঠচিত্ত থাকবে।

সমাজের মন্দ দিকগুলো দূর করার চেষ্টা করবে। তাদের খোশখবর দান করবে। নিজেকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং নিজের অভাবের বিষয় সর্বদা গোপন রাখবে। তাহলে মানুষ বাহ্যত তাঁকেই তাদের অনুসরণীয় মনে করবে এবং অন্তরেও তাঁর ন্যায় হওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করবে।

এ সব বিষয় ছাড়া তাঁর জন্য আরও কতিপয় কর্তব্য রয়েছে। যথা নিজের ব্যাপারেও সর্বদা সতর্ক ও সচেতন এবং বিশেষ ইবাদতে লিপ্ত থাকতে হবে। যেমন হযরত উমর আল-ফারুক (রা) বলেছেনঃ যদি রাতে বিশ্রাম লাভ করি, তাহলে আমার নফসকে লোকসানের দিকে ঠেলে দিতে হয়, আর যদি দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করি, তবে মানুষের হক নষ্ট করতে হয়। সুতরাং এই দুই সময়ের মধ্যে বিশ্রাম নেয়ার অবকাশ কোথায়?

উপরিউক্ত বিষয়টিকেই কতিপয় কবিতার মধ্যেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যেমন—

যদি তুমি ইমামদের জীবনাদর্শের প্রতি আকর্ষণ অনুভব কর তবে নিজের নফসকে এমন দৃঢ় কর, যেন বিপদাপদ তোমাকে টলাতে না পারে। নফসকে

আত্মমর্যাদায় বলীয়ান করে প্রতিটি খারাপ জিনিস উদ্ভবের মুকাবিলা করতে হবে এবং এমনিভাবে ধৈর্য শিক্ষা দেবে যে, তা যেমন বক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

তোমার জিহ্বা থাকবে নীরব, তোমার চতুর্দিক থাকবে বন্ধ। তেমনি তোমার গোপনীয়তা থাকবে সত্যিই লুক্কায়িত—বুদ্ধিমানের নিকট এটাই সবচাইতে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে।

তোমার মন্দ সমালোচনা হবে, দরজা থাকবে বন্ধ। মুখে থাকবে মুচকি হাসি—কিন্তু পেট থাকবে খালি। তোমার অন্তর আহত, তোমার ব্যবসা অচল, তোমার মর্যাদা বিলুপ্ত—সর্বত্র কেবল তোমার দোষ-ত্রুটির আলোচনা। তবুও দিনরাত তুমি কাল ও মানুষের অভিশাপ হজম করে চলেছ। অন্তরে যদি তাঁদের (মহৎ ব্যক্তির) আদর্শ অনুসরণের আকঙ্খা পোষণ কর, তবে দিনে মানুষের কাজে পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা ব্যতীতই লিপ্ত হয়ে যাও এবং রাতে সেই মিলনানন্দে ডুবে যাও, একই কাফেলার অন্য লোক যে আনন্দের খবরও জানে না।[১]

সুতরাং জীবনের রাত্রিসমূহকে সে মহাসঙ্কটপূর্ণ ও কঠিন দিনের উপায় লাভে নিয়োজিত কর, যে দিন অন্য কোন কিছুই কাজে আসবে না।

মোটকথা, মানুষের মধ্যে অবস্থানকালে স্বয়ং মানুষের সাহচর্যে থাকবে ঠিক; কিন্তু অন্তর থাকবে বহু দূরে—অতি দূরে। আল্লাহ্‌র কসম, এ অবস্থায় উপনীত হওয়া খুবই কঠিন। সংসারটাও বড়ই সংকুল। এ বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের ওস্তাদ সাহেব ওসীয়ত করতে গিয়ে বলেছেনঃ আয় বৎস, যুগের মানুষের সাথে অবস্থান করলেও তাদের সৃষ্ট স্রোতের টানে ভেসে যেও না। তিনি আরও বলেছেনঃ ব্যাপারটা খুবই কঠিন। কেননা, জীবনটা জীবিতদের সাথে আর অনুসরণ করতে হয় মৃত ব্যক্তিদের।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেছেনঃ মানুষের সাথে মেলামেশা কর, কিন্তু তোমার অন্তর যেন তাদের সাথে কথা না বলে। তাঁর এ কথাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মহান, সন্দেহ নেই।

ফিতনার যুগে আলিমদের কর্তব্য

ফিতনা যখন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করবে, প্রতিটি কাজই বিপরীত হওয়া শুরু করবে, মানুষ ধর্মীয় বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, মুমিনকে কোন কাজের

যোগ্য মনে করা হবে না, কেউই আলিমের সন্ধান করবে না, উপদেশপূর্ণ বাক্যের কোন মূল্য থাকবে না এবং নিজের ধর্মের ব্যাপারেও যখন কেউ সাহায্য করবে না— মানুষের সর্বস্তরে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ফিতনা যখন পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে— বিশেষ শ্রেণীর মানুষ ধর্মীয় নির্দেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে—এমতাবস্থায় আলিমের জন্যও নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন এবং জনসাহচর্য পরিত্যাগ করে গোপনে জীবন যাপনের একটা ওজর পাওয়া যেতে পারে। আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি যেসব বিষয় বর্ণনা করলাম সে সঙ্কটপূর্ণ ও কঠিন যুগেই কেবল তা বিদ্যমান থাকবে, তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে? সুতরাং বাহ্য দৃষ্টিতে ধরা না পড়লেও আদতে এর মধ্যেই মানুষের সাহচর্য ত্যাগ ও নির্জনতা এবং নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বনের নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। বিষয়টিকে খুব গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কেননা এ ক্ষেত্রে ভ্রান্তির খুবই আশঙ্কা এবং তাতেই ক্ষতির আশঙ্কাও বেশী।

এখন হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) কি বলেননি যেঃ

لَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّ يَدُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَى الْجَمَاعَةِ وَاِنَّ الشَّيْطَانِ ذِئْبُ الْاِنْسَنِ يَاخُذَ الشَّاذَةَ والنَّاجِيَةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالْقَلَادَةَ * وقَالَ اَنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَرْدِ وَهُوَ مِنَ الْاَثْنَيْنِ اَبْعَدُ–

জামা'আত ও সংঘবদ্ধতাকে আঁকড়ে থাক; কেননা জামা'আতের উপরই আল্লাহ্‌র রহমত বিদ্যমান। (আর মনে রাখবে) শয়তান হলো মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন, দূরে ও প্রান্তে অবস্থানকারী এবং যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে পৃথক হইয়া একা থাকে, শয়তান তাকে ধরে নিয়ে যায়।

এবং তিনি কি আরও বলেননিঃ 'শয়তান নিঃসঙ্গ ও একা ব্যক্তির সাথে সাথে থাকে। কিন্তু দু'জন হলেই দূরে অবস্থান করে?'

হ্যাঁ, সত্যই উপরিউক্ত কথাগুলো রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং বলেছেন। কিন্তু তিনি তো একথা বলেছেন যে, নিজের গৃহকে আঁকড়ে থাক, বিশেষ বিশেষ লোকের সাহচর্য অবলম্বন করো এবং সাধারণের সংশ্রব একেবারে বর্জন করো। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা) যেমন জামা'আতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি গোলযোগপূর্ণ সময়ে মানুষের সংশ্রব বর্জন ও নির্জন জীবন যাপনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর এতদুভয় নির্দেশের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। বরং দু'টি নির্দেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে নেয়া দরকার। প্রথমত, রসূলুল্লাহ্ (সা) যেখানে জামা'আতকে আঁকড়ে থাকার কথা বলেছেন, সেখানে তিনি জামা'আত অর্থে ধর্মীয় বিষয় ও ধর্মীয় আহকাম সম্পর্কে বলেছেন। কেননা, উম্মতে মুহাম্মদীয়া কখনও অধর্মের ব্যাপারে একমত হতে পারে না এবং এ ক্ষেত্রে কেউ যদি ইজমায়ে উম্মতের বিরুদ্ধে চলে যায়, তবে তার ক্ষেত্রে উক্ত হাদীস প্রযোজ্য হতে পারে অথবা জমহুর উলামাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাপারে রায় প্রকাশ করলে, তার জন্যও এ হাদীস সাবধান বাণী হিসেবে প্রযোজ্য হয়। তেমনি জমহুর উলামাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও হতে পারে। এসবই পরিত্যাজ্য কাজ এবং এগুলোর পরিণাম স্বভাবতই বিপদগামী হওয়া। তবে হ্যাঁ, ধর্মের ঘনিষ্ঠতা রক্ষার জন্যই যদি পৃথক হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সেটা আলাদা কথা। তা অবশ্যই করা যেতে পারে।

'জামা'আত আঁকড়ে থাক'— এর দ্বিতীয় অর্থ এ হতে পারে যে, জুম'আ জামা'আত পরিত্যাগ করো না। কেননা এগুলোর মধ্যে ধর্মীয় শক্তি প্রকাশ পায় এবং এগুলোর মধ্যেই ইসলামের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। তাছাড়া, এ ধরনের অনুষ্ঠানের দ্বারা কাফির ও বিধর্মীদেরও তুষানলে নিপতিত করা সম্ভব হয়। সুতরাং এ ধরনের অনুষ্ঠান আল্লাহ্র রহমত থেকে নিশ্চয়ই শূন্য থাকবে না। এজন্য আমরা একা জীবন অবলম্বনকারীকে বলে থাকি, উত্তম ও ভাল সকল সমাবেশেই তার অংশগ্রহণ করা উচিত— অপরপক্ষে গোলযোগপূর্ণ ও ক্ষতিকারক সমাবেশ থেকে দূরে অবস্থান সে করতে পারে। কেননা এসব স্থানে প্রতি পদেই অসুবিধা বিদ্যমান।

'জামা'আত আঁকড়ে থাক'-এর তৃতীয় অর্থ এ হতে পারে যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা দুর্বল, শান্তি ও নিরাপদকালে তাদের আলাদা না হওয়ার জন্য তাকীদ করা হয়েছে।

তবে যারা ধর্মীয় ব্যাপারে শক্তিশালী এবং আল্লাহ্র সকল বিষয়েও যথেষ্ট ওয়াকিফহাল, তারা যদি দেখতে পায় যে, ফিতনার সে সময় এসে গেছে,

রসূলুল্লাহ (সা) যে যুগের ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করে গেছেন এবং সে সময় নির্জনতা ও একাকী জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে তখন তাদের জন্য নির্জনতা ও একাকী জীবন যাপনই উত্তম ও ভাল। কেননা, এমন যুগে মানুষের সাথে মেলামেশার মধ্যে ফাসাদ ও বিপদের ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে। তবে ইসলামী বিষয় সংক্রান্ত সমাবেশ এবং সাধারণ কল্যাণকার্য থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত নয়। যদি মানুষের সংস্রব বর্জন, নির্জনতা ও একাকী জীবন যাপনই একান্ত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোন পর্বত শীর্ষে অথবা কোন জনমানবহীন স্থানে চলে যাওয়াই উত্তম। কারণ তথায় গেলে নিজের ধর্মকে অন্তত সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

মোদ্দাকথা আল্লাহ্ যাকে জুম'আ, জামা'আত ও অন্যান্য সকল ইসলাম বিষয়ক সমাবেশে অংশ গ্রহণের সামর্থ্য দান করেছেন সে যেখানেই আর যে পরিস্থিতিতেই অবস্থান করুক না কেন, তাতে তার অংশগ্রহণ করা উচিত — যাতে করে এর মহান সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হতে হয়। কেননা ধর্মীয় সমাবেশ—তা সে যেখানেই হোক না কেন, আল্লাহ্র তরফ থেকেই হয়ে থাকে। অবশ্য অনেক সময় মানুষের দোষ-ত্রুটির জন্য তাতেও ফাসাদ ও ফাটল সৃষ্টি হয়ে যায়। আবদাল ও কুতুবদের সম্পর্কে এ ধরনের কথাই শুনতে পাওয়া যায়। ইসলামী বিষয়ে যেখানেই কোন সমাবেশ হোক না কেন, তাঁরা সেখানেই উপস্থিত হন। তাঁরা যেখানেই যেতে চান, সেখানেই পৌঁছে যেতে পারেন। তাঁদের জন্য ধরাটি একটি পদক্ষেপের স্থান মাত্র।

বর্ণিত আছে, এ সকল বুযুর্গের জন্য যমীনকে গুইয়ে দেয়া হয় এবং শান্তির সাথে তাদের আহবান করা হয়। আর তাদের উপর বিস্তার করে থাকে কেরামত ও কল্যাণের ছায়া।

যাঁরা এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছেন, আমি তাঁদের মোবারকবাদ জানাই। আল্লাহ্ তাদের নিজ সংকল্পে দৃঢ় থাকার তৌফিক দান করুন, যারা নিজের নফসকে রেহাই দেয়ার ব্যাপারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেছে আর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে অপারগ, আমাদের ন্যায় অন্বেষীদের তিনি সাহায্য করুন।

আমি নিজের অবস্থাকে নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াস পাবঃ

অন্বেষী দল সাফল্য অর্জন করেছে এবং তারা তাদের উদ্দেশ্যে উপনীত হয়ে গেছে। আর বন্ধুগণ বন্ধুদের দ্বারাই সাফল্য অর্জন করেছে। অথচ, আমরা

উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া ও সে পথ থেকে বিরত থাকা-এ দুইয়ের মাঝখানে কম্পমান ও অস্থিরতায় ডুবে আছি। নিকটকে দূর আর দূরের মধ্যে নৈকট্য তালাশ করছি। তাছাড়া এ নফসটিও এমন যে, সে অসম্ভব জিনিসকেই জ্ঞানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং আমাদের এমন জিনিস পান করাও যাতে সকল বেদনা দূর হয়ে যায় এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের সোজা পথ হাসিল হয়।

ওহে রোগ-জীর্ণদের চিকিৎসক! এ রোগীদের আহত অন্তঃকরণের বর্তমানে এ একটিই কামনা। ওহে বিপদ ত্রাতা, আমি জানি না, কি দিয়ে আমার এ রোগের চিকিৎসা করবো। আমি এ-ও জানি না যে, কি দিয়ে কিয়ামতের দিন সাফল্য লাভ করবো?

এবার আসল আলোচনায় আসা যাক। উদ্দেশ্য ছিল নির্জনতা ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন সম্পর্কে আলোচনা করা। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি। যা হোক যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তো বলেছেনঃ আমার উম্মতের বৈরাগ্য হলো মসজিদে অবস্থান করা। এর দ্বারা সংসার ত্যাগ ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বনকে তো নিষিদ্ধই করা হয়েছে।

এর জবাবে আমি বলবো যে, হুযূর (সা)-এর এ নির্দেশটি ফিতনার যুগের জন্য নয়। তাছাড়া, মসজিদে অবস্থান করলেও যদি মানুষের সাথে সাক্ষাতকার এবং অন্য কোন ব্যাপারে জড়িত না হয়, তাহলে বাহ্যিক দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে থাকলেও অন্তরের দিক দিয়ে তো সংসার থেকে আলাদাই রয়ে যায়। সংসার ত্যাগ ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বনের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তাই। জাহেরী ও বাতেনী--একই সাথে উভয় দিক থেকে সংসার ত্যাগ ও নিঃসঙ্গ জীবন অবলম্বন আমার উদ্দেশ্যও নয়। ইব্রাহীম বিন আদহাম (র) এ দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেনঃ একাকী অথচ সমষ্টিগতভাবে অবস্থান করতে হবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্র প্রতি থাকবে বন্ধুত্ব আর মানুষের প্রতি থাকবে ভীতি।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উলামায়ে কিরামের দরসগাহ এবং সূফীদের খানকায় অবস্থান করা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের অভিমত কি? উলামায়ে কিরামের নিকট এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত উত্তম ও একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কেননা, এতে উভয় উদ্দেশ্যই সফল হতে পারে। প্রথমত, এ পদ্ধতি গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন

মানুষ থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যটিও হাসিল হয় অপরপক্ষে তেমনি মানুষের সাথে মেলামেশা করা—অথচ তাদের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা (আল্লাহ্‌র ইবাদতের পথে মানুষ সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা) থেকে আত্মরক্ষা পাওয়াও সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, এ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে জুম'আ, জামা'আত প্রভৃতিতেও অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করা যায় এবং ইসলামী নির্দেশাদি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা সম্ভব হয়।

সুতরাং এ পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে সংসার ত্যাগের পন্থা অবলম্বনকারীরা যে নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন, তা লাভ করা সম্ভব হয় এবং সাধারণ মানুষের জন্য যেসব কল্যাণ সংশ্লিষ্ট এ অবস্থায় তাও বিদ্যমান থাকে। কেননা, এতে করে সাধারণ মানুষের সাথে থাকার ফলে শক্তি, বরকত এবং নসীহত হাসিল হয়। সুতরাং উলামায়ে কিরামের দরস্‌গাহ ও সূফীদের খানকাহ্ এতদুভয় স্থানে অবস্থান করার পন্থাটি সবদিক থেকেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উত্তম। এ পন্থাটিই সর্বাপেক্ষা নিরাপদও। এ সকল দিক বিবেচনা করেই অধিকাংশ আবেদীন এ পন্থাটি অবলম্বন করেছেন। ফলে তাঁরা মানুষের মধ্যে অবস্থান করে আল্লাহ্‌র বান্দাদের দীনের ব্যাপারে সাহায্য এবং তাদের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার সুযোগ লাভ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা মানুষের মধ্যে অবস্থান করার ফলে মানুষও তাঁদের শিষ্ট-রীতিনীতি প্রত্যক্ষ এবং তাঁদের আদর্শ-চালচলন লক্ষ্য করে তাঁদের অনুসরণ করার সুযোগ লাভ করেছে। কেননা মুখে বক্তৃতা করার চাইতে পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষাদানই অধিক উপকারী। সুতরাং ধর্মীয় জ্ঞান ও ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এ পদ্ধতির অনুসরণই অধিকতর উত্তম, ফলপ্রসূ ও সঠিক বলে বিবেচনা করা হয়।

অতঃপর প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পীর সাহেবদের সাথে মুরীদদের অবস্থান উচিত— না নিঃসঙ্গ ও আলাদা জীবন অবলম্বন করা উচিত।

যদি সূফীগণ (পীর সাহেবগণ) প্রথম শ্রেণীর ও সলফে সালেহীনের আদর্শের দৃঢ় অনুসারী হন, তবে তাঁকে উত্তম ধর্মীয় ভ্রাতা, উৎকৃষ্ট সাথী এবং আল্লাহর বান্দাদের উৎকৃষ্ট সাহায্যকারী বিবেচনা করা যায়। সুতরাং তাঁর থেকে আলাদা জীবন অবলম্বন সঙ্গত নয়। আসলে তাঁরা হচ্ছেন প্রকৃত যাহেদ-পন্থী। শোনা যায়, এ শ্রেণীর লোক মানুষকে পরহেজগার হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেন এবং সত্য অবলম্বন ও সবর ইখতিয়ার করার উপদেশ দিয়ে থাকেন।

আর যদি সূফীগণ সলফে সালেহীন থেকে বর্ণিত মত ও পথ পরিত্যাগ করেন, তাহলে সে মুরীদের পক্ষে তার পীরের ব্যাপারে সেই হুকুমই বর্তাবে, যে হুকুম তার জন্য অন্যান্য মানুষের ব্যাপারে বর্তে থাকে। এমতাবস্থায় মুরীদ যদি পীরের নির্ধারিত সীমার মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে, নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখে এবং পরের উত্তম কার্যে অংশগ্রহণ ও সমস্ত জঞ্জাল থেকে দূরে অবস্থান করে—তাহলে সে দুনিয়া ত্যাগী ছাড়াও নিঃসঙ্গ ও একাকী জীবন অবলম্বনকারী হিসেবে পরিগণিত হবে এবং পলায়নী মনোবৃত্তি অবলম্বনকারীদের থেকে দূরে অবস্থান করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে।

অতঃপর যদি মুরীদ নিজেকে পীরের নির্ধারিত সীমা থেকে বহির্গত করে নিজের সংশোধন ও সুষ্ঠুতা বিধানের ইচ্ছা করে এবং তার সাহচর্যে যে আপদ আসতে পারে, তা থেকে মাহ্ফুজ হয়ে যায়-তথাপি মনে রাখা উচিত যে, এ সব দরসগাহ্ ও খানকাহ্ প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী কেল্লার মতোই। যে ব্যক্তি চেষ্টা করে, সে চোর-ডাকাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ স্থানে আশ্রয় নিতে পারে। অপরপক্ষে বাইরে অবস্থানকারীর অবস্থা ঠিক উন্মুক্ত ময়দান ও প্রান্তরে বিচরণকারীর মতো, যেখানে শয়তানের অশ্বারোহী সৈন্য সর্বদা প্রদক্ষিণ করে থাকে। তারা সে অসহায় বিচরণকারীর মাল-মাত্তা লুট করে নেয় অথবা তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে পারে। এভাবে প্রান্তরে বিচরণ করা যে কতখানি ঝুঁকির ব্যাপার, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেখানে চতুর্দিকেই বিপদের আশঙ্কা—চারদিকেই বিক্ষিপ্ত মহাশত্রুদল। তারা যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করে যা খুশী তা-ই করবার সুযোগ পায়। এমতাবস্থায় দুর্বল মানুষের জন্য মজবুত কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন গত্যন্তর নেই। তবে শক্তিশালী ও সচেতন মানুষের কথা আলাদা। তাদের কাছে কিল্লা এবং প্রান্তর একই সমান। সুতরাং তার জন্য পীর নির্ধারিত সীমারেখা ত্যাগে কোন ভয় বা আশঙ্কার কারণই নেই। তথাপি সকল অবস্থায়ই সীমারেখা ও কিল্লায় অবস্থানই নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট। কেননা, এর ব্যতিক্রমে সাহসী হলেও সর্বদাই তাকে বিব্রত ও পেরেশান অবস্থার সাথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়।

এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুরীদ এবং কল্যাণকামী ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ্র কোন বান্দার হাত ধরা এবং তাঁর সাথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করাই সবচাইতে

উত্তম ও ভাল। শক্তিমান বয়স্ক মানুষের জন্যও এ সব বুযুর্গ ব্যক্তিকে উপেক্ষা বা তাদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে কোন বাধা নেই।

তবে এসব ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনার পর অত্যন্ত সতর্কতার সাথেই অগ্রসর হওয়া দরকার।

যা হোক, এবার ধর্মীয় ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ ও পত্রাদি বিনিময় প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

ধর্মীয় ভ্রাতার সাথে সাক্ষাৎ করা আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অন্তঃকরণের সংশোধন সহ আল্লাহ্ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছার উৎকৃষ্ট একটি পন্থা। তবে এ ব্যাপারেও দু'টি শর্তের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। প্রথমত, এ ব্যাপারে কিছুতেই বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। নবীয়ে আকরাম (সা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলেছিলেনঃ তিন দিন পরপর সাক্ষাৎ করবে—এ ধরনের সাক্ষাতই অতিরিক্ত বন্ধুত্বের কারণ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, রিয়া প্রদর্শনী মনোভাব, গীবত ও বাজে বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে। তেমনি তাঁর (যার সাথে সাক্ষাৎ বা পত্র বিনিময় করা হয়) অধিকারসমূহও রক্ষা করতে হবে—যাতে করে তোমার উপর এবং তোমার ভ্রাতার উপর কোন প্রকারের বিপদাপদ নেমে না আসে।

বর্ণিত আছেঃ একদা ফুযায়েল (র) ও সুফিয়ান (র) পরস্পর আলাপ-আলোচনা করলেন। অতঃপর উভয়েই খুব কাঁদতে লাগলেন। সুফিয়ান(র) বললেন, 'আয় আবূ আলী (ফুযায়েলের ডাক নাম), আমি এমন কোন বৈঠকেই যোগদান করিনি, যার সওয়াব এ বৈঠকের সওয়াবের চাইতে অধিক বলে আশা করতে পারি।' অপরপক্ষে ফুযায়েল (র) বললেন, 'আমি এ বৈঠকের চাইতে অপর কোন বৈঠকের জন্য আমার অধিক ভয়ের কারণ মনে করছি না।'

তখন সুফিয়ান (র) জিজ্ঞেস করলেন, 'একথা আপনি কেন বলছেন?' ফুযায়েল (র) জবাব দিলেন, 'কেন, আপনি কি খুব ভাল ও উত্তম কথা আমার নিকট বর্ণনা করেননি এবং আমিও কি আপনার সামনে তালাশ করে খুব ভাল ও উত্তম কথা পেশ করিনি?' এ ব্যাপারটিই আপনার ও আমার জন্য গরিমার কারণ হয়ে গেছে'। ফুযায়েলের এ কথা শুনে সুফিয়ান (র) খুবই কাঁদতে লাগলেন।

সুতরাং তোমার সাথীর সাথে তোমার বসা ও সাক্ষাতকার সতর্ক ও সতর্ক দৃষ্টির সীমারেখা যেন অতিক্রম করে না যায়। এভাবে সব কিছু প্রতিপালন করতে

সক্ষম হলে তোমার সংসার ত্যাগ এবং মানুষের সংস্রব থেকে দূরে থাকার মধ্যেও কোন ত্রুটি এবং খারাপ কিছু থাকবে না। এমতাবস্থায় তোমার এবং তোমার সাথীর উপর কোন আপদ এবং দুর্ভোগ আপতিত হবে না। বরং এতে লাভ হবে বিরাট উপকার এবং মহৎ কল্যাণ।

এখন প্রশ্ন হলোঃ নিঃসঙ্গ-জীবন অবলম্বন ও মানুষের সংস্রব থেকে দূরে থাকার জন্য সহজে শক্তি অর্জনের ব্যাপারে কোন্ বিষয় উৎসাহ ও প্রেরণা দান করতে সক্ষম? সহজ ও বিনাক্লেশে এ শক্তি অর্জনের জন্য তিনটি মৌলিক পন্থা অনুসরণ করাই যথেষ্ট হতে পারে। প্রথমত, ইবাদতে ইলাহীতে সমস্ত সময় ব্যয়িত করতে হবে। কেননা ইবাদতে ইলাহীই অধিকতর উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ বৃত্তি। অপরপক্ষে মানুষের সাথে মোলাকাত, দীনতা ও চিত্তবিনোদনের নিদর্শন। সুতরাং যখন তুমি দেখবে যে, তোমার নফস প্রয়োজন ও আবশ্যকতা ছাড়াও মানুষের সাথে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলার জন্য আগ্রহান্বিত এবং উদগ্রীব হয়ে উঠছে, তখন বুঝবে যে, এটা একটা বেহুদা ব্যাপার মাত্র। এর পরিণতি চিত্তবিনোদন ও অবাধ্যতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। জনৈক ব্যক্তি কি সুন্দরভাবেই না বিষয়টি অভিব্যক্ত করেছেনঃ

'তোমার অবসর আমাকে নিরাপত্তার দিকে টেনে এনেছে।' অনেক সময়ই অবসর লোক বেহুদা কার্যে লিপ্ত হয়। সুতরাং যখন তুমি পূর্ণভাবে ইবাদতে ইলাহী আদায় করা শুরু করবে, তখন মুনাজাতে ইলাহীর মধুরতা ও মিষ্টতা তোমার অনুভূত হতে থাকবে। আর আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য-পিপাসা মানুষের সাহচর্য থেকে তোমাকে রাখবে বিরত এবং তাদের সাথে উঠা-বসা ও কথাবার্তা বলার ব্যাপারে তোমার মনে হবে ভীতির সঞ্চার।

হযরত মূসা (আ) যখন মুনাজাতে ইলাহী থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর মনে মানুষ সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। এমনকি, মানুষের কথাবার্তা যাতে তাঁর কানে না পৌঁছাতে পারে, তজ্জন্য তিনি তাঁর কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিতেন। সে সময় মানুষের কথাবার্তা মানুষের কথাবার্তার মতোই ছিল, কিন্তু বর্তমানে তো তা গাধার আওয়াজের ন্যায়ই শ্রুত হয়। সুতরাং বুযুর্গ ব্যক্তিগণ যা বলে গেছেন, তা-ই অবলম্বন করা কর্তব্য। তাঁরা বলে গেছেনঃ

আল্লাহ তা'আলাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও। সমস্ত মানব জাতিকে এক দিকে সরিয়ে রাখ। আল্লাহ্‌র সত্যিকারের মহব্বতকামী প্রত্যাশীর

একথা ভালভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, সে মানুষের মধ্যে থাকবে সত্য, কিন্তু তাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না। মনে রাখবে, মানুষকে তুমি যেভাবেই নাড়াচাড়া কর না কেন, দেখবে সর্বাবস্থায়ই সে বিচ্ছুর ন্যায়। দ্বিতীয়ত, লোভ ও লালসাকে তোমার প্রথমবারেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা উচিত; তাহলে তোমার জন্য মানুষের সংস্রব থেকে দূরে থাকা এবং নিঃসঙ্গ ও একাকী জীবন অবলম্বন সহজ হয়ে যাবে। কেননা, যখন মানুষের নিকট তোমার লাভালাভের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকবে না, তখন তোমার সাথে তাদের থাকা আর না থাকা একই সমান হয়ে দাঁড়াবে।

তৃতীয়ত, মানুষের সংস্রবের আপদসমূহ নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করো এবং নিজের অন্তঃকরণে তা বদ্ধমূল করে দাও।

এ তিনটি বিষয়কে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারলে স্বভাবতই তোমাকে তা মখ্‌লূকের সংস্রব থেকে সরিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরিয়ে দেবে এবং তুমি সুযোগ লাভ করবে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও খেদমতের জন্য নির্ঝঞ্ঝাট ও নিঃসঙ্গ জীবন। এমনিভাবেই তুমি আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যতের দুয়ারের আসল চাবিকাঠি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হবে। অবশিষ্ট হেফাজত ও তৌফিকের সবটুকু আল্লাহ্‌ই দান করবেন।

তৃতীয় সোপান

শয়তান

শয়তানের সাথে সংগ্রাম ঘোষণা করা উচিত এবং তাকে পরাজিত ও পদাবনত করার সতর্ক চেষ্টার প্রয়োজন। এ কাজটি দু'টি উপায়ে সম্পন্ন করা সম্ভব।

প্রথমত, মনে করতে হবে যে, শয়তান পথভ্রষ্টকারী প্রকাশ্য শত্রু। তোমার ভাল ও কল্যাণের সাথে তার কোন সংস্রব নেই। সর্বদাই তার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা কেবল তোমার ধ্বংস ও বরবাদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এমন শত্রু থেকে কখনও নিজেকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ মনে করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌র পবিত্র কালামের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি গভীরভাবে অনুধাবন করুনঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لَّاتَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

আয় আদম সন্তান, আমি কি তোমাদের তাকীদ করে দিই নি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করো না। কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।
(সূরা ইয়াসীনঃ ৬০)

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا -

নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রাণের শত্রু, তোমরাও তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ কর। (সূরা ফাতিরঃ ৬)

এ আয়াত দু'টি অনুধাবনের পর শয়তানকে ভয় করার ও তাকে দুশমন হিসেবে মনে করার জন্য আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে যে, শয়তানকে তোমার শত্রুতার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; সে সব সময় তোমার সাথে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এবং সতত তোমার পিছনে সে লেগে আছে। সুতরাং তুমি যদি এ ব্যপারে বেখবর ও গাফেল থাক, তবে তোমার অবস্থা কি হবে এবং তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অথচ, মজার ব্যাপার এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজ কথা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে আহবান করছ, ব্যাপারটি শয়তানের কার্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তার আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও সাধ্য-সাধনার সম্পূর্ণ বিপক্ষে। সুতরাং তুমি যেন শয়তানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রস্তুতি নিয়েছ। এমতাবস্থায় শয়তানও যে তোমার সাথে যুদ্ধ শুরু করবে এবং তোমাকে ধোঁকা ও দাগাবাজির বিপাকে ফেলবার চেষ্টা করবে, তাতে সন্দেহের কি আছে? এমনকি দেখবে, যে তোমার অবস্থার মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, একটা মহাধ্বংসের প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে তোমার ভিত্তিটিকেই সে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এরপরও তার সঙ্গ লাভ করে কিভাবে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকার কল্পনা করা যায়? এটা সত্যি মহা কঠিন ও মারাত্মক জটিল কাজ। কেননা দুনিয়াকামী বিভ্রান্ত ও অজ্ঞরা, যারা শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ ও সংগ্রাম ঘোষণা করেনি বরং তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে, শয়তান তাদেরও ক্ষমা করে না, তাদের দুনিয়া ও আখিরাত দুই-ই বরবাদ করে দেয়। সুতরাং তুমি যেহেতু তার সাথে শত্রুতা সৃষ্টি ও যুদ্ধ করার পথে অগ্রসর হয়েছ, সেহেতু সে তোমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইবে না। কেননা এতে করে তুমি যেন সমস্ত মানুষের সাথে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ও শত্রুতা সৃষ্টির ঘোষণা করে দিয়েছ। আর তাছাড়া ইবাদতে ইলাহী ও জ্ঞানকামীর পক্ষে এ তো বিশেষ প্রকারের দুশমনী বটেই। তোমার এ ব্যাপারটি তার নিকট খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং শয়তানের সাথে তোমার দুশমনী ও তার বিরোধিতার কারণে সে তোমার সহযোগী, সাহায্যকারী হবে। এ সাহায্যকারীদের মধ্যে তোমার নফস ও প্রবৃত্তি সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী হবে। মনে রাখবে, শয়তানের কার্যের অনুকূলও বহু কারণ, মাধ্যম ও পন্থা রয়েছে, সেসব বিষয়ে তুমি প্রকৃত গাফেল।

ইয়াহিয়া ইবনে মায়ায আরয়াসী ঠিকই বলেছেনঃ শয়তান সর্বদাই অবসর ও সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তুমি সংসার নিয়ে ব্যস্ত। শয়তানকে তুমি কি করে

উপেক্ষা করতে পার? তুমি শয়তানকে বিস্মৃত হতে পার, কিন্তু সে তোমাকে বিস্মৃত হয় না। তাছাড়া তোমার নফসটিই তোমার বিরোধী এবং শয়তানের সাহায্যকারী। সুতরাং শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং তাকে পরাজিত ও পদানত করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করা অপরিহার্য কর্তব্য। নতুবা ধ্বংস ও বরবাদী থেকে পরিত্রাণ লাভ যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি মহা সংকটপূর্ণ।

শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার উপায়

শয়তানের সাথে যুদ্ধ ও তাকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করার দু'টি পথ রয়েছে। এ দু'টি পথ অবলম্বন করলে এ ব্যাপারে পূর্ণ সাফল্য অর্জন হতে পারে।

প্রথমত, শয়তানকে দূর করার কৌশল ও পন্থা হিসেবে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য কামনাই উত্তম। এছাড়া এ ব্যাপারে আর সহজ কোন পন্থা দেখা যায় না। অনেক বুযুর্গ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেননা, শয়তান এমন একটি কুকুর, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পিছনে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি যদি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা কর ও তাকে তাড়িয়ে দিতে অগ্রসর হও, তাহলে তোমাকে সে ক্লান্তিকর অবস্থায় নিপতিত করবে এবং তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেবে। এমনকি, হয়ত তোমার উপর সে সাফল্য লাভ করে তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে। সুতরাং এ কুকুরকে যাতে তোমা থেকে সরিয়ে দূর করে দেয় তজ্জন্য এর প্রভুর নিকটেই সাহায্য কামনা করা উচিত হবে। এটাই উত্তম পন্থা।

দ্বিতীয়ত, অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শয়তানের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা এবং তার বিরোধিতার ব্যাপারে ও তাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়াই উচিত। আমার মতে, উপরিউক্ত পন্থা দু'টি একত্র করে নেয়াই উত্তম ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে শয়তানের সৃষ্ট প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করতে হবে। এটা আল্লাহ্‌র নির্দেশ বটে। কেননা আল্লাহ্‌ই তাকে উত্তমভাবে পরাভূত করতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনিই যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে, শয়তান আমাদের উপর জিতে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে, এটা আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা বিশেষ। বুঝতে হবে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাধনা, ঈমানের শক্তি, সততা এবং সত্যে দৃঢ়তার প্রমাণ দেখতে চান। তিনি পরিমাপ করতে চান আমাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিমাণ। ঠিক এমনি

কারণেই জিহাদে সবর ও ঈমানের পরীক্ষা এবং শাহাদতের অসীম সওয়াবের ভাগী করার জন্য কাফিরদের পরাজিত ও ধ্বংস করার শক্তি তাঁর থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের উপর অনেক সময় কাফিরদের বিজয়ী করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

'যাতে করে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের জেনে নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে শহীদ করে নিতে পারেন।'

'তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে যারা জিহাদ করেছে, তাদের এখনও দেখেনই নাই কিংবা যারা সবর করেছে তাদেরও দেখেন নাই?'

শয়তানের সাথে যুদ্ধ ও সংগ্রাম এ কারণেও করতে হয়। আলিমদের মতে শয়তানের সাথে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করার তিনটি পন্থা রয়েছেঃ

প্রথমত, শয়তানের প্রভাব বিস্তার করার কৌশল ও অবলম্বন সম্পর্কে উত্তমভাবে জ্ঞান হাসিল করা। কারণ উত্তমভাবে তার গতি-প্রকৃতি ও কর্মকৌশল পুরোপুরি তোমার জানা থাকলে সে কিছুতেই তোমার উপর প্রভাব বিস্তারে সাহসী হতে পারবে না। চোর যদি বুঝতে পারে যে, গৃহস্থ তার আগমনের বিষয়টি টের পেয়েছে, তা হলে সে যেমন ভেগে যায়–এ ব্যাপারটিও তদ্রূপ।

দ্বিতীয়ত, শয়তানের আহবানের প্রতি কোন প্রকারেই কর্ণপাত না করা এবং কোনরূপ গুরুত্ব না দেয়া। সেই সঙ্গে নিজের মনকে কিছুতেই তার সাথে সংশ্লিষ্ট করবে না এবং কিছুতেই তার কোন ব্যাপারেই অনুগামী হবে না। কেননা শয়তান ঘেউ ঘেউকারী কুকুরের ন্যায়। যদি তুমি তার প্রতি লক্ষ্য কর, তাহলে সে তোমাকে আক্রমণ করে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে পারে। আর যদি তুমি তাকে এড়িয়ে চল তা হলে সে নিশ্চুপ হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, সর্বদাই নিজের অন্তরে ও মুখে আল্লাহ তা'আলার নাম জপ করতে থাকবে। রসূল (সা) বলেছেন, শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার যিকির এমনি, যেমন মানুষের কাছে কোন একটি খাদ্যের লোকমা অর্থাৎ মানুষের কাছে খাদ্যের লোকমা থাকলে যেমন তা খেয়ে থাকে তেমনি আল্লাহ্র স্মরণ শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দেয়।

এখন প্রশ্ন হল, শয়তানের ধোঁকাবাজি ও চালবাজি প্রভৃতি কিভাবে জানা যাবে এবং তার স্বরূপ উপলব্ধির উপায় কি? মনে রাখবে, মানুষের অন্তরে

শয়তানের কুমন্ত্রণার যে ভিড় হয়, তাকে নিক্ষিপ্ত তীরের সাথে তুলনা করা যায়। শয়তানের কুমন্ত্রণার শ্রেণী বিভাগগুলো সঠিকভাবে জানার পরই এ বিষয়টি অনুধাবন করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, শয়তানের কৌশলগুলো এমন যে, মনে হবে যেন অনেকগুলো দরজা খুলে দিয়েছে। শয়তানের ধোঁকাবাজি ও জুলুমশাহীর পরিচয় জানার পরই এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

উলামায়ে কিরাম শয়তানের কুমন্ত্রণায় শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বহু বিষয়কে এর আওতাভুক্ত করেছেন, আমি নিজেও এ সম্পর্কে 'তালবিসে ইবলিস' নামক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছি। এখানে অবশ্য অত সব বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হবে না; তবু ইন্‌শাল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের মূল ভিত্তি কোথায়, তা আলোচনা করছি।

শয়তানী কুমন্ত্রণার ভিত্তিমূল

আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দার অন্তঃকরণে একজন ফেরেশতাকে বসিয়ে দিয়েছেন। এ ফেরেশতা সব সময় বান্দাকে ভাল ও কল্যাণের প্রতি আহবান জানায়। এ ফেরেশতাকে বলা হয় 'মালাহুম'। আর এ ফেরেশতার আহবানকেই 'ইলহাম' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

অপরপক্ষে, একটি শয়তানকেও আবার বান্দার অন্তঃকরণে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এ শয়তান বান্দাকে হরদম মন্দ ও পাপ কাজে আহবান করে। এ শয়তানের নাম 'ওয়াস্‌ওয়াস'। আর এ আহবানকেই বলা হয় 'ওয়াস্‌ওয়াসা'।

অধিকাংশ আলিমের অভিমত এই যে, 'মালাহুম' উত্তম ও কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোন দিকে আহবান জানায় না, তেমনি ওয়াস্‌ওয়াস' বা শয়তান মন্দ ও পাপ ব্যতীত অন্য কোন কাজে আহবান করে না।

কিন্তু আমার উস্তাদের মতে, শয়তানও কোন কোন সময় উত্তম ও কল্যাণের দিকে আহবান করে, কিন্তু তার আসল লক্ষ্য থাকে মন্দ ও পাপের প্রতি এগিয়ে যাওয়া। মানুষ যাতে ভাল কাজ থেকে বিরত থাকে তজ্জন্য অনেক সময় শয়তান অন্য একটি উত্তম কাজের প্রতি তাকে আহবান জানায়। তেমনি অনেক সময় শয়তান মস্তবড় একটি গুনাহ্‌তে লিপ্ত করাবার জন্য মানুষকে উত্তম ও ভাল কাজের দিকে আহবান জানায়। এমতাবস্থায়, সে মানুষকে অতি সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, যাতে মানুষ গুনাহ্‌টিকে কিছুতেই ধরতে না পারে।

মানুষের অন্তরে এমনিভাবে দুই প্রকারের আহবানকারী অবস্থান করছে এবং তারা সর্বদাই সক্রিয়। এ আহবানকারীদের ডাক অন্তর সুস্পষ্টভাবেই শুনতে পায় এবং তাতে সাড়াও দিয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اِذَا وُلِدَ الاِ بْنُ اٰدَمَ مَوْلُوْدٍ قَرَنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِهٖ مَلَكًا وَقَرَنَ الشَّيْطَانَ بِهٖ شَيْطَانًا فَالشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى اُذُنِ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ الاَيْسَرِ وَالْمَلَكَا جَاثِمٌ عَلٰى اُذُنِ قَلْبِهِ الاَيْمَنِ فَهُمَا يَدْعُوْ انَهُ –

যখন কোন মানব সন্তান জন্মলাভ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য একজন ফেরেশতাকে নির্দিষ্ট করে দেন, তেমনি শয়তান তার দল থেকে একজন শয়তানকে সে শিশুর জন্য নির্দিষ্ট করে। অতঃপর নির্দিষ্ট ফেরেশতাটি শিশুটির ডান পার্শ্বে এবং নির্দিষ্ট শয়তানটি বাম পার্শ্বে স্থান করে নেয়। তারপর তারা নিজেদের কাজ শুরু করে দেয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের উপর একটি শয়তানের প্রভাব থাকে, তেমনি প্রত্যেক মানুষের উপর একজন ফেরেশতারও প্রভাব আছে। অর্থাৎ এদের আহবানের প্রভাব আছে। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রকৃতিতে এমন কতক উপাদান রেখে দিয়েছেন, যা কামভাবের প্রতি আকর্ষণকারী ও স্বাদ গ্রহণের প্রতি প্ররোচনাদায়ক। প্রকৃতপক্ষে এসব জিনিসই প্রবৃত্তি-লালসাকে সঙ্কটে নিপতিত করে। সুতরাং অন্তঃকরণের আহবানকারীর সংখ্যা তিন-এ উপনীত হলো।

যা হোক, মনে রাখা দরকার যে, এসব বিপদ ও প্রভাব বিস্তারকারী জিনিস, যা বান্দার অন্তরে অহর্নিশ সক্রিয় এবং তাকে কতক কাজে বিরত রাখছে এবং কতক কাজে প্ররোচনা দিচ্ছে, আহবান করছে, তারা বিভিন্ন রকমের এবং অন্তরে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। এ জন্য এদের বলা হয় 'খাতরাত' বা অনিষ্টকারক। যেমন কামনা প্রভৃতি। তাতে মোটামুটি এগুলোকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত, যা আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম থেকেই মানুষের অন্তঃকরণে সৃষ্টি করে দিয়ে থাকেন। এগুলোকে বলা হয় 'খাতের'। দ্বিতীয়ত, কতকগুলো মানুষের অভ্যাসের আনুকূল্য থেকে সৃষ্টি হয়, এগুলোকে বলা হয় প্রবৃত্তির কামনা। এ

ধরনের সকল কাজকেই এ শ্রেণীরই পর্যায়ভুক্ত মনে করা হয়। তৃতীয়ত, 'মালাহুম'-এর আহবানের পর প্রকাশিত হয় এবং এ ধরনের সকল কাজকে মালাহুম উদ্ভূত বলেই গণ্য করা হয়। এগুলোকে 'ইলহাম' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

চতুর্থত, কতকগুলো প্রকাশ পায় শয়তানের আহবানের পর। এ ধরনের সকল বিষয়কে শয়তানের কারসাজিরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। এগুলোকে বলা হয় 'ওয়াস্ওয়াসা'। এগুলোকেই 'খাওয়াতেরে শয়তান'ও বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে শয়তানের আহবানের সময়ই এগুলোর উদ্ভব হয়।

আরও মনে রাখা দরকার যে, মানুষের অন্তঃকরণে প্রথমত আল্লাহ্র তরফ থেকে যে খাতের প্রভাব বিস্তার করে, তা কখনো কল্যাণকর হয়, তা হয় কৃতজ্ঞতা ও প্রমাণাদির প্রতি দৃঢ়সংকল্প থাকার ফলে।

কখনো বা তা অমঙ্গলজনক হয়ে দেখা দেয়। পরীক্ষা ও কষ্ট অধিক হওয়ার কারণে এমন হয়ে থাকে। তবে 'মালাহুম' এর তরফ থেকে যে খাতের প্রকাশিত হয়, তা সর্বদাই উত্তম ও কল্যাণকরই হয়ে থাকে। কেননা, সে হচ্ছে বান্দার উপদেষ্টা ও মুর্শেদ। এ থেকে উত্তম ও কল্যাণকর ব্যতীত অন্য কোন কিছু প্রকাশই পায় না।

আর, শয়তানের পক্ষ থেকে যেসব খাওয়াতের প্রকাশিত হয়, তা সর্বদাই অমঙ্গলকর ও মন্দ হয়ে থাকে। কারণ, এগুলোর উদ্দেশ্যই মানুষকে বিভ্রান্ত করা, তার বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল বিনষ্ট করা।

তবে কখনো বা এগুলো ভাল রূপ ধরেও প্রকাশিত হয় কিন্তু লক্ষ্য সে একই— ধোঁকাবাজি ও পাপের পথে নিয়ে যাওয়া।

অপরপক্ষে, প্রবৃত্তির কামনা থেকে যেসব 'ওয়াসওয়াস' উদ্ভূত হয়, তা সব সময়ই মন্দ ও অকল্যাণকরই হয়ে থাকে। এর মধ্যে উত্তম ও কল্যাণের লেশমাত্র থাকে না।

অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন যে, প্রবৃত্তির কামনা থেকেও কখনো কখনো উত্তম ও কল্যাণের আহবান শ্রুত হয়, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে অতি মন্দ ও অত্যন্ত অকল্যাণকর কার্যে লিপ্ত করা— যেমন শয়তানের সাধারণ অভ্যাস তাই।

খাওয়াতের ও ওয়াস্ওয়াসের পার্থক্য

অতঃপর তিনটি বিষয় জানা অত্যন্ত জরুরী। কেননা এ তিনটি বিষয়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, খাতেরে খায়ের অর্থাৎ উত্তম খাতের ও খাতেরে শর অর্থাৎ মন্দ খাতের--এর মধ্যকার পার্থক্য উপলব্ধি। অতঃপর জানা দরকার, শর এরতেদায়ী অর্থাৎ যা প্রথম থেকেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং শয়তানী ও প্রবৃত্তির কামনা-উদ্ভূত খাতেরে শর-এর পার্থক্য। কেননা এসব যদিও পৃথক পৃথক জিনিস, তথাপি সামগ্রিকভাবে এগুলো একটা অপরটার অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে হয়। তৃতীয়ত, ইলহামী বা প্রাথমিক খাতেরে খায়ের এবং শয়তানী ও প্রবৃত্তির খাতেরে খায়েরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা অনুধাবন করা দরকার। কেননা, এসব পার্থক্য জানতে পারলে তবেই আল্লাহ্র তরফ থেকে কোন জিনিস এবং 'মালাহুমের' আহবানে উদ্ভূত কোন জিনিস, তার পরিচয় লাভ সম্ভব। অতঃপর এভাবেই শয়তানের আহবানে যেসব প্রভাব সৃষ্টি হয়, তার পরিচয় লাভ করে তা থেকেও বিরত থাকা সম্ভব।

প্রথম বিষয়

উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেছেন ঃ যখন তুমি খাতেরে খায়ের ও খাতেরে শর আলাদা আলাদাভাবে জানতে চাও এবং এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করার ইচ্ছা কর, তখন তোমাকে চারটি তুলাদণ্ডের মধ্যে ফেলে যে কোন একটি তুলাদণ্ডের মাধ্যমে তার পরিমাপ করে নেবে। তাহলেই বিষয়টি তোমার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পরিমাপের প্রথম তুলাদণ্ডটি হলো তোমার অন্তঃকরণে যেসব 'খাতরাত' বা প্রভাব বিস্তারকারী জিনিসের উদ্ভব হয়, তার প্রারম্ভটা কেমন, সেদিকে তুমি সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। যদি দেখতে পাও যে, শুরুটি শরীয়ত অনুযায়ী হয়েছে, তবে বুঝবে যে, জিনিসটি উত্তম, আর যদি তার বরখেলাফ হয় এবং কোন সন্দেহ থেকে তা উদ্ভূত মনে হয়, তাহলে বুঝবে যে, জিনিসটা মন্দ ও অকল্যাণকর।

যদি তুলাদণ্ডের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার না হয়, তাহলে অনুসরণপন্থার দ্বারা পরখ করবে। অর্থাৎ লক্ষ্য করবে যে, উহাতে সলফে সালেহীনের অনুসরণ হয়,

তবে বুঝবে যে, উহা উত্তম। আর যদি তাতে ফাসিক ও বিপদগামীদের অনুসরণ হবে বলে পরিলক্ষিত হয়, তাহলে বুঝবে যে, উহা মন্দ ও অমঙ্গলজনক।

এই তুলাদণ্ডের মাধ্যমেও যদি বিষয়টি পরিষ্কার না হয়, তাহলে প্রবৃত্তি ও কামনার আহবানের সাথে তার তুলনা করবে। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবে; যদি তৎপ্রতি স্বাভাবিকভাবে নফসের ঘৃণার সৃষ্টি না হয়, বরং কোন প্রকারের ভয়কে ভিত্তি করে ঘৃণার সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝবে যে, বিষয়টি উত্তম। আর যদি নফস আল্লাহ্ তা'আলার আশ্বাস ও পুরস্কারের ওয়াদায় নয়, বরং স্বভাবতই তৎপ্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তৎপ্রতি আসক্ত বলে মনে হয়, তবে বুঝবে বিষয়টা মন্দ। কেননা, নফসই হলো সকল মন্দের ভিত্তি ও মূল। এতে উত্তম ও কল্যাণকর কোন কিছুর লেশমাত্রও নেই।

যা হোক, উপরিউক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তুমি তোমার অন্তরে উদ্ভূত বিষয়টিকে পরীক্ষা কর এবং গভীরভাবে চিন্তা করে তাকে সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনা কর; তবে তোমার সামনে উত্তম প্রভাব বিস্তারকারী ও মন্দ প্রভাব বিস্তারকারীর পার্থক্য সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়বে।

অবশিষ্ট আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপর ভরসা। কেননা, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সকল ব্যাপারে তৌফিক প্রদান করেন। তিনি করুণাময় ও দয়াবান।

দ্বিতীয় বিষয়

অতঃপর তুমি যখন এই মন্দ প্রভাব বিস্তারকারীরই (১) শয়তানের তরফ থেকে উদ্ভূত, (২) কামনার আহবানে উদ্ভূত এবং (৩) আল্লাহ্র তরফ থেকে অন্তরে প্রথমে যে 'ওয়াসওয়াস' স্থাপিত রয়েছে, তার থেকে উদ্ভূত বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে চাইবে, তখন তোমাকে নিম্নোক্ত তিনটি পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রথমত, যদি তুমি সে ধোঁকাসমূহকে বলিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ পদ্ধতিতে উদ্ভূত হচ্ছে বলে অনুভব কর, তবে মনে করবে— হয় এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে অথবা কামনা-উদ্ভূত। আর যদি সেগুলোর অনুভব সন্দেহ ও বিক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়, তাহলে বুঝবে যে, বিষয়টি শয়তানের তরফ থেকে হয়েছে। সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রবৃত্তির কামনা চিতাবাঘের ন্যায়,

যখন সে যুদ্ধ ও সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তখন পরাজিত হলেও কিংবা সকল প্রকারের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও পেছনে হটে না। কিংবা সে খারেজীর ন্যায়, যে ধর্মীয় কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হলে নিহত না হওয়া পর্যন্ত সামান্যতমও প্রত্যাবর্তন করে না। আর শয়তান হলো সে ব্যাঘ্রের ন্যায়, যাকে একদিক থেকে তাড়িয়ে দিলে আবার অন্যদিক দিয়ে আগমন করে।

দ্বিতীয়ত, যদি তুমি গুনাহ্‌তে লিপ্ত হওয়ার পর সেসব আপদসমূহকে অনুভব কর, তবে বুঝবে যে, সে বিষয়ের ঘৃণ্যতা ও নীচতাকে প্রকাশ করার জন্য তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ –

কখনো এমন নহে, তাদের অন্তরে বদ-আমলের জং ধরে গেছে।

(সূরা মুতাফ্‌ফিফীন ঃ ১৪)

আমাদের শায়খ বলেছেন ঃ এভাবেই গুনাহ্ মনের উপর কাঠিন্য-জাল সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে পর্দার সৃষ্টি করে। পরে তাই কঠিন পাষাণ-জালে রূপান্তরিত হয়।

আর যদি এ 'ওয়াস্‌ওয়াস' প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত হয় এবং কোন গুনাহ্‌তে লিপ্ত হওয়ায় এমন হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটার শুরু হয়েছে তোমার নিজেরই তরফ থেকে। আর মনে রাখবে, এটার পেছনে শয়তানের কারসাজি সক্রিয় রয়েছে। অধিকাংশ 'ওয়াস্‌ওয়াস' এমনই হয়ে থাকে। কেননা এগুলোর শুরুই হয় অকল্যাণ ও মন্দের প্রতি আহবানের মাধ্যমে। এগুলোর প্রকৃত দাবি হল বিভ্রান্তি ও নাফরমানী। তৃতীয়ত, যদি দেখ যে, আল্লাহ্‌র যিকিরের পরেও 'ওয়াস্‌ওয়াসায়' কোন শক্তিহীনতা বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না তাহলে বুঝবে যে, এ 'ওয়াস্‌ওয়াসা' এসেছে কামনা থেকে। আর যদি দেখ যে, আল্লাহ্‌র যিকিরের ফলে তাতে শক্তিহীনতা ও দুর্বলতা অনুভূত হয়, তবে বুঝবে এটা সম্পূর্ণ শয়তানী 'ওয়াস্‌ওয়াসা'। এ বিষয়টিকেই من شر الوسواس الخناس এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। কিন্তু যখন সে আল্লাহ্‌র যিকির করে, তখন শয়তান পলায়ন

করে। অপরপক্ষে মানুষ যদি আলস্য ও উপেক্ষা নীতি অবলম্বন করে, তবে সে শয়তানের ধোঁকার শিকারেই পরিণত হয়।

অতঃপর তুমি যদি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে উদ্ভূত 'খাতের' ও ফেরেশতার তরফ থেকে উদ্ভূত 'খাতের'-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে চাও, তাহলে তোমাকে তিনটি পন্থায় আগাতে হবে। প্রথমত, যদি দেখতে পাও যে, 'ওয়াস্‌ওয়াসা'টি শক্তিশালী ও সরল, তাহলে বুঝবে যে, ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আর যদি তাতে কোন সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়, তবে বুঝবে ব্যাপারটি ফেরেশতার তরফ থেকে উদ্ভূত। কেননা, বিষয়টি আসলে উপদেশদাতার মতো। তোমার নিকট তা যে কোন দিক থেকে উদ্ভূত হতে পারে এবং তোমার সামনে সকল প্রকারের উপদেশপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে। সে চায় কেবল তুমি এ উপদেশ গ্রহণ করো এবং তার প্রতি আগ্রহী হও।

দ্বিতীয়ত ইজ্‌তিহাদ ও আনুগত্যের (اطاعت) পরেও যদি 'ওয়াস্‌ওয়াসা' দেখা দেয়, তবে বুঝবে এটা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকেই আসছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا –

যারা আমার পথে ক্লেশ সহ্য করে অগ্রসর হয়, আমি নিশ্চয়ই তাদের আমার পথ প্রদর্শন করে থাকি। (সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯)

তিনি আরও বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَ هُمْ هُدًى –

আর যারা ঠিক পথে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অধিকতর হিদায়ত দান করেন। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৭)

কিন্তু যদি ইজ্‌তিহাদ ও আনুগত্যের শুরুতেই ধোঁকা এসে পথ রুখে দাঁড়ায়, তবে বুঝবে এটা শয়তানের কারসাজি।

তৃতীয়ত, মূলনীতি ও বাতেনী আমলের ব্যাপারে যদি ধোঁকা উপস্থিত হয়, তবে বুঝবে সেটা আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই উদ্ভূত, আর যদি শাখা-প্রশাখা জাহেরী আমলের ব্যাপারে তা উপস্থিত হয়, তাহলে বুঝবে এটা ফেরেশতার

তরফ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কারণ, এ ধরনের 'ওয়াসাওয়াসা' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফেরেশতার তরফ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। তার কারণ এই যে, ফেরেশতা মানুষের বাতেনী বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়-- এটাই অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

এখন অবশিষ্ট রইলো সে 'খাতেরে খায়ের'-এর আলোচনা, যা বান্দাকে মন্দ ও অন্যায় কার্যে লিপ্ত করার জন্য তার অন্তরে উদিত হয়। এ সম্পর্কে আমাদের শায়খ বলেছেন ঃ চিন্তা করে দেখবে যদি তোমার অন্তরে উদিত কাজে তোমার মন আনন্দ লাভ করে, ভয়ের লেশমাত্র তাতে পরিলক্ষিত না হয়, দ্রুত তা করার ইচ্ছা হয়, বিলম্ব ভাল না লাগে, তদুপরি যদি সে কাজে অন্তর স্বস্তি ও শান্তি পায় এবং ভয় বা সংশয় না থাকে– সঙ্গে সঙ্গেই তাতে যদি পরিণতির প্রতি লক্ষ্যও না থাকে এবং দূরদর্শিতা পরিলক্ষিত না হয়, তবে বুঝবে যে, এটা শয়তানের তরফ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। সুতরাং সর্বতোভাবে এ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

আর যদি নফসকে এর বিপরীত পাও অর্থাৎ ভয় আছে, আনন্দ ও প্রফুল্লতা নেই, বিলম্বে স্বস্তি ও দ্রুত করার ইচ্ছা নেই, ভীতি আছে, স্বস্তি ও শান্তি নেই, পরিণতি সম্পর্কে সচেতন; অন্ধ আবেগ ও মত্ততার লেশমাত্র নেই, তাহলে বুঝবে, এটা আল্লাহ্ অথবা ফেরেশতার তরফ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

আমি মনে করি, মানুষের পক্ষে প্রফুল্লতা ও আনন্দ তার কাজে দূরদৃ৷৪তা সৃষ্টি করে না বরং তাতে লঘুত্ব এনে দেয় এবং এমন সওয়াবের স্মরণ উদিত হয়, যার ফলে তার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

বিলম্ব জিনিসটা খুবই উত্তম। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে আবার দ্রুততাই কাম্য। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلْعَجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ - اِلاَّ فِىْ خَمْسَةِ مَوَاضِعِ تَزْوِيْجُ الْبِكْرِ اِذَا اَدْرَكَتْ وَقَضَاءُ الدَّيْنَ اِذَا وَجَبَ وَتَجْهِيْزُ الْمَيِّتَ اِذَا مَاتَ وَ قَرَى الضَّيْفَ اِذَا نَزَلَ - وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ اِذَا اَذْنَبَ -

তাড়াতাড়ি শয়তানের তরফ থেকে উদ্ভূত-- পাঁচটি ক্ষেত্র ব্যতীত। (এ পাঁচটি ক্ষেত্র হলো) বয়ঃপ্রাপ্তা হলে সেই বালেগা মেয়েকে বিবাহ দেয়া; যখন

মেয়াদ এসে যায়, তখন ফরয আদায় করা; মানুষ মারা গেলে মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কাফন-দাফন করা; মেহমান আগমন করলে তার মেহমানদারী করা; এবং গুনাহ্ হয়ে গেলে অবিলম্বে তওবা করা।

এখন অবশিষ্ট রইল ভয়ের ব্যাপার। তবে এ ব্যাপারে উক্ত কাজ পুরোপুরি করা ও তা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক কবূল হওয়া সম্পর্কে আশঙ্কা বিদ্যমান থাকতে পারে।

আর নিষ্কলুষ ভাবটিকে সব সময় সামনে রাখা সম্ভব, যাতে করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বিষয়টির ভিত্তি উত্তম ও কল্যাণের উপর। আখিরাতে সওয়াব লাভ ও সে প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতেই তা সাধিত হবে।

শয়তানের ধোঁকাবাজি

মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও ইবাদতে ইলাহী থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে শয়তান যে চেষ্টা বা ধোঁকাবাজি করে, তা সাত প্রকারে প্রকাশ পায়।

প্রথমত, শয়তান মানুষকে ইবাদতে ইলাহীর পথে অগ্রসর হতেই বাধা প্রদান করে এবং তার সকল শক্তি দ্বারা মানুষকে ফিরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালায়। যদি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে শয়তানের এ ধোঁকাবাজি থেকে রক্ষা করেন, তাহলে বান্দার মনে এ চিন্তার উদয় হয় যে, আল্লাহ্র ইবাদত করা আমার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা, এ অস্থায়ী বাসস্থান থেকেই আমাকে আখিরাতের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। এ চিন্তা করে বান্দা শয়তানের ধোঁকাবাজি রদ করে দিতে সমর্থ হয়।

অতঃপর শয়তান মানুষকে আলস্য ও ঢিলেমী করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যদি বান্দাকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করেন, তাহলে বান্দার মনে এ চিন্তার উদয় হয় যে, 'আমার জীবন আমার আয়ত্তে নয়। সুতরাং আজকের কাজ কাল করব বলে ফেলে রাখার কোন যুক্তি নেই। যদি আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখি, তবে কালকের কাজ কবে করব? একথা তো সত্য যে, প্রতিদিনের জন্যই আলাদা আলাদা কর্তব্য-কর্ম রয়েছে। সুতরাং একটু আলস্যও আমার পক্ষে সম্ভব নয়'। এভাবেই মানুষ পুনরায় শতানের ধোঁকাকে রদ করে দিতে সমর্থ হয়।

অতঃপর শয়তান মানুষকে ইবাদতের মধ্যে তাড়াতাড়ি করার উস্কানি দিতে চেষ্টা করে এবং বলতে থাকেঃ 'তাড়াতাড়ি ইবাদত সেরে নাও, অমুক কাজটা তো করতে হবে।'

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যদি বান্দাকে শয়তানের এ প্রকারের ধোঁকা থেকেও রক্ষা করেন, তাহলে সে তখন চিন্তা করতে থাকে ঃ ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণভাবে অধিক আমল করার চাইতে উত্তম ও নিখুঁতভাবে অল্প আমল করাই উত্তম। সুতরাং শয়তান এবারও বান্দার নিকট ব্যর্থ হয়।

অতঃপর শয়তান সম্পূর্ণ নতুন পথ অবলম্বন করে এবং অপরকে দেখিয়ে রিয়ার সাথে ইবাদত করার প্ররোচনা দিতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যদি বান্দাকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করেন, তাহলে সে চিন্তা করতে থাকে ঃ 'যে কোন আমলই হোক না কেন, তা অপরকে দেখিয়ে লাভ কি? আল্লাহ্ তা'আলা যে আমার আমল প্রত্যক্ষ করছেন, তাই তো যথেষ্ট!' এই চিন্তা করার ফলে তার মন শয়তানী ধোঁকা থেকে রক্ষা পায়। ফলে, এবারও শয়তান মানুষের নিকট পরাজয় বরণ করে।

এবার শয়তান মানুষকে আত্মগরিমা ও অহঙ্কারে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করে এবং তাকে বলতে থাকে ঃ 'আহা' কত বড় কাজ তুমি করেছ, কত সুন্দর কাজই না সাধন করলে, আর কি উত্তমভাবেই না তুমি সে কাজটি করেছ।'

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাকে শয়তানের এ ধরনের ধোঁকাবাজি থেকে রক্ষা করেন, তবে তার অন্তরে এ চিন্তার উদয় করেন যে, 'এ আমল তো আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমতের দ্বারাই সাধন করতে পেরেছি। এতে আমার নিজের কি কৃতিত্ব আছে? তিনি আমাকে বিশেষভাবে তৌফিক দান করেছেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও রহমতের দ্বারা এ কার্য সমাধা করবার সুযোগ দিয়েছেন বলেই তো আমি তা করতে সক্ষম হয়েছি। যদি তিনি তৌফিক দান না করতেন এবং তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে আমল করার সুযোগ না দিতেন, তবে কিভাবে তা করতে পারতাম? তদুপরি তিনি যদি এ কাজের মূল্য না দিতেন, তাহলে আমার চেষ্টাতেই বা কি ফলোদয় হতো? যিনি এত অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন আমার জন্য, তাঁরই উদ্দেশ্যে আমার এ সামান্য হাদিয়া ইবাদত কতই বা মূল্য রাখে।' এভাবে চিন্তা করতে থাকলে বান্দার মন আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

ফলে, সে যত বড় নেক কাজই করুক না কেন, তাতে অহঙ্কার বা আত্মগরিমা দেখা দেবে না। ফলে, এ ক্ষেত্রেও শয়তানের ধোঁকা বিফলে পতিত হয়।

অতঃপর শয়তান তার এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করে। শয়তানের এ ধোঁকাবাজি সচেতন মানুষ ব্যতীত অন্য কেউ মালুমই করতে সক্ষম হয় না, শয়তানের এ ষষ্ঠ ধোঁকাবাজি অত্যন্ত মারাত্মক।

পদ্ধতিটি হলো এরূপ যে, শয়তান মানুষকে বলতে থাকে ঃ 'দেখ, তুই তো গোপনে গোপনেই সব করছিস, কিন্তু আল্লাহ্ তোর সমস্ত আমলই প্রকাশ করে দেবেন। তিনি তো প্রত্যেক আমলই আমলকারীর সাথে মিশিয়ে দিয়ে থাকেন'। শয়তানের এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনে তার আমলের প্রদর্শনী করার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি। কিন্তু যদি আল্লাহ্ তা'আলা তার সহায় থাকেন, তবে সে বান্দা এই বলে শয়তানের কথা প্রত্যাখ্যান করেন যে, 'আয় মালাউন, এতক্ষণ পর্যন্ত তো তুই আমার আমলকে ফাসেদ করার চেষ্টায় রত ছিলি, আর এখন এসেছিস আমার আমলকে সংশোধন করার জন্য, আসলে তোর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা বৈ কিছু নই। তিনি আমার মালিক এবং প্রভু। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে কোন জিনিসের প্রকাশ করে দেবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, তবে কোন বিষয়কে গোপন রাখবেন, তাতে আমার আপত্তির কি আছে? তিনি যদি চান আমাকে সম্মানিত করবেন, যদি চান তবে আমাকে মর্যাদাহীন এবং অসম্মানিত করতে পারেন— এ সকল ব্যাপার তাঁরই আয়ত্তে। আমার এ ব্যাপারে ভাবনার কোন কারণ নেই যে, আমার কোন আমল মানুষের সামনে জাহির হলো বা হলো না। এসব বিষয় মানুষের ক্ষমতার আওতায় নয়।' ফলে এবারও শয়তান নিরাশ হয়ে যায়।

অতঃপর সে শেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং মানুষকে বলতে থাকে, 'এসব নেক আমলের তোর প্রয়োজন বা দরকার কোথায়? তোকে যদি পুণ্যবান করে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তবে তো আমল না করলেও কোন ক্ষতি নেই। তেমনি যদি তোকে পাপিষ্ঠ ও দুর্ভাগ্য করে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তবে তো আমল দ্বারা তোর কোন ফায়দাই হবে না।' এ সময়ও যদি আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে শয়তানের এ ধোঁকা থেকে রক্ষা করেন, তবে সে বান্দা এই বলে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি তো একজন আল্লাহ্‌র বান্দা মাত্র। বান্দার জন্য তাঁর ইবাদত করে তাঁর নির্দেশ পালন অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য। আল্লাহ্ তাঁর

রাব্বিয়াতের দ্বারা সব কিছুই ওয়াকিফহাল আছেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হুকুম দেন, তিনি যা চান তা-ই করেন। আমি যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমল সর্বাবস্থায় আমার পক্ষে কল্যাণকর। কেননা আমি যদি পুণ্যবান হয়ে থাকি, তবে আমি অধিকতর সওয়াবের জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করব, আর যদি আমি পাপিষ্ঠই হয়ে থাকি, তথাপিও যাতে আমাকে নফসের উপর এ মালামত না করতে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন অবস্থাতেই আমাকে ইবাদতে ইলাহীর তৌফিক আদৌ দান করেন নি। তজ্জন্য আমার আল্লাহ্র ইবাদত করার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া, আমল আমার পক্ষে কোন অবস্থাতেই ক্ষতিকর নয়। কেননা, যদি আমাকে দোযখেও নিক্ষেপ করা হয়, তথাপিও গুনাহ্গার ও নাফরমান হিসেবে দোযখে যাওয়ার চাইতে আমি অনুগত ও ফরমাবরদার হিসেবে দোযখে যাওয়াই অধিক পছন্দ করি। সুতরাং কোনক্রমেই আমল আমার বেফায়দা হচ্ছে না। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য সওয়াব দানের ওয়াদা করেছেন। তাঁর ওয়াদা অত্যন্ত খাঁটি ও সত্য। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান রাখে ও আল্লাহ্র পথে আনুগত্য প্রদর্শন করে, তাকে আল্লাহ্ পাক সাক্ষাৎ দান করবেন, তাকে কখনো দোযখে নিক্ষিপ্ত করা হতে পারে না, বরং তাকে জান্নাতেই প্রবেশ করতে দেয়া হবে। তার এ জান্নাতে প্রবেশ জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে আমল করার ফলে উপযুক্ত হওয়ার জন্য হবে না, বরং তা হবে আল্লাহ্র খাঁটি ও পবিত্র ওয়াদা পূরণের কারণে।' এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَ عْدَهٗ –

আর তারা (জান্নাতিগণ) বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের তাঁর ওয়াদা পূরণ করে দেখিয়েছেন। (সূরা যুমার ঃ ৭৫)

আল্লাহ্ তা'আলা সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন। এসব বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সতর্কভাবে লক্ষ্য করা উচিত। কেননা, যেভাবে দেখা যায় ও শোনা যায়, সমস্ত ব্যাপারটি তেমনই। এর উপরই সমস্ত অবস্থা ও কর্মপ্রবাহকে অনুমান করে নেয়া যায়। সেই সাথে নেক কাজের তৌফিক ও গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার শক্তি দানের জন্য করুণা ভিক্ষা করতে হবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট। কারণ সকল ব্যাপারে সকল ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁরই কুদরতের হস্তের আওতায়। তিনিই সকল ব্যাপারে তৌফিক দানকারী।

চতুর্থ সোপান

নফ্স আম্মারা দমন

ইবাদতকামী ব্যক্তির জন্য অতঃপর অত্যন্ত প্রয়োজন ও জরুরী হলো নফসে আম্মারা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। কেননা, এটা সমস্ত দুশমনের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ, মারাত্মক ও ধ্বংসকারী দুশমন। ঐ দুশমন থেকে যে বিপদের উদ্ভব হয়, তাও অতি মারাত্মক এবং তা প্রতিরোধ করা খুবই কঠিন। এই নফসে আম্মারার রোগেরও শেষ নাই আর রোগগুলোর চিকিৎসাও সাংঘাতিক কঠিন।

নফসে আম্মারা এমন বিপজ্জনক হওয়ার কারণ দুটো। প্রথমত, এটা হলো অভ্যন্তরীণ শত্রু। ডাকাত যখন গৃহে প্রবেশ করে বসে তখন তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুবই কঠিন। এ জন্য সে ক্ষতিও করতে পারে অধিকতর। এ কারণে কোন এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ আমার আহবানকারী আমার যে ক্ষতি করেছে, আমার নফস তার প্রভাব কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। কেননা, সে আমার রোগ ও বেদনা বহুক্ষণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি সে দুশমনীকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি, যে দুশমনের বাসা আমারই পাঞ্জরের মধ্যস্থলে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, নফস হলো প্রিয় শত্রু। একথা সত্য যে, মানুষ তার বন্ধুর দুশমনী সম্পর্কে সর্বদাই অসতর্ক ও উদাসীন থাকে। মানুষের চোখে তার বন্ধুর কোন ত্রুটিই ধরা পড়ে না। যেমন কোন এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ

'এমনিতেই তো তুমি তোমার বন্ধু ও ভ্রাতার কোন ত্রুটিই দেখতে পাও না– তারপর যখন তুমি সে বন্ধু-ভ্রাতার প্রতি খুশি আছ, তখন আর তার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ সন্তুষ্টি ও শুভেচ্ছাপূর্ণ চোখে সকল প্রকারের ত্রুটিই রাতের ন্যায় অন্ধ হয়ে থাকে (অর্থাৎ তাতে কোন ত্রুটি ধরাই পড়ে না), কিন্তু অসন্তুষ্টির দৃষ্টি সকল ত্রুটিকে প্রকাশ করে দেয়।

সুতরাং এমতাবস্থায় মানুষ তার নফসের সকল বিষয়কেই উত্তম মনে করবে, এতে সন্দেহের কি আছে? সে তো কিছুতেই নফসের ত্রুটি ধরতে পারে না। ফলে

নফস নিত্যই মানুষের অনিষ্ট করার অধিকতর সুযোগ পায়। এমনকি এভাবে নফস যদি মানুষকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়েও উপনীত করে, তথাপি সে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাউকে স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা রক্ষা করেন তবে সেটা আলাদা কথা

নফসই সকল অনিষ্টের মূল

অতঃপর আরও একটি বিষয় জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অতি ফলদায়ক। তা এই যে, আল্লাহ্র সৃষ্ট-জগতে সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের যত বিভ্রান্তি, অপমান, ধ্বংস, অবনতি, অসম্মান ও আপদ-বিপদ সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সকল অনর্থের মূলেই রয়েছে কেবল এ নফসেরই কারসাজি। হয়তো বা এতে কখনো সাহায্য করেছে তারই কতিপয় সাহায্যকারী। তবে মূল অনিষ্টকারী নফসই।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি প্রথম নাফরমানী প্রকাশিত হয় ইবলিসের মাধ্যমে। এর মূলেও ছিল সে নফসের আকাঙক্ষারই বাড়াবাড়ি। নফসের হিংসা ও অহঙ্কারই আশি হাজার বছরের ইবাদতের পরে শয়তানকে নাফরমানীর পাপে লিপ্ত হওয়ার প্ররোচনা দিয়েছিল। এ নাফরমানীই শেষ পর্যন্ত শয়তানের জন্য চিরস্থায়ী অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। অথচ সে সময় না ছিল শয়তান, না ছিল সৃষ্টিজগত বা দুনিয়া। কেবল নফসের অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের জন্যই তা ঘটেছিল। অতঃপর আদম আলাইহিস্সালামের তরফ থেকে গুনাহ্ প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রেও কারণ একই ছিল। তা হলো, নফসের আকাঙক্ষার বাড়াবাড়ি, অমর জীবনের প্ররোচনা। এ অমর জীবনের আকাঙক্ষার বশবর্তী হয়েই আদম (আ) পতিত হলেন ইবলিসের ধোঁকায়। নফস ও তারই সহযোগীদের দ্বারা আদম (আ) কর্তৃক সংঘটিত হলো গুনাহ্র কাজ। ফলে আদম (আ)-কে আল্লাহ্র প্রতিবেশীর মর্যাদা হারাতে হলো এবং তাঁকে বঞ্চিত করা হলো বেহেশতের শান্তিপূর্ণ জীবন থেকে। অতঃপর তাঁকে প্রেরণ করা হলো এ নশ্বর দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনে। এভাবেই নফসের একটি মাত্র কামনা পূরণ করতে গিয়ে আদম (আ) নিজে ও তাঁর ভবিষ্যত বংশধরগণ নিপতিত হলো চিরন্তন পেরেশানীতে।

কাবিল ও হাবিলের ঘটনার কথাই একবার স্মরণ করে দেখুন না কেন, নফসই এখানেও মূল অনিষ্ট সৃষ্টিকর্তা । কারণ, তাদের ঘটনার মূল কারণ ছিল হিংসা ও জিঘাংসা। অতঃপর স্মরণ করুন হারুত-মারূতের কাহিনী। এ ঘটনায়ও

প্রবৃত্তির কামনাই সকল গোলযোগের মূল। মোদ্দাকথা, কিয়ামত পর্যন্ত এমনি ঘটনা চলতে থাকবে অহরহ, যদি না নফসকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়।

সত্যি বলতে কি, এ জগতে এমন কোন বিভ্রান্তি, গোলযোগ, অঘটন ও গুনাহ্‌র কাজ সাধিত হয়নি, যার মূলে নফস ও তার কামনাসমূহ কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। অন্যথায় গোটা সৃষ্ট-জগত তো আগাগোড়াই উত্তম ও সুস্থতায় পরিপূর্ণ। সুতরাং এমন যে দুশমন, তার সম্পর্কে মানুষের সর্বদাই সচেতন থাকা দরকার এবং আল্লাহ্‌র নিকট তৌফিক কামনা করে তার মুকাবিলা করা অবশ্য কর্তব্য।

নফসের সংশোধন

এখন প্রশ্ন হলো, এ দুশমনের সাথে সংগ্রামের জন্য কি পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে ?

পূর্বেই বলা হয়েছে, নফসের ব্যাপারটিই অত্যন্ত কঠিন এবং ভয়াবহ শত্রুর ন্যায়ই একে সহজে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, সব কিছুর উৎপত্তিস্থলই হলো এ নফস।

বর্ণিত আছে, কোন এক বেদুঈন অপর কোন এক ব্যক্তির মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দোয়া করে বলেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সমস্ত দুশমনকে অপদস্থ করুন-- কেবলমাত্র নফস ব্যতীত।

মনে রাখতে হবে, নফসকে প্রথম থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাকে একবারও ছেড়ে দেয়া চলবে না। কারণ তাতে অধিকতর বিপদের আশঙ্কা।

দু'ট পন্থার যে কোন একটি পন্থা এ ব্যাপারে অত্যন্ত জরুরী। নেক আমলের মধ্যে যতখানি শক্তি ও ক্ষমতা বিদ্যমান, তার দ্বারা নফসকে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধনের আওতায় রাখা সম্ভব। অপরপক্ষে এমনভাবে তাকে দুর্বল ও নিস্তেজ করে রাখবে, যাতে সে বিদ্রোহ করার সুযোগই না পায়। মোদ্দাকথা, নফসের চিকিৎসার জন্য সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আরও মনে রাখতে হবে যে, নফস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ জানোয়ার বিশেষ। একে বাগে আনয়ন করা সহজ কাজ নয়। তবে একে কাবু করার কৌশল অবলম্বনের জন্য গভীর চিন্তার প্রয়োজন থাকলেও তা অসম্ভবও

নয়। নফসকে পরাস্ত করার কৌশল এই যে, তাকে খুব পর্যুদস্ত ও দুর্বল করে ফেলা উচিত। তাহলেই তা আয়ত্তে থাকবে।

উলামায়ে কিরামের মতে, নফস ও তার আকাঙ্ক্ষাকে পর্যুদস্ত করার তিনটি উপায় আছে এবং এ তিনটি পদ্ধতিতেই তার সকল কামনাকে ধ্বংস করে ফেলাও সম্ভব।

প্রথমত, কাম চরিতার্থতা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা এবং তাতে কখনো লিপ্ত না হওয়া। কারণ শক্তিশালী ও সবল জানোয়ারের খোরাক যখন কমিয়ে দেয়া হয়, তখন সে বিনীত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, খুব ইবাদত ও নেক আমল করে তার উপর বোঝা হিসেবে তা চাপিয়ে দেয়া। কারণ দুর্বল গাধা ও শক্তিহীন কোন জোনোয়ারের উপর যখন অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যায়, তখন সে অনুগত হয়ে যায়। তৃতীয়ত, আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য কামনা করা। কারণ তাঁর সাহায্য ব্যতীত এ নফস আম্মারা অর্থাৎ কাম-প্রবৃত্তিকে দমন করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। হযরত ইউসুফ (আ) যা বলেছেন, তা কি শোন নাই? তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ النَّفْسَ لَاَ مَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلاَّ مَا رَبِّىْ -

নফস তো সব সময় মন্দের প্রতিই আকর্ষণ করে-- কেবলমাত্র যে নফসের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে-- তা ব্যতীত। (সূরা ইউসুফ ঃ৫৩)

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতি সতত অবলম্বন করে চললে আল্লাহ্‌র নির্দেশে এ বিদ্রোহী তোমার অনুগত হবে। তখন তোমার সুযোগ আসবে আর কিছুটা অগ্রসর হয়ে তাকে পরাস্ত করার। এভাবে তুমি এ কাম-প্রবৃত্তির গলায় লাগাম পরিয়ে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হতে সক্ষম হবে।

তাকওয়া

'তাকওয়া' উঁচু পর্যায়ের ইবাদত এবং উত্তম সম্পদ বিশেষ। 'তাকওয়া' অবলম্বনের ব্যাপারে যে সাফল্যমন্ডিত হবে সে লাভ করবে উত্তম নিয়ামত, অতুল সম্পদ, মহান সম্মানের চাবিকাঠি, বিপুল ঐশ্বর্য ভান্ডার, বিরাট সাম্রাজ্যের আধিপত্য এবং সকল বৈভব। মোটকথা, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সম্পদ ও সম্মানের এটাই কোষাগার। উভয় দুনিয়ার সকল কল্যাণ ও মঙ্গল একমাত্র কোন উপায়ে হাসিল করা যদি সম্ভব হয়, তবে তা 'তাকওয়া'র মাধ্যমেই সম্ভব।

৬–

তাকওয়ার উপকারিতা উপলব্ধির জন্য পবিত্র কুরআনের গভীর পর্যালোচনা করা দরকার। তা হলেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে যে, তাকওয়ার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কত কল্যাণ ও মঙ্গল সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার পুরস্কার হিসেবে কত রকমের সৌভাগ্যেরই না ওয়াদা ফরমায়েছেন। তাকওয়ার পুরস্কার অসংখ্য, সওয়াব সীমাহীন। নিম্নে সে অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মাত্র ১২টি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, প্রশংসা ও গুণকীর্তন সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

যদি সবর করো এবং 'তাকওয়া' অবলম্বন করো, তবে তা (সত্যিই) অতি সাহসের কাজ হবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৬)

দ্বিতীয়, আল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের নিশ্চয়তা সম্পর্কিত। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا -

যদি তুমি ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের কোন কৌশলই তোমার সামান্যতম ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১২০)

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, সাহায্য ও সহানুভূতির আশ্বাসে পরিপূর্ণ। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করে এবং সৎ কর্মপরায়ণ। (সূরা নাহ্ল ঃ ১২৮)

তিনি আরও বলেন ঃ

وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ -

আল্লাহ্ তা'আলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের বন্ধু।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, হালাল রুজি দান ও সকল প্রকার ক্লেশ থেকে মুক্তির আশ্বাস প্রদানকারী। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ -

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ভয় রাখে (তাকওয়া অবলম্বন করে)। আল্লাহ্ তার জন্য একটা ব্যবস্থা বের করে দেবেন এবং যা তার ধারণার অতীত, এমন স্থান থেকে তার জন্য রিযিক দান করবেন। (সূরা তালাক ঃ ২৩)

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো, আমলের সংরক্ষণের পরিপূর্ণ ওয়াদা। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ -

ওহে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্য কথা বলো- আল্লাহ্ তা'আলা তার পুরস্কারস্বরূপ তোমাদের আমলসমূহকে কবূল করবেন। (সূরা আহযাব ঃ ৭০)

ষষ্ঠত, গুনাহ্ মাফ ও ক্ষমা প্রদর্শনের ওয়াদা সম্বলিত। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ -

তোমাদের গুনাহ্ খাতা মাফ করবেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

সপ্তম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্র ভালবাসার নিশ্চয়তা- যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের ভালবাসবেন।

(সূরা তাওবা ঃ ৪)

অষ্টম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও অন্যান্য নেক আমল কবূল হওয়ার নিশ্চয়তা— যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ -

আল্লাহ্ তা'আলা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের থেকে কবূল করেন।

(সূরা মায়িদা ঃ ২৭)

নবম বৈশিষ্ট্য হলো, সম্মান ও ইয্যত দানের নিশ্চয়তা। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ -

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সম্মানিত, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচাইতে অধিক মুত্তাকী (তাকওয়া অবলম্বনকারী)।

(সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

দশম বৈশিষ্ট্য হলো মৃত্যুর সময় শুভ সংবাদ। যেমন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ -

যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তার জন্য দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের জীবন—উভয় স্থানেই খোশখবরী রয়েছে।

(সূরা ইউনুস ঃ ৬৩)

একাদশ বৈশিষ্ট্য হলো দোযখ থেকে মুক্তির আনন্দপূর্ণ সংবাদ। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا -

অতঃপর আমি তা থেকে 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের বাঁচিয়ে নেবো।

তিনি আরও বলেন ঃ

سَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقٰى -

তাক্ওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের এ (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে।

দ্বাদশ বৈশিষ্ট্য হলো চিরন্তন বেহেশ্তে অবস্থানের শুভ সংবাদ ও তার সুস্পষ্ট ঘোষণা। যেমন ঃ

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ –

'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের জন্য (জান্নাত) তৈরি করা হয়েছে।

মোটকথা, দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য ও কল্যাণের সকল বিষয় এই তাক্ওয়ার আওতাধীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হে মানব সন্তান! এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে কখনো বঞ্চিত করো না।

এরপর ইবাদতকারীদের জন্য আরও কতিপয় বিষয়ের প্রয়োজন। এ বিষয়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, আল্লাহ্র সাহায্য ও সহানুভূতির প্রয়োজন। তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য এ সাহায্য সহানুভূতির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ ' আল্লাহ্ তা'আলা 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন।'

দ্বিতীয়ত, আমলে সুষ্ঠুতা ও পরিপূর্ণতা আনয়ন। এই সৌভাগ্যটিও 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীরাই লাভ করতে সক্ষম।

তৃতীয়ত, আমল কবূল হওয়া। তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য এই ব্যাপারেও নিশ্চয়তা রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ্ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের থেকেই কবূল করেন।

মনে রাখতে হবে যে, উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের উপরই ইবাদতের পরিপূর্ণতা লাভ নির্ভরশীল। কেননা প্রথমত, বান্দা আল্লাহ্র সাহায্য ও সহানুভূতির মাধ্যমে ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার তৌফিক লাভ করে। অতঃপর প্রয়োজন হয় সেই ইবাদতে সুষ্ঠুতা ও সুস্থতা আনয়ন। অতঃপর যখন ইবাদত কামালিয়তের পর্যায়ে উন্নীত হয়, কেবল তখনই আসে তা কবূলের প্রশ্ন।

আর এ তিনটি বিষয়ই এমন যে, ইবাদত-গোযার ব্যক্তি এসবের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কান্নাকাটি করে থাকে এবং তার কাছে এসব কামনা করে এভাবে বলতে থাকে-- 'আয় আল্লাহ্' তুমি তোমার ইবাদত করার তৌফিক দান করো। আমার যেখানে যেখানে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে,

তা দূর করে ইবাদতে সুষ্ঠুতা ও পরিপূর্ণতা দান করো। আয় আল্লাহ্, আমার আমলসমূহ কবূল করো।'

অপরপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'তাকওয়ার' পুরস্কার হিসেবে এর সব কিছুই দানের ওয়াদা করেছেন। তাকওয়া অবলম্বনকারিগণই এসব সৌভাগ্যের অধিকারী বলে জানিয়েও দিয়েছেন। সুতরাং যদি আল্লাহ্র ইবাদতের সত্যিই ইচ্ছা থাকে, তাহলে অবশ্যই 'তাকওয়া' অবলম্বন করতে হবে। বরং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্য লাভের আকাঙক্ষা যার আছে, তারও 'তাকওয়া' অবলম্বন অবশ্য কর্তব্য।

কোন এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার 'তাকওয়া' অবলম্বন করে— সে এমন পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, সকল কল্যাণ তারই দিকে ধাবিত হয়।

মনে রাখবে, 'তাকওয়া' ও নেক আমল ব্যতীত মানুষের সাথে কবর পর্যন্ত আর কিছুই যায় না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনতে পেরেও তাঁর মারিফাতকেই যথেষ্ট মনে করতে পারে না— তার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। বান্দার জন্য বিত্তের সম্মান আদৌ লাভজনক নয়। প্রকৃতপক্ষে সর্বাঙ্গ সুন্দর ইয্যত তো কেবল সেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্যই। মনে রাখবে, আল্লাহ্র আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে যা হাসিল হয়, তার কোনটাই বিফলে যাওয়ার নয়— কিংবা তার কোনটাই বান্দার জন্য ক্ষতিকর নয়।

যা হোক, 'তাকওয়া' সম্পর্কে অনেক ব্যক্তি তো আরও চূড়ান্ত অভিমত রেখে গেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ তাকওয়া ব্যতীত আর কোন পাথেয়ই নেই। সুতরাং তাকওয়াকেই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করো এবং তা-ই সর্বদা অনুসরণ করে চলো।

অতঃপর আরও একটি সারকথা আমাদের অনুধাবন করা কর্তব্য। তা এই যে, জীবনভর যদি কেউ ইবাদত করে এবং সে পথের সকল বাধা-বিঘ্নের সাথে কঠোর সংগ্রাম করে এগুতে থাকে এবং অবশেষে একদিন তা হাসিলও হয়– তথাপি তার চূড়ান্ত কামনা কি থাকে? থাকে এই যে, তার এ সকল ইবাদত ও নেক আমল আল্লাহ্র দরবারে কবূল হোক।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, তাকওয়া অবলম্বনকারীদের তরফ থেকে যে আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন, তা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায়ই ঘোষণা করেছেন।

এ থেকে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সব কিছুরই কেন্দ্রস্থল হলো তাকওয়া। এ মধুচক্রটিতেই সব কিছুর গুণগুনানী।

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) তাকওয়াকে এত অধিক পছন্দ করতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

مَا اَعْجَبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَئٍ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا اَعْجَبَهُ اَحَدٌ اِلَّا ذُوْ تَقْى –

রাসূলুল্লাহ (সা) তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যতীত দুনিয়ায় অন্য কোন জিনিস বা কোন ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নি।

হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত— তিনি তওরাতে দেখেছেন ঃ আয় মানব-সন্তান! আল্লাহ্ তা'আলার 'তাকওয়া' অবলম্বন করো— অতঃপর যথা ইচ্ছা আরাম করো।

আমি আমর বিন আবদ কায়েসের নিকট জানতে পেরেছি যে, তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় খুব কেঁদেছিলেন। অথচ সারা জীবন দিন ও রাতের মধ্যে তিনি এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন। অতঃপর নামায থেকে ফারাগত হাসিল করে নিজের বিছানায় গমন করতেন এবং বলতেন ঃ ওহে সকল প্রকার অনিষ্টের মূল! আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি তোকে চোখের পলকের ন্যায় সময়ের জন্যও খুশি করবো না।

একদিন তিনি এভাবে বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে এভাবে ক্রন্দন করার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ –

আল্লাহ্ তা'আলা তো 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের নিকট থেকেই কবূল করেন। (সূরা মায়িদা ঃ ২৭)

অতঃপর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই বিষয়টিই প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর মূল। তা এই যে, কতিপয় সালেহ তাদের শায়খ ও বুযুর্গের নিকট অন্তিম উপদেশ কামনা করলে তিনি বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের সেই উপদেশ দিচ্ছি, যা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রথম ও শেষ উপদেশ হিসেবে বান্দার উদ্দেশে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ -

তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল; তাদের এবং তোমাদের আমি এ ওসীয়তই করেছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো)। (সূরা নিসা ঃ ১৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা কি মানুষের সংশোধন ও উন্নতির বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল নন? আল্লাহ্ তা'আলা কি সবচাইতে উত্তম উপদেশদাতা, অনুগ্রহকারী এবং দয়া প্রদর্শনকারী নন?

যদি তাই হন, তবে বান্দার কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য তিনি যে তাকওয়ার নোস্খা বাত্লিয়েছেন, তার চাইতে উত্তম আর কি হতে পারে? যদি তাকওয়া ব্যতীত বান্দার জন্য অতি উত্তম, সকল কল্যাণের উৎসমূল, অতি কল্যাণবাহী সওয়াব, দাসত্বের দিক থেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, মরতবার দিক থেকে অতি উচ্চ পর্যায়ের— সময় ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযুক্ত এবং চিত্তের ব্যাপারেও অধিক সাফল্য আনয়নকারী অন্য কোন কিছু থাকতো, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা-ই অবলম্বন করার নির্দেশ দিতেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দার জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও অতি কল্যাণবাহী অন্য কিছু থাকলে সে পন্থাই বাতলাতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি কেবল 'তাকওয়া'র কথাই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যেহেতু তিনি একই বিষয়ে ওসীয়ত করেছেন এবং নিজ বান্দাদের জন্য প্রথম ও চূড়ান্ত উপদেশ হিসেবে তাকওয়ার বিষয়ই উল্লেখ করেছেন, সেহেতু একথা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই যে, তাকওয়াই আল্লাহ্র পরম কাম্য; বান্দার জন্য এর উপরে আর কোন মকাম নেই। এটা সে স্থান, যার উচ্চে আর কোন মর্যাদার স্থান নেই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সকল উপদেশ,

কল্যাণ ও উপকারের বিষয়ের ইঙ্গিত, গুরুত্ব, শিক্ষা ও মূল্যবাহী প্রেরণা এই ওসীয়তের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র রহমত ও হিকমতের পক্ষে হয়তো এ সর্বাংশে অনুকূল বিবেচিত হয়েছে, তাই অনুরূপ একই বিষয়ে সকল কল্যাণ নিহিত করেছেন। আমাদের স্পষ্ট স্মরণ রাখা উচিত যে, তাকওয়ার পন্থাই দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণের, সকল সময়ের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্‌র দাসত্বের পরিপূর্ণ রূপটিও এতেই পরিস্ফুটিত।

উপরিউক্ত বিষয়টিকে কোন এক ব্যক্তি কি সুন্দরভাবেই না প্রকাশ করেছেন— যখন তিনি বলেছেন যে, তাকওয়াই সকল সম্মান ও ইযযতের চাবিকাঠি। তাকওয়াই দুনিয়া ও আখিরাতে সকল কল্যাণের উৎসমূল। মুত্তাকীদের (তাকওয়া অবলম্বনকারী) জন্য, যতক্ষণ তাদের তাকওয়া নিখুঁত রয়েছে, ততক্ষণ তাদের নিকট কোন অনিষ্ট পৌঁছাতে সমর্থ নয়।

এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাকওয়াই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মকাম। যে ব্যক্তি এ তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং তদানুযায়ী আমল ও তা থেকে উপকৃত হবে – তার জন্য এই-ই যথেষ্ট।

তাক্‌ওয়ার অর্থ ও স্তরসমূহ

এই অতি উচ্চ মর্যাদা ও অতি মহান বৈশিষ্ট্যটি কিভাবে অর্জন করা যায়, এখন তাই আলোচনা করা দরকার। কারণ এত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যে বৈশিষ্ট্য, এত মহান সৌভাগ্যবাহী যে পন্থা, সকল বান্দারই তা অর্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক মর্যাদা ও সম্মানের জিনিস লাভ করতেই যথেষ্ট পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত সাধনার প্রয়োজন। সুতরাং অতি মর্যাদা ও সম্মানবাহী যে জিনিস, তা লাভ করতে হলে তেমনি অধিক পরিশ্রম, অধিক চেষ্টা এবং সাধ্যমতো সাধনার যে প্রয়োজন হবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মোটকথা, যেহেতু তাকওয়া অতি মহান ও অতি মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যেহেতু তা অর্জনের চেষ্টা, তা পুরোপুরি অর্জন এবং সেই পথের সংগ্রাম-সাধনা সত্যই এক অতি বিরাট কাজ।

একথা সর্বস্বীকৃত যে, ক্লেশের পরেই সম্মান ও কষ্টের পরেই সুখের আগমন হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

যারা আমার পথে ক্লেশ-কষ্ট বরদাশ্‌ত করে, আমি নিশ্চয়ই তাদের পথ প্রদর্শন করে থাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা নেককারদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯)

আল্লাহ্ পাক সেই করুণার আধার, যাঁর করুণাধারায় সকল প্রকার মুসিবত সহজ হয়ে যায়। সুতরাং বিষয়টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তা অর্জনের জন্য মনে-প্রাণে প্রস্তুত হতে হবে। অতঃপর সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাহায্য চাইতে হবে তাহলেই তা হাসিল হতে পারে। কেননা আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপরই কোন কিছু অর্জন করা না করা নির্ভরশীল।

যা হোক, এবার আসল কথায় আসা যাক। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মতে তাকওয়া হলো এমনভাবে গুনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়া, যাতে কখনো তেমন কোন গুনাহ্ প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে না হয়। তাছাড়া, সে গুনাহ্ পরিত্যাগের ব্যাপারেও অর্জন করতে হবে অটল দৃঢ়তা এবং তাতে সতত থাকতে হবে স্থিরসংকল্প। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভীতি তোমার ও গুনাহ্‌র মধ্যে যেন একটি প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

মোটকথা, যখন কোন ব্যক্তি গুনাহ্ পরিত্যাগ সম্পর্কে দৃঢ়সংকল্প এবং সে সংকল্পে সতত নিষ্ঠাবান থাকার ফলে তার নিজের ও গুনাহ্‌র মাঝখানে বাধার একটি কঠিন প্রাচীর গড়ে উঠবে (পরিপূর্ণ সংযম হাসিল হবে) তখনই তাকে 'মুত্তাকী' (তাকওয়া অবলম্বনকারী) বলে অভিহিত করা যায়। আর গুনাহ্ পরিত্যাগের ব্যাপারে তার এ দৃঢ়সংকল্প ও নীতি-নিষ্ঠাকেই বলা যায় 'তাকওয়া'।

পবিত্র কুরআনে 'তাকওয়া শব্দ দ্বারা তিনটি জিনিস বোঝানো হয়েছে।

প্রথমত, ভীতি– যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَ اِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ অর্থাৎ বিশেষভাবে আমাকেই ভয় করো তিনি আরও বলেছেন ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ –

সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৮১)

দ্বিতীয়ত, আনুগত্য ও ইবাদতের অর্থে— যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ –

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও ফরমাবরদারী পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথেই করো'।

অপরপক্ষে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এমন আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে যে, তারপর যেন কিছুতেই নাফরমানী প্রকাশিত না হয় এবং এমনভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করতে হবে যাতে পরে তাঁকে আর কিছুতেই বিস্মৃত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে এবং এমনভাবে তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে, যাতে পরে আর কিছুতেই না-শোকরী প্রকাশ না পায়।

আর 'তাকওয়া'র তৃতীয় অর্থ হলো, গুনাহ্ থেকে অন্তর একেবারে নির্মল হয়ে যাওয়া! প্রকৃতপক্ষে 'তাকওয়া'র হাকীকতও এখানেই। প্রথমোক্ত অর্থ দু'টিতে এ বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায় না এবং আল্লাহ্ তা'আলার এই ফরমানের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়— যখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ –

যেসব ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য প্রদর্শন করবে, আল্লাহ্কে ভয় করবে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করবে— তারাই পরিপূর্ণ কামিয়াবী পেয়েছে।

আল্লাহ্ পাক প্রথমে ভীতি ও আনুগত্যের বিষয় উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বর্ণনা করেছেন 'তাকওয়া'র বিষয়। এতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাকওয়ার অর্থ ও হাকীকত আনুগত্য ও ভীতি ছাড়া অন্য কিছু। আর তা হলো, আমি যা উল্লেখ করেছি অর্থাৎ 'গুনাহ্ থেকে অন্তর সম্পূর্ণ নির্মল হওয়া'।

উলামায়ে কিরামের মতে, তাকওয়ার তিনটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে। তাকওয়া 'আনিশ্ শিরক্— অর্থাৎ শিরক্ থেকে তাকওয়া। তাকওয়া 'আনিল বিদ'আত— অর্থাৎ বিদ'আত থেকে তাকওয়া এবং ছোট ও ক্ষুদ্র গুনাহ্ থেকে তাকওয়া। আল্লাহ পাক এ তিনটি পর্যায়কেই এক আয়াতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُوْا -

এমন লোক যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে তারা যা খায় বা পান করে তাতে কোন গুনাহ্ নেই। যেহেতু তারা পরহেযগারী ইখতিয়ার করেছে এবং ঈমান এনেছে ও নেক আমল করে। অতঃপর পরগেযগারী অবলম্বন করে চলে এবং খুব নেক আমল করে। (সূরা মায়িদা ঃ ৯৩)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম তাকওয়া হলো শিরক্ থেকে তাকওয়া অবলম্বন করা। এর মুকাবিলায় যে ঈমানের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, তা হলো তওহীদ। আর দ্বিতীয় তাকওয়া হলো, বিদ'আত থেকে তাকওয়া অবলম্বন। এর মুকাবিলায় যে ঈমানের কথা বলা হয়েছে, তাতে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রদর্শিত প্রত্যয় ও বিশ্বাসকেই ধরা যায়। তৃতীয় তাকওয়া হলো, ক্ষুদ্র ও ছোট গুনাহ্ থেকে তাকওয়া অবলম্বন। এর মুকাবিলায় ঈমানের কোন উল্লেখ নেই। এ জন্য এর মুকাবিলায় ইহসানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ থেকে আনুগত্য ও তাতে দৃঢ়সংকল্পকেই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এ মকামটি হলো আনুগত্যের পথে যারা স্থিরতা অর্জন করেছে, তাদেরই মকাম।

উপরিউক্ত আয়াতে 'তাকওয়া'র তিনটি পর্যায়ই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান হিসেবে, সুন্নত হিসেবে ও আনুগত্যে স্থিতিশীলতা অর্জনে। আমাদের উলামায়ে কিরাম তাকওয়ার এ অর্থই করেছেন।

আমার মতে, তাকওয়ার অর্থ অপ্রয়োজনীয় হালাল জিনিস বর্জন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا سُمِّيَ الْمُتَّقِيْنَ - لِتَرْكِهِمْ مَالاَبَاْسَ بِهٖ حَذَرًا عَمَّا بِهٖ بَاْسٌ

যেসব জিনিসে কোন শংকা নেই, সেইসব হালাল জিনিস পরিত্যাগ-কারিগণকে মুত্তাকী (তাকওয়া অবলম্বনকারী) বলা হয়।

এক্ষণে আমরা যদি হাদীস ও উলামায়ে কিরামের ব্যাখ্যাকে একত্র করে একটা সাধারণ সূত্রে গ্রথিত করি, তাহলে তাকওয়ার অর্থ এরূপ দাঁড়ায় যে,

দীনের ব্যাপারে কোন ক্ষতি বা আশঙ্কার সৃষ্টি করে, এমন ধরনের বিষয়ও (পর্যন্ত) পরিত্যাগ করা তাকওয়ার অন্তর্গত।

এ বিষয়টির সঙ্গে আমরা জ্বরাক্রান্ত রোগীর অবস্থার তুলনা করতে পারি। কেননা, জ্বর হলে তার ক্ষতিকর যে কোন জিনিস গ্রহণ থেকেই তাকে বিরত থাকতে হয়, তা সে জিনিস খাদ্য-পানীয় বা তার প্রিয় কোন ফলমূলই হোক না কেন। জ্বরওয়ালা ব্যক্তির এভাবে ক্ষতির আশঙ্কাজনক যে কোন বিষয় পরিত্যাগ করাকে সেই জিনিসসমূহ থেকে তার 'তাকওয়া' অবলম্বন বলা যায়।

দীনের ব্যাপারে যেসব জিনিস বা বিষয়ে ভয় বা শংকার কারণ থাকে, তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, নিছক হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়। দ্বিতীয়ত, অপ্রয়োজনীয় বা প্রয়োজনাতিরিক্ত হালাল। কারণ, প্রয়োজনাতিরিক্ত হালালে লিপ্ত হয়ে তাতে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হয়ে পড়লে, এ পরিস্থিতিই তাকে হারামে লিপ্ত হওয়ার দিকে আহবান জানায়। প্রবৃত্তির লালসা, ঔদ্ধত্যপনা, কামনা ও লজ্জাহীনতা থেকেই এমন অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটে থাকে।

সুতরাং যে ব্যক্তি স্বীয় দীনকে ক্ষতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখতে চায়, হালাল বিষয়সমূহই যাতে শেষ পর্যন্ত হারামে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে না দাঁড়াতে পারে, তজ্জন্য তার পক্ষে আশঙ্কা ও শঙ্কাপূর্ণ সবকিছু এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত হালাল বিষয়ও পরিত্যাগ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ ঃ

لِتَرْكِهِمْ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذْرًاعَمَّا بِهِ بَأْسٌ -

প্রয়োজনাতিরিক্ত হালাল বিষয়কে হারামে লিপ্ত করার কারণ হয়ে পড়ার ভয় ও আশঙ্কায় পরিত্যাগ করবে।

সুতরাং তাকওয়ার কামিল দরজা হলোঃ দীনের ব্যাপারে সামান্যতমও ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান, এমন প্রতিটি বস্তু ও বিষয়কে পরিত্যাগ করা। দীনের ক্ষতির আশঙ্কাপূর্ণ বিষয় ও বস্তু হারাম ও অতিরিক্ত হালাল— উভয় স্থানেই বিদ্যমান থাকে।

এখন আমাদের শরীয়ত অনুযায়ী তাকওয়ার অর্থ জানা দরকার। আমি পূর্বেই বলেছি যে, তাকওয়ার অর্থ হলো অন্তরকে সকল প্রকার পংকিলতা থেকে এমনভাবে নির্মল ও নিষ্কলুষ করা, যেন পূর্বে কখনো এ অন্তরে কোন প্রকার কলুষতা ছিল বলেই মনে না হয়। এ অবস্থা তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন

গুনাহ্ পরিত্যাগে দৃঢ় সংকল্প ও তাতে সতত পূর্ণ নিষ্ঠা অনুসৃত হবে। এমনকি, বান্দা ও গুনাহ্‌র মধ্যে এ 'তাকওয়া'ই একটি বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে।

মন্দ ও অকল্যাণকর জিনিস দুই প্রকারের— প্রথমত, প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ ও খারাপ, যা মূলতই পাপ ও অন্যায় বলে আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল আদব ও কোন কল্যাণ উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন অতিরিক্ত হালাল ও প্রবৃত্তির কামনা-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাকরূহ বিষয়। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর ব্যাপারে 'তাকওয়া' ইখতিয়ার করা ফরয। এ শ্রেণীর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে (এ ব্যাপারে তাকওয়া পরিত্যাগ করলে) দোযখের অগ্নিতে নিপতিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন কেবলমাত্র কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই। এই তাকওয়া পরিত্যাগ করলে হিসেব-নিকেশে বিব্রত হতে হবে এবং সে জন্য অবশ্যই নিন্দনীয়ও হতে হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করলো, সে তাকওয়ার নিম্নশ্রেণী প্রাপ্ত হলো। এ মকামটাই হলো আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে নিষ্ঠাবানদের স্থান। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাপারেও তাকওয়া অবলম্বন করতে সক্ষম হবে, সে তাকওয়ার উচ্চ শ্রেণী লাভ করবে। এটা হচ্ছে অতিরিক্ত জায়েয জিনিস পরিত্যাগের মকাম।

মোটকথা, বান্দা যখন উভয় প্রকার তাকওয়াই অবলম্বন করে অর্থাৎ সকল প্রকার গুনাহ্‌র কাজ ও অতিরিক্ত জায়েয জিনিস থেকেও বিরত তাকে, তখন তার মধ্যেই তাকওয়া সর্বাঙ্গে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। তাহলেই বুঝতে হবে যে, এ ব্যক্তি তাকওয়ার হক পুরোপুরি আদায় করতে সমর্থ হয়েছে এবং তাকওয়ার মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তার সবকিছুর দুয়ার তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

এভাবে তাকওয়া অর্জনই পূর্ণাঙ্গ পরহেযগারী এবং এটাই দীনের মূল ও ভিত্তি। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উৎকৃষ্টতম পন্থা।

নফ্‌সে তাকওয়া প্রয়োগের পদ্ধতি

এখন আমাদের নফ্‌সের ব্যাপারে 'তাকওয়া'র ভূমিকা কিরূপ হতে পারে এবং কিভাবে তা নফ্‌সের উপর প্রয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা

দরকার। কারণ, বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নফসকে পদানত করার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নফ্‌সকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রথমেই দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করবে এবং তাতে স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকবে। সে সঙ্গে সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে নফ্‌সকে ফিরিয়ে রাখবে। এমনকি, নফ্‌সকে অপ্রয়োজনীয় কোন কিছুতেও লিপ্ত হতে দেবে না। মোটকথা, এভাবে যখন তুমি সকল বিষয়ে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে সক্ষম হবে তখনই তুমি অর্জন করতে পারবে তোমার চোখ, তোমার কান, জিহ্বা, মন, পেট এবং লজ্জাস্থানের ব্যাপারে 'তাকওয়া'। এভাবেই তুমি তোমার নফ্‌সকে তাকওয়ার শক্ত লাগামে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হবে।

এ ব্যাপারে কতকগুলো বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন অতি জরুরী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার তাকওয়া ইখতিয়ার করতে চায়, তাকে অবশ্যই তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এ বিষয়টাই ভিত্তি। এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় হলো চোখ, কান, জিহবা, মন ও পেট। এই ইন্দ্রিয়গুলোকে এমন বিষয় থেকে অবশ্যই হেফাজত করতে হবে, যেসব বিষয়ের মধ্যে ধর্মের দিক থেকে সামান্যতমও ক্ষতির কারণ হতে পারে, সে বিষয় হারাম অথবা অপ্রয়োজনীয়ই হোক, আর হালাল জিনিসের অপচয়ই হোক। মোটকথা, যখন এসব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এ ধরনের প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হবে, তখন কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য তাই যথেষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। এভাবেই সৃষ্টি হবে পরিপূর্ণভাবে সমগ্র শরীরে আল্লাহ্‌র 'তাকওয়া'।

যা হোক, এসব ইন্দ্রিয় সংশ্লিষ্ট হারাম বিষয়সমূহ এবং তা থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে হেফাজত করার পন্থা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার। সুতরাং প্রতিটি ইন্দ্রিয় ও তৎসংশ্লিষ্ট হারাম বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. চোখের বিষয়

চোখের হেফাজত করা অত্যন্ত জরুরী; কেননা, এটা সকল ফিতনা এবং দুর্দশার উৎস। এ ব্যাপারে তিনটি নীতি খুব উত্তমভাবে বুঝে নেয়া উচিত। প্রথম নীতি যা আল্লাহ পাক ইরশাদ করে দিয়েছেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -

(হে রাসূল) মু'মিনদের বলে দিন যে, তারা যেন তাদের চোখ নামিয়ে রাখে, আপন লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আমল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন। (সূরা নূর ঃ ৩০)

আমি এ আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে এর মধ্যে মোটামুটিভাবে অপূর্ব তিনটি বিষয়ের সন্ধান লাভ করেছি। বিষয় তিনটি হলো ঃ উপদেশ, আদেশ ও তিরস্কার। উক্ত আয়াতের لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ -এ বাক্যের মধ্যে উপদেশ রয়েছে। বান্দার পক্ষে তার মনিব ও প্রভুর আদেশ-নির্দেশ মান্য করা যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি তাঁর উপদেশ মেনে চলাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, উপদেশ অনুসরণ না করলে তা ঔদ্ধত্যপনার মধ্যে শামিল হয়ে যায়। ফলে, সে বান্দাকে আল্লাহ্র পথে গমনে বাধা দান করা হয় এবং তাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে গমন করার অনুমতি দেয়া হয় না। সুতরাং এ বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করা দরকার এবং আল্লাহ্র উপদেশের মধ্যে অন্যান্য যেসব অপূর্ব কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

ذلك ازكى لهم -এ বাক্যের মধ্যে রয়েছে আদেশ। এ বাক্যটির দুটো অর্থ রয়েছে। প্রথম অর্থ তো এই যে, এ বিষয়টি তোমাদের অন্তঃকরণকে অধিকতর পবিত্র করার কারণ হবে। কেননা, زكوة- এর অর্থ 'পবিত্রতা'। আর দ্বিতীয় এই যে, এ বিষয় তোমাদের কল্যাণে আধিক্য ও ব্যাপকতা আনয়নের কারণ হবে। কার زكوة শব্দটি বৃদ্ধি পাওয়া ও আধিক্য হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

মোটকথা, দৃষ্টিকে অবনত রাখার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ, এতে একদিকে যেমন অন্তঃকরণ থাকে বিশুদ্ধ বা পবিত্র, তেমনি নেক কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। তুমি যদি তোমার দৃষ্টিকে অবনত না কর, চতুর্দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাক, তাহলে তোমার দৃষ্টি স্বভাবতই বাজে ও অবান্তর জিনিসের উপর পতিত হবে। এমনকি, হারাম জিনিসের উপরও তোমার দৃষ্টি পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এরপরও যদি তুমি তোমার দৃষ্টিকে যথেচ্ছ

পরিচালনা কর, তবে তা হবে মস্তবড় গুনাহ্। আর অনেক ক্ষেত্রে তোমার অন্তর সে জিনিসের সাথে জড়িত বা আটকা পড়ে যেতে পারে। এমন হলে ধ্বংস অনিবার্য, যদি আল্লাহ্ পাকের রহমত এসে রক্ষা না করে।

বর্ণিত আছে যে, মানুষ যে জিনিসের উপর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেই জিনিসের সাথেই তার হৃদয় এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়ে, যেমন চামড়ায় রং লাগলে তা আর উঠতে চায় না।

সুতরাং এভাবে দৃষ্টিকে অনিয়ন্ত্রিত রাখলে তাতে কোন প্রকারেই উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি তোমার দৃষ্টি কোন অনুমোদিত আনন্দ ও সম্ভোগের জিনিসের উপর পতিত হয়, তাহলে মন অধিকাংশ সময় তৎপ্রতি আকৃষ্ট থাকবে। অথচ হয়তো বা সে জিনিস লাভ করাও তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না— অনবরত ধোঁকা ও ক্লেশে পতিত হতে থাকবে তুমি। ফলে, তোমার মন মশগুল থাকবে সেই একই চিন্তায়— এভাবে ধীরে ধীরে তুমি নেক আমল থেকেও দূরে সরে পড়তে থাকবে। অথচ তুমি যদি আদৌ কোন জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করতে, তাহলে তোমাকে এত সব ঝামেলায় পড়তে হতো না। ফলে তুমি শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে পারতে। এ জন্যই হযরত ঈসা (আ) বলেছেন ঃ আপন দৃষ্টিকে সংযত রাখো। কেননা দৃষ্টিই মনের মধ্যে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তাছাড়া মানুষের দৃষ্টিই ফিতনা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

যিন্নুন মিসরী (র) বলেছেন ঃ কামনার হাত থেকে রক্ষার প্রধান উপায় হলো দৃষ্টিকে অবনত রাখা।

অন্য এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ যদি একদিনের জন্য প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাবার জন্য কেউ তার দৃষ্টিকে ভোগ-সম্ভোগের উপকরণ সন্ধানে ছেড়ে দেয়, তবে তার দৃষ্টিতে এত অসংখ্য উপকরণ এসে ধরা পড়বে যে, চোখই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাছাড়া একদিনের মধ্যেই দৃষ্টিতে যা পড়বে— তার সবকিছুকে যেমন অর্জন করা সম্ভব হবে না, তেমনি সেই ব্যক্তি কতকাংশ লাভ করেও আর ধৈর্যধারণ করতে পারবে না।

মোটকথা, যখনই তুমি তোমার দৃষ্টিকে অবনত রাখবে, আপন দৃষ্টিকে সংযত রাখবে, অবাঞ্ছিত ও অর্থহীন কোন বস্তুর দিকে কিছুতেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না এবং সেসব বস্তুতে মোটেই দৃষ্টি দেবে না তখন তোমার মন হবে

নির্মল, হৃদয় হবে প্রশস্ত এবং বিভিন্ন প্রকার ধোঁকাবাজি ও ক্লেশ থেকে লাভ করবে মুক্তি, নিশ্চিত আরাম ও স্বস্তিতে তোমার জীবন ভরে ওঠবে সার্থকতায়। শুধু তাই নয়, সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে তুমি নফসকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং নেক আমলের দিক দিয়েও হতে পারবে অগ্রগামী। সুতরাং আপন দৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ অতি জরুরী।

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - এই বাক্যের মধ্যে রয়েছে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা। অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ -

তিনি এমন যে, চোখের চুরির বিষয় তিনি জানেন এবং অন্তরে যা লুক্কায়িত তা অবগত আছে। (সূরা মু'মিন ঃ ১৯)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করেন তার জন্য এ তিরস্কার ও ভর্ৎসনাই যথেষ্ট। কুরআনুল করীম থেকে এভাবে প্রথম নীতি প্রমাণিত হলো।

দ্বিতীয় নীতি-- এ নীতিকে প্রমাণিত করার জন্য আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস উদ্ধৃত করছি ঃ

اِنَّ النَّظَرَ اِلٰى مَحَاسِنِ الْمَرْاَةِ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ فَمَنْ تَرَكَهَا اَذَا قَهُ اللّٰهَ طَعْمُ عِبَادَةِ تَسُرُّهُ -

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ শয়তানের তীরসমূহের একটি বিষাক্ত তীর। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা থেকে বিরত থাকে (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না), আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইবাদতের এমন স্বাদ ভোগ করান যে, সে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করবে।

ইবাদতে মধুরতা ও মুনাজাতে আস্বাদ লাভই আবেদীনের নিকট পরম পাওয়া। কারণ তাদের মতে এটাই 'হাকীকত'। এটা এমন এক জিনিস, অভিজ্ঞতা যা প্রমাণিত করেছে এবং এ পথের অভিযাত্রীদের নিকটও বিষয়টি সুপ্রমাণিত হয়ে যায়। এটা এ জন্য হয় যে, যখন তুমি বাজে, বেহুদা ও অবাঞ্ছিত কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে, নিজের দৃষ্টিকে সংযত

রাখবে তখন এমনভাবে ইবাদতে মধুরতা, আনুগত্যে মজা এবং অন্তঃকরণে নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতা অনুভূত হতে থাকবে যে, ইতিপূর্বে কখনো তেমন অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় নীতি। নিজের প্রতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখবে যে, এগুলোতে কি কাজের ক্ষমতা আছে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মূল সত্তা (হাকীকত) সম্পর্কে চিন্তা করবে, তাহলে উপরিউক্ত নীতি অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পবিত্র ও নিরাপদ রাখতে সক্ষম হবে।

মনে রাখবে, তোমার পা জান্নাতের বাগিচা ও সুন্দর সুন্দর মহলে চলাফেরার জন্য, তোমার হাত পবিত্র শরাবের পেয়ালা ধরার ও উত্তম মিষ্ট ফল ছিঁড়ে নেয়ার জন্য এবং তোমার চোখ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের জন্য। দুনিয়া এবং আখিরাতে এর চাইতে অধিক মর্যাদার আর কিছু হতেই পারে না। সুতরাং এর প্রতিটি বিষয়ের জন্য এবং সে জন্য নিজের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করে সেগুলো কলুষমুক্ত ও নিরাপদ রাখবার চেষ্টা করা উচিত।

মোটকথা, এ তিনটি নীতি অনুসরণ করে চললে সকল প্রকার কষ্ট ও ক্লেশের অবসান ঘটবে। বাকি আল্লাহ্ তা'আলাই সব ব্যাপারে তৌফিক দানকারী। তিনি যাকে ইচ্ছা অদ্ভুত ক্ষমতা দান করতে পারেন।

২. কানের রোগ

শ্রবণশক্তি এবং কানকে বেহুদা এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় শোনা থেকে বিরত রাখতে হবে অর্থাৎ শ্রবণশক্তি ও কানকে নিরাপদ রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। দু'টি কারণে এ ব্যাপারে অধিক সতর্কতার প্রয়োজন হয়। প্রথমত, বেহুদা ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বা কথা শ্রবণকারী সেই বিষয় বা কথায় বক্তার কাজে শরীক হয়ে পড়েন।

যে কোন ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, সন্দেহজনক বিষয়কে যেমনভাবে খারাপ ও মন্দ কথা বলা থেকে জিহবাকে সংযত রাখবে, তেমনি তা শোনা থেকেও কানকে হেফাজত করবে। কেননা, খারাপ ও মন্দ কথা শুনলে তাতে সে কথায় বক্তার সাথে শরীক হয়ে যাওয়াই প্রতিপন্ন হয়। এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত।

দ্বিতীয়ত, মন্দ ও খারাপ কথা শুনলে তা অনাহূতভাবে অন্তরে ধোঁকা ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। এমনকি এর ফলে শরীরেও তার প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে এবং মন-প্রাণ সে প্রতিক্রিয়ার সাথে দুলতে থাকে। ফলে আল্লাহ্‌র ইবাদতের কোনই যোগ্যতা আর অবশিষ্ট থাকে না।

তাছাড়া, মানুষের অন্তরে যে কথা বা আলোচনা ঢুকে বা শুনতে পায়, তা পেটে খাদ্য গ্রহণের ন্যায়। খাদ্য যেমন মানুষের জন্য উপকারী হয় আবার ধ্বংসকারীও হয়, তেমনি কথা বা আলোচনা মানুষের উপকারও করে, আবার ক্ষতিও করে। কারণ পেটের মধ্যে যা পুরে দেয়া হয়, তা যদি সত্যিকার খাদ্য হয়, তবে মানুষের খুবই উপকার করবে— আর যদি হয় বিষ— তবে তো ধ্বংস অনিবার্য। তেমনি কথা ও আলোচনারও দু'টো প্রকার রয়েছে। প্রয়োজনীয় ও উপদেশমূলক এবং অপ্রয়োজনীয় ও খারাপ কথা আলোচনা। এগুলোর প্রতিক্রিয়াও হয় যথাক্রমে খাদ্য ও বিষের মতোই। বরং খাদ্যের চাইতে কথার প্রভাব বেশি ও স্থায়ী। তার কারণ এই যে, খাদ্য তো পাকস্থলীতে নিদ্রা ও বিশ্রামের ফলে শেষ ও বিদূরিত হয়ে যায়। অনেক সময় তার প্রভাব নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকলেও অবশেষে তা শেষ হয়ে যায়। বিশেষ ক্ষেত্রে, তার প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য ঔষধ রয়েছে। নির্দিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে বিষের প্রতিক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কথার ব্যাপারে তা সম্ভব নয়। কেননা , কথা মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে। এ জন্য অনেক সময় কথা জীবনভর স্মরণ থাকে— কখনো তা ভোলা সম্ভব হয় না। সুতরাং যদি কথাটি বেহুদা ও অবাঞ্ছিত হয়, তাহলে তা মানুষকে নিপতিত করবে ভ্রান্তি ও ক্লেশে। শুধু তাই নয়, বরং এসব বাজে ও অবাঞ্ছিত কথা মনে বিভিন্ন রকমের এমন সব ধোঁকা ও সন্দেহের সৃষ্টি করবে, যাকে উপেক্ষা করা অথবা ভুলে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে এবং উহার কু-প্রভাব থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করতে হবে। কারণ তা না হলে এ বিষয়টিই হয়তো আস্তে আস্তে বিরাট ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। আর যদি নিজের কানকে বেহুদা ও অনাবশ্যক কথা বা বিষয় শোনা থেকে বিরত রাখতে পারা যায়, তাহলে এ ধরনের কোন অসুবিধা বা বিপদই আসতে পারবে না।

মোটকথা, আল্লাহ্ পাক মানুষকে যে জ্ঞান ও বিবেক দিয়েছেন, তা সব সময় কাজে লাগিয়েই জীবন যাপন করা উচিত।

৩. জিহবা

এর পরেই প্রয়োজন জিহবার সংরক্ষণ ও তার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ। কেননা, এই জিহবা এত বিদ্রোহী ও লজ্জাহীন হয়ে পড়তে পারে যে, সে যে কোন সময় মারাত্মক শত্রুতা সাধন করতে পারে। তাছাড়া, এ জিহবা দ্বারাই বিরাটাকারের গোলাযোগও সৃষ্টি হতে পারে।

সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! কোন্ অঙ্গ সম্পর্কে আমার সবচাইতে বেশী সতর্ক থাকা উচিত? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নিজের জিহবা ধরে বললেন, 'এইটা'।

ইউনুস ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আমি আমার নফসের দিকে লক্ষ্য করে দেখেছি যে, সে বসরার প্রখর রৌদ্র ও উত্তাপের দিনেও রোযার কষ্ট সহ্য করতে পারে, কিন্তু বেহুদা ও অনাবশ্যক কথা থেকে জবানকে সংযত করতে সক্ষম নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জিহবাকে সংরক্ষণ ও সংযত রাখার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঁচটি নীতি প্রতিপালন করা দরকার।

প্রথম নীতিঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত।

اِنَّ اِبْنَ اٰدَمَ اِذَا تَنْظُرُ يَكْتُوْا الاَعْضَاءَ كُلَّهَا اِلَى اللِّسَانِ وَقُلْنَ

لَهُ نَنْشُدُكَا تَسْتَقِيْمَ فَاِنَّكَ اِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَاِنْ اِعْوَجَتْ

اِعْوَجْنَا –

মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে, তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহবার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং কসম দিয়ে বলতে থাকেঃ আমাদের ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন করো। কেননা, যদি তুমি ঠিক থাকো, তবে আমরা ঠিক থাকতে পারবো। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন করো, তবে আমরাও সে পথই অবলম্বন করতে বাধ্য হবো।

এর মর্মার্থ এই যে, মানুষের জবান থেকে যা বের হয়, তার প্রভাব মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ কথার দ্বারাই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামর্থ্য, ইয্যত এবং অসম্মান সবই নিরূপিত হয়।

মালিক ইবনে দিনারের একটি উক্তির মধ্যেও উপরিউক্ত কথার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেছেনঃ যখন তুমি দেখবে যে, তোমার মনের সকল সুকুমার প্রবৃত্তি ম্রিয়মান হয়ে সে স্থান দখল করেছে পাষাণত্ব ও কঠোরতা, সমগ্র শরীরে আলস্য ভর করেছে আর উপার্জনে দেখা দিয়েছে অসুবিধা, তখন বুঝতে হবে, তুমি অবশ্যই কোন মিথ্যা অথবা অনাবশ্যক কথাবার্তায় জড়িয়ে পড়েছিলে অর্থাৎ তোমার থেকে বাজে, অনাবশ্যক অথবা মিথ্যা কথা বেরিয়েছে।

দ্বিতীয় নীতি এই যে, নিজের সময়ের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার ও সুশৃংখল সমন্বয় সাধন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্‌র ধ্যান ও স্মরণ ব্যতীত যে কোন কথা বলাই সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তা পরিত্যাজ্য।

বর্ণিত আছে, হাসান বিন আবি সানাল কোন একটি রাস্তা দিয়ে গমনকালে একটি নয়া ইমারত দেখতে পেলেন। সে ইমারতটি কবে নির্মিত হলো, এ কথা তার জানতে ইচ্ছা হওয়ায় কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে তা জেনে নিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তাঁর নফসের দিকে ফিরে তাকালেন এবং বলতে লাগলেনঃ হে আমার উদ্ধত নফসঃ তুই এই অপ্রয়োজনীয় বিষয় জানার জন্য কেন উৎসুক হলে, কেন এভাবে খানিকটা সময়ের অপচয় করলি? যা হোক, নফসের এ অপরাধের কাফ্‌ফারা স্বরূপ তিনি পূর্ণ এক বছর রোযা আদায় করেছিলেন।

সত্যিই যারা নিজের নফসের সংশোধন ও সংরক্ষণের যত্নবান, তাদের জন্য কতই না আনন্দের স্থান নির্ধারিত রয়েছে, আর দুঃখ হয় তাদের জন্য, যারা নিজের নফসকে তারই ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছে। শেষোক্ত শ্রেণী সত্যিই গাফেল এবং ক্ষতিতে নিমজ্জিত।

কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি কি সুন্দর উপদেশই না দিয়েছেন—তিনি বলেছেনঃ অন্ধকার রাতে যখন কর্মহীন, একা থাকো, তখন বিশ্রামে যাওয়ার আগে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করার সুযোগ হারিয়ো না; আর যখন মন কোন বেহুদা, অনাবশ্যক ও অন্যায় কথায় লিপ্ত হতে চায়, তখন তাতে লিপ্ত না হয়ে বরং আল্লাহ্‌র নামের তসবীহ পাঠ কর নতুবা চুপ থাকো। কারণ বেহুদা কথা

বলার চাইতে চুপ থাকাই উত্তম। এমনকি বাকচাতুর্য ও বাচনভঙ্গীর ব্যাপারে তোমার দখল থাকলে, তথাপিও।

তৃতীয় নীতি হলো, নেক আমল সংরক্ষণ। মনে রাখবে, যে ব্যক্তি নিজের জবানকে হেফাজত করতে পারে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জিহবাকে সংযত রাখতে সক্ষম নয়, নিশ্চয়ই সে অপরের গীবতে লিপ্ত হবে। তেমনি যে ব্যক্তি বেশি কথা বলবে তার ভুল হওয়া অবধারিত। অথচ একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, গীবত নেকীকে ধ্বংস করে দেয়। বর্ণিত আছেঃ যে ব্যক্তি গীবত করে বেড়ায়, সে যেন তার নিজের নেকীর সামনে তোপ বসিয়ে সেই তোপের মুখে সকল নেকী উড়িয়ে দেয়।

বর্ণিত আছে, কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসানের গীবত করেছিল। তিনি তা জানতে পেরে সেই ব্যক্তির নিকট একটি পাত্রে কিছু খেজুর পাঠালেন। সাথে সাথে বলে পাঠালেনঃ 'আমি জানতে পারলাম যে, তুমি তোমার নেকী আমাকে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছ। সুতরাং তোমাকে তার কিছু বদলা দেয়া আমি উত্তম মনে করে এ খেজুর পাঠালাম।'

ইবনে মুবারকের সামনে একবার গীবত সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেনঃ যদি আমি গীবত করি, তবে আমার মায়েরই গীবত করবো। কারণ তিনিই আমার নেকীর বেশি হকদার।

চতুর্থ নীতি এই যে, নিজেকে দুনিয়ার বিপদ-আপদ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে রক্ষা করে চলতে হবে। সুফিয়ান সওরী (রা) বলেছেনঃ নিজের জবান থেকে এমন কোন কথা বের করো না বা এমন কোন কথাবার্তা বলো না, যা তোমার দাঁত ভাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অপর একজন বলেছেনঃ জবানকে এমন বেপরোয়া করো না, যার জন্য তোমার অবস্থারই অবনতি ঘটে যায়। তিনি আরও বলেছেনঃ

নিজের জবানের হেফাজত করো—অতিরিক্ত কথা আদৌ বলবে না। কারণ তেমন কথা বলে এমনও হতে পারে যে, তাতে তুমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। মনে রাখবে, মানুষের সকল বিপদাপদের অনেকটা উৎস হলো কথাবার্তা।

ইবনে মুবারক (র) তাঁর এক কবিতায় বলেছেনঃ নিজের জবানকে সংরক্ষণ করো। কারণ, জবান সব সময় তোমাকে বিপদগ্রস্ত—এমনকি হত্যার জন্যও

আগ্রাহী। জবান মানুষের অন্তঃকরণের বাহ্যিক দর্পণ। কথাই মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের পরিচয় বহন করে।

ইবনে আবি মতি (র) তাঁর এক কবিতায় বলেছেনঃ জবান সেই বাঘের ন্যায়, যে বাঘ গোয়ালের রাস্তায় বসে থাকে আর সুযোগ পেলেই গৃহপালিত গরু-বাছুর নিধন শুরু করে দেয়। সুতরাং তাকে এমনভাবে লাগাম লাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে সে কিছুতেই নিধন ও লুণ্ঠন কিছুই করার সুযোগ না পায়। এভাবেই জবানকে চুপ রাখা সম্ভব এবং বিপদাপদ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভাবনা।

বর্ণিত অছে—বাঘের ন্যায়ই জবান সব সময় ছুটে যেতে চায়। এজন্য তাকে কষে বেঁধে রাখতে হয়।

পঞ্চম নীতি এই যে, আখিরাতের বিপদ ও পরিণাম সম্পর্কে সর্বদা আলোচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে আরও একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখবে। অর্থাৎ জিহবা যে সব আলোচনায় লিপ্ত হয়, তার মধ্যে এমন বিষয়ও থাকে, যা নিষিদ্ধ ও হারাম—আবার এমন বিষয়ও থাকে যা অপ্রয়োজনীয়, বাজে এবং অনাবশ্যক। সুতরাং উভয় বিষয়ের আলোচনার পরিণাম স্মরণ করবে। কেননা, হারাম এবং নিষিদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করলে, তার পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের যে বিধান রয়েছে, সে আযাব থেকে বাঁচার সাধ্য মানুষের নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ মি'রাজের রাতে আমি দোযখে একদল লোককে মৃত মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে দেখে জিব্রাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? জিব্রাঈল (আ) জবাব দিলেনঃ এরা তারাই, যারা মানুষের গোশ্‌ত খেয়ে (গীবত) ফিরতো।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মাআয (রা)-কে বলেছিলেনঃ

اَوْ قَطْعُ لِسَا نِكَ عَنْ حَمْلَةِ الْقُرْاٰنِ - وَطُلاَّبُ الْعِلْمِ وَلاَ

تَمْزَقُ النَّاسِ بِلِسَانِكَا فَتَمْزَقَ فَكَا كُلاَّبُ النَّارِ -

নিজের জবানকে কুরআন-জানা লোক এবং তালেবুল ইলমের ব্যাপারে সংযত রাখো—নিজের জবান দ্বারা মানুষের পেছনে লেগো না, যাতে করে দোযখের কুকুর তোমাকে কামড়াতে না পারে।

আবূ কালাবা (র) বলেছেনঃ গীবত করলে মানুষের অন্তর হিদায়ত কবূল করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে—সুপ্রবৃত্তি ধ্বংস হয়ে যায়।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদের এ ধরনের জঘন্য গুনাহ্ থেকে রক্ষা করেন। হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করলে ফায়দামন্দ হতে পারবে।

অবশিষ্ট রইলো অনাবশ্যক, বাজে ও অপ্রয়োজনীয় জায়েয এবং অনিষিদ্ধ কথাবার্তার আলোচনা। চারটি কারণে এসব পরিত্যাজ্য। প্রথমত, এ ধরনের কথাবার্তায় কিরামন-কাতেবীনকে এমন বিষয়ে লিপ্ত করা হয়, যাতে আদৌ কোন উপকার বা লাভের সম্ভাবনা নেই। কিরামন-কাতেবীনকে সকল মানুষেরই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত—তাদের জন্য লজ্জা পোষণ করা দরকার। এমন কোন কাজ কিছুতেই করা উচিত নয়, যাতে তাদের সামান্যতমও কষ্ট হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ-

দ্বিতীয়ত, এ ধরনের কথাবার্তার দ্বারা আল্লাহ্ পাকের নিকট কতকগুলো বাজে এবং বেহুদা জিনিস প্রেরণ করা হয়। সুতরাং বান্দার পক্ষে এ ধরনের বেহুদা বিষয় পরিত্যাগ করা কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বদা ভয় করা উচিত।

বর্ণিত আছে, কোন এক ব্যক্তি খুব বাজে বকছিল। অপর এক ব্যক্তি এ সব বাজে বকবক শুনে বললোঃ চুপ করো। তোমার এ বাজে কথাগুলোও আল্লাহ্র নিকট পৌঁছছে। সুতরাং চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলো।

তৃতীয়ত, এসব বাজে কথাবার্তাও কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের সামনে পাঠ করা হবে। সেদিনটি হবে কঠোরতম ও চারদিক থেকে বিপদে ঘেরা। অপরপক্ষে, সকল মানুষ থাকবে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। সুতরাং সেদিন যাতে কোন বাজে বিষয় নিয়ে পেরেশানীতে পতিত হতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা অবশ্যই কর্তব্য।

চতুর্থত, এ ধরনের বেহুদা, অনাবশ্যক ও বাহুল্য কথার জন্য লাঞ্ছনা ও লজ্জার আশঙ্কা আছে। আল্লাহ্র সামনে মানুষের বেহুদা কথার প্রমাণ হিসেবে এসব উপস্থিত থাকবে এবং সে ব্যক্তির লজ্জা সম্পর্কে কোন প্রমাণই আল্লাহ্র

সামনে তখন কার্যকরী প্রমাণিত হবে না। কেউ কেউ বলেছেনঃ বাজে ও বেহুদা কথাবার্তা বলা পরিত্যাগ করো। কেননা, এগুলোর হিসেব অত্যন্ত দীর্ঘ হবে।

মোটকথা, যে সকল মানুষ নসীহত হাসিল করতে চায়, তাদের জন্য উপরিউক্ত আলোচনাই যথেষ্ট। এই আলোচনার মধ্যেই সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

অন্তঃকরণ

এরপর কর্তব্য হলো অন্তঃকরণের পবিত্রতা রক্ষা করা ও তার সংশোধন। বিষয়টি আদৌ সহজ নয়। এজন্য যথেষ্ট সাধনা ও চেষ্টার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধি খাটানোর প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট। কারণ, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অন্তঃকরণই সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাব গ্রহণের দিক থেকে এটি যেমন উদার, তেমনি এর বিপদাপদও অন্যান্য সকল অঙ্গের বিপদাপদের চাইতে ভয়াবহ। এর সংশোধন একাধারে কঠিন ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসাপেক্ষ। তেমনি এর অসংশোধনের পরিণামও মারাত্মক।

এ ব্যাপারে পাঁচটি নীতি সম্পর্কে লক্ষ্য রাখতে হয়।

প্রথম নীতি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ -

তিনি সে, যিনি চোখের চুরি সম্পর্কে যেমন ওয়াকিফহাল তেমনি অন্তঃকরণে যা লুক্কায়িত তাও জানেন। (সূরা মুমিনঃ ১৯)

তিনি আরও বলেছেন وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ -

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরের যাবতীয় বিষয় অবগত আছেন।

আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ -

তিনি তো অন্তরের সকল বিষয়ও অবগত।

কতবার কতভাবেই না পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যারা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক এভাবে সকল বিষয় জানা থাকার কথাটাই ভয় ও সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তাদের নিকট যথেষ্ট। কেননা, সে আলিমুল গায়েবের সামনে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টাই তাদের নিকট সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যেহেতু অন্তরের সব বিষয় অবগত, তখন অন্তরকে কিভাবে পবিত্র রাখা প্রয়োজন–তা ভেবে দেখলেই উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয় নীতিঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَبْصَارِ كُمْ وَاِنَّمَا يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْ بِكُمْ -

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তোমাদের আকৃতি ও দেহ-সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি দেন না — তিনি দৃষ্টি রাখেন তোমাদের অন্তঃকরণের প্রতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অন্তঃকরণই সে স্থান, যেদিকে আল্লাহর দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে সব মানুষের জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়, যারা মানুষের দেখবার স্থান, এ বাহ্যিক চেহারাকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে— চেহারা ধৌত করে, অপবিত্রতা ও ময়লা দূর করে— এমনকি, যাতে মানুষ চেহারার দোষত্রুটি ধরতে না পারে, তজ্জন্য তাকে সুন্দর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ্র দেখবার স্থান অন্তরকে কলুষমুক্ত ও পরিষ্কার করার চেষ্টা করে না; আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নজরে যাতে কোন পংকিলতা, দূষণীয় কিছু এবং কোন অপবিত্র বস্তু না পড়ে, তজ্জন্য তারা অন্তরকে সুষমামণ্ডিত ও সুন্দর করার চেষ্টা করে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষকে খুশি করার জন্য তারা নিজের বাহ্যিক চেহারাকে নানাভাবে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করে অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দেখবার স্থান অন্তরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত তো করেই না, বরং তাকে নানা আবিলতা, পংকিলতা এবং আবর্জনায় নিমজ্জিত রাখে। যদি মানুষের কেউ অন্তরের এ চেহারা দেখতে পেতো, তাহলে নিশ্চয়ই তার কাছে বসতো না. বরং তার সংস্রব বর্জন করে চলতো, তাকে সবাই একঘরে করে রাখতো।

তৃতীয় নীতিঃ অন্তঃকরণ প্রকারান্তরে বাদশাহ্ ও নেতা সদৃশ। অন্তঃকরণ আনুগত্য ও ফরমাবরদারী লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন। মানুষের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই এ অন্তঃকরণের অধীন প্রজা। সুতরাং অন্তরকে যদি ইবাদতের যোগ্য করা যায়, তাহ্লে তার প্রভাব সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই পরিস্ফুটিত হবে। বাদশাহ যদি সঠিক পথে পরিচালিত হয়, তাহলে প্রজাসমূহ স্বাভাবিকভাবেই সোজা পথে পরিচালিত হবে। নবীয়ে করীম (সা) অতি উত্তমভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ -

মানবের শরীরে গোশতের একটি টুকরা রয়েছে। যখন সে টুকরাটি ঠিক থাকে, তখন সমস্ত শরীরই ঠিক থাকে। আর যখন ওটি খারাপ হয়ে যায়, তখন সারা শরীরই খারাপ হয়ে যায়। মনে রেখো, সেই গোশতের টুকরাটি আর কিছু নয়, ওটির নামই অন্তঃকরণ।

সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে, সমস্ত শরীরের সংশোধন অন্তঃকরণের সংশোধনের উপরই নির্ভরশীল। এজন্য অন্তঃকরণকে সংশোধন ও তার পবিত্রতা রক্ষার জন্য সকল প্রচেষ্টা ও সকল সাধনা কেন্দ্রীভূত করা দরকার।

চতুর্থ নীতিঃ অন্তঃকরণই মানুষের সকল মূল্যবান বৈশিষ্ট্যসমূহের ভাণ্ডার এবং সকল মহিমার পীঠস্থান। এ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে প্রথমটি হলো বিবেক আর সর্বাপেক্ষা মহোত্তম বিষয় হলো আল্লাহ্র মারিফত—যা ইহকাল ও পরকাল—উভয় জীবনেরই সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির প্রকৃত কারণ। অতঃপর এতে আছে সে সব বিষয়, যার দ্বারা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এরপর ইবাদতে খালেস নিয়ত রাখতে হবে। কারণ এতে সতত সওয়াব হাসিল হয়। এরপর আছে জ্ঞান ও হিকমতের সকল শ্রেণীর বস্তু, যার ভিত্তিতে মানুষ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হয়। আরও বিদ্যমান সে সব উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মহান কার্যোপকরণ, যার দ্বারা মানুষ অপর সকলের উপর মর্যাদা লাভ করতে পারে।

সুতরাং এমন অমূল্য ভাণ্ডারকে সকল প্রকার ময়লা-আবর্জনা থেকে যেমন পরিষ্কার রাখা দরকার, তেমনি চোর ডাকাত এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকে তাকে রক্ষা করাও অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া, কারামত ও বুযুর্গীর মাধ্যমে তার সম্মান ও মাহাত্ম্যের সৌকর্যও বৃদ্ধি করা দরকার, যাতে সে অমূল্য রত্নে সামান্যতমও ময়লা, পংকিলতা ও দূষণীয় কিছু স্পর্শ করতে না পারে। সাবধান, এ অমূল্য রত্ন যেন কোন শত্রুর প্রভাবে প্রভাবিত না হয়।

পঞ্চম নীতি সম্পর্কে আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে, এতে আবার পাঁচটি অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিতে এ অবস্থাগুলো বিদ্যমান নেই। প্রথম অবস্থাটি এই যে, মানুষের এমন একজন শত্রু বিদ্যমান, যে সর্বদা তার পিছে লেগে আছে। শয়তান মানুষের অন্তরে বাসা বেঁধে থাকে এবং মানুষকে বিভিন্ন প্রকারে ধোঁকা ও ফেরেবে নিপতিত করে। মোটকথা, মানুষকে সর্বদাই দুই দিকে আহবান জানায়।

ফেরেশতা ও শয়তান

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, মনের কাজ অনেক বেশী। কারণ বিবেক ও কামনা এতদুভয়ই এতে বিদ্যমান। আর এ দু'টিই তাদের বাহিনী নিয়ে সুসজ্জিত। একদিকে বিবেক ও তার বাহিনী আর একদিকে কামনা ও তার বাহিনী। সর্বদাই এ দুই বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বিরাজমান। সুতরাং এ ঘাঁটিতে এসে তার হিফাজত ও তত্ত্বাবধান অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, সামান্যতমও গাফলতিকে এখানে প্রশ্রয় দেয়া চলে না।

তৃতীয় বিষয় হলো, মনের উপর বাইরের প্রতিক্রিয়ার ধাক্কাও বেশী। ধোঁকা ও ধ্বংসাত্মক বিষয়ের শর প্রতিনিয়তই তার উপর নিক্ষিপ্ত হয়। বাদল ধারার ন্যায় বিষাক্ত তীরের বাণ দিনরাত তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে। এর যেন আর শেষ নেই। অথচ একে প্রতিরোধ বা বাধা দেয়ার সামর্থ্য ও ক্ষমতা তোমার নেই, বন্ধ করা তো দূরের কথা। এটা চোখের ব্যাপারও নয় যে, চোখের পাতা দু'টি বন্ধ করে দিলেই স্বস্তি পাওয়া যাবে বা অন্ধকার ও নির্জনতায় লুকিয়ে কোন অসহনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার হাত থেকে রেহাই পাবে। এটা জবান নয় যে, তুমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। এ হচ্ছে মনের ব্যাপার। সকল ধোঁকা ও প্রতারণার লক্ষ্যস্থান এটাই, যে সকল ধোঁকা ও প্রতারণাজাল প্রতিরোধ করার সামর্থ্য ও

ক্ষমতা তোমার নেই অথচ মন একটি জিনিস, যা একটু সময়ের তরেও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক নয়। আরও বিপদ এই যে, মনের অনুসরণের ব্যাপারে নফস যেন অতিশয় আগ্রহান্বিত, দ্রুত অনুসরণ করাই যেন নফসের স্বভাব। নফসকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার।

চতুর্থ বিষয়টি এই যে, এর চিকিৎসা করা খুব কঠিন ও সাংঘাতিক মুশকিলের ব্যাপার। কারণ জিনিসটি অদৃশ্য, তোমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। সুতরাং তুমি তার রোগ ধরতে বা জানতেও অক্ষম, যতক্ষণ না তাতে একটা বিপর্যয় এবং ভাবান্তর ঘটে যায়। সুতরাং এ ব্যাপারে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে শ্রম ও মেহনতসহ যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বিশেষ জরুরী কর্তব্য।

পঞ্চম বিষয় এই যে, বিপদাপদ এর প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। অপরপক্ষে অন্তঃকরণ অতি দ্রুত বিপ্লব ও পরিবর্তনকে গ্রহণ করে থাকে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, অন্তঃকরণের বিদ্রোহে তকদীরের চাইতেও দ্রুত বিপ্লব ও পরিবর্তন সাধিত হয়। বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে কোন এক কবি বলেছেনঃ

'পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হওয়ার জন্যই অন্তঃকরণের নাম অন্তঃকরণ রাখা হয়েছে।'

অপরপক্ষে অন্তঃকরণের ভুল-ত্রুটি অত্যন্ত মারাত্মক এবং অন্তঃকরণে যেসব বিপদাপদ উপস্থিত হয়, তাও অতি কঠিন ও ভয়াবহ। আল্লাহ্ না করুন, সেই অবস্থাটি অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপজ্জনক, যখন অন্তঃকরণে কঠোরতা ও গায়রুল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ জন্মলাভ করে। আর সবচাইতে দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, অবস্থার পরিণতি ঘটে কুফরীতে উপনীত হওয়ার মাধ্যমে। এজন্যই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ -

সে নির্দেশ মানলো না, অহংকার দেখালো। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারাঃ ৩৪)

অহংকার শয়তানের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। সেই অহংকারই তাকে নির্দেশ অমান্য ও কুফরী করার ব্যাপারে প্ররোচনা দিয়েছিল। আল্লাহ্ পাক আরও বলেছেনঃ

وَ لٰكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ -

কিন্তু সে তো দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং হয়ে পড়েছে প্রবৃত্তির দাস।
(সূরা আ'রাফ ঃ ১৭৬)

প্রবৃত্তির আনুগত্য ও তৎপ্রতি আকর্ষণ তার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। সেজন্য এ ধরনের জঘন্য গুনাহ্তে লিপ্ত হওয়ার জন্য তার নফস আপনা-আপনিই অগ্রসর হয়েছিল।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

وَ نُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ-

আমরা তার অন্তঃকরণ ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দেবো--যেমন এরা তার উপর প্রথমবার ঈমান আনেনি। আর আমরা তাদের বিভ্রান্ত হয়ে তাদের বিদ্রোহের মধ্যেই ঘূর্ণমান থাকতে দেবো। (সূরা আন'আমঃ ১১০)

এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলার খাস বান্দাগণ নিজেদের অন্তঃকরণে ভয় ও ভীতির সঞ্চার করেছেন এবং সেই ভয় ও ভীতির কারণে আহাজারী করেছেন এবং নিজেদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন অন্তঃকরণের প্রতি।

এসব ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেই আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ -

তারা সেই দিনের জন্য ভয় করে, যেদিন অন্তঃকরণ ও চোখ ফিরে যাবে।

আল্লাহ্ পাক আমাদের ও তোমাদের সকলকে বিপদাপদ ও ক্লেশপূর্ণ পরিস্থিতিতে উপরোক্ত বিষয় ও সন্দেহ থেকে নসীহত হাসিলের তৌফিক দান করুন। আর তৌফিক দান করুন অন্তঃকরণকে সুস্নিগ্ধ, নির্মল ও পবিত্র করার ব্যাপারে।

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

অন্তঃকরণ ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্তঃকরণ সকল দিক থেকেই অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রভাবও সবচাইতে বেশী। সুতরাং অন্তঃকরণের সংশাধনের পন্থা এবং তাতে যে সব পংকিলতা, আবর্জনা সময়ে-অসময়ে এসে ভীড় জমায়, তা অবশ্যই জানা দরকার। আরও জানা দরকার সে সব বিষয়, যেগুলো অন্তঃকরণে ভীড় জমিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়-- এমনকি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিতে চায়। কারণ এসব জানা থাকলে, তবেই তাতে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন, পংকিলতা দূরীকরণ ও বিপজ্জনক বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা সম্ভবপর।

অন্তরে যেসব বিষয় ভীড় জমিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তার তালিকা অতি দীর্ঘ। এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সব কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে এখানে অন্তঃকরণের চিকিৎসার জন্য জরুরী বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে।

অমি গভীরভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখেছি যে, অন্তঃকরণের চিকিৎসার জন্য যা জরুরী এবং ইবাদতের ব্যাপারে যা অপরিহার্য তা চার প্রকার। এই চার প্রকার জানা ব্যতীত অন্তঃকরণের চিকিৎসা ও ইবাদতের ব্যাপারে নিরাপদ হওয়ার কোনই গত্যন্তর নেই। কারণ, এগুলো ইবাদতের পথে বাধা এবং সাধনায় লিপ্ত ব্যক্তিদের বিপদে পতিত করা এবং অন্তঃকরণে অপবিত্রতা সৃষ্টিতে সহায়ক। শুধু তাই নয়, এগুলো এমন যে, বিপদাপদ, বিভ্রান্তি, বিপর্যয় ও ধ্বংসের দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। অপরপক্ষে, এ চার প্রকার জিনিসের বিপরীত চারটিই আবার ইবাদতে সুস্থতা, ইবাদতকারীর জন্য প্রসন্নতা এবং অন্তঃকরণে সুষ্ঠুতা বিধান করে। প্রথম চারটি হলোঃ (১) অতিরিক্ত আশা, (২) দ্রুততা, (৩) হিংসা এবং (৪) অহংকার। অপরপক্ষে, উত্তম চারটি বিষয় হলো (১) আশা পরিত্যাগ করা, (২) দ্রুত কার্য সম্পন্ন করার অভ্যাস দূরীকরণ, (৩) সৃষ্টির কল্যাণ কামনা এবং (৪) বিনীত ও নম্র স্বভাব অবলম্বন। মোটকথা, প্রথম চারটিই মানুষের অন্তরে সকল প্রকার বিপর্যয় আনয়ন করে। অপরপক্ষে, শেষোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যই মানুষের অন্তরে সুস্থতা বিধান করে। এ আটটিকেই অন্তরে সুস্থতা ও বিশৃঙ্খলার উৎস বলা যায়। সুতরাং প্রথম চারটি থেকে পরিত্রাণ ও শেষোক্ত চারটিকে অর্জন করার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

তাহলেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ সহজ হয়ে যাবে। এবার বিষয়গুলোকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

অতিরিক্ত আশা ও তার প্রতিকার

অতিরিক্ত আশাই সকল প্রকার, উত্তম, ভাল ও কল্যাণমূলক কার্যের বাধাস্বরূপ। শুধু তাই নয়, এ অতিরিক্ত আশাই মানুষের জীবনে সকল প্রকার কু-কাজ, বিশৃঙ্খলা এবং বিপর্যয় আনয়ন করে। এটা এমন একটি বেয়াড়া রূপ, যে মানুষকে সর্বদা বিপদাপদ ও পরীক্ষায় নিপতিত করে। মনে রাখবে, আশা যখন দীর্ঘতর হতে থাকে, তখন মানুষের মধ্যে অপর চারটি বিষয় নিশ্চিতই সৃষ্টি হয়ে যায়।

প্রথমত, সে ব্যক্তি থেকে নেকী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আমলে আলস্য ও ঢিলেপনা দেখা দেয়। তখন মানুষ মনে মনে বলতে থাকেঃ আরে, এত তাড়াতাড়ি কিসের—সময় তো বহু পড়ে আছে।

দাউদ তায়ী (র) সত্যিই বলেছেন, যার মধ্যে ভয় ও ভীতি এবং শাস্তি ও পরিণাম সম্পর্কে সচেতনতা আসবে, বহু দূরও তার কাছে নিকটবর্তী হয়ে যায়। কিন্তু যার আশা দীর্ঘায়িত হয়ে যায়, তার আমলই ধ্বংস এবং বরবাদ হয়ে যায়।

ইয়াহিয়া ইবনে মায়ায রাযী (র) বলেছেনঃ আশা ও আকাঙক্ষাই উত্তম কার্যে বাধা দানকারী এবং লোভ ও লালসাই সত্য-বিচ্যুতকারী। অপরপক্ষে, সবরই সকল কার্যে সাফল্য আনয়নকারী এবং নফ্সই সকল মন্দের আহবানকারী।

দ্বিতীয়ত, তওবা পরিত্যাগ করা কিংবা তাকে লটকিয়ে রাখা অর্থাৎ 'শীঘ্রই তওবা করবো' এই করছি, তাড়াতাড়িই করবো' অথচ করা হচ্ছে না, এই অবস্থা অথবা মনে মনে এই ধারণা করা যে, আমার বয়স তো অল্প, এখনো আমি জওয়ান। সুতরাং তওবা করার যথেষ্ট সময় আছে। যদি ইচ্ছা করি, তবে যে কোন সময় তওবা করতে সক্ষম হবো।' এ ধরনের চিন্তার পরিণাম এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাপে নিমজ্জিত অবস্থায় অকস্মাৎ মৃত্যু এসে সহসাই জীবনদীপ নিভিয়ে দিয়ে যায়। তখন আর তওবা করা হয় না। দীর্ঘ জীবনের আশাই মানুষকে এমন অসহায় অবস্থায় নিপতিত করে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক জিনিসেই, প্রত্যেক ব্যাপারেই লোভ ও লালসা বৃদ্ধি পায় ফলে দুনিয়াকে আখিরাতের চাইতে অধিক কাম্য মনে হয়। এ অবস্থায় পৌঁছে

মানুষ মনে মনে বলতে থাকেঃ 'বুড়ো বয়সে আমাকে দারিদ্র্য ও অসহায় অবস্থায় যেন পতিত হতে না হয় তজ্জন্য এখন অতিরিক্ত জমা করা দরকার।' ফলে প্রয়োজনাতিরিক্তের প্রতি লোভ-লালসা আরো বৃদ্ধি পায়। অথবা মনে করে, 'যদি শেষ বয়সে আমি কামাই করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলি অর্থাৎ আমার মধ্যে যদি উপার্জন ক্ষমতা না থাকে, তাহলে আমাকে দারিদ্র্য ও কষ্টে নিপতিত হতে হবে। সুতরাং এখনই সেদিনের জন্য জমা করা উচিত'।

মোটকথা, এ ধরনের চিন্তায় মানুষের মনকে এমন লোভী ও লালায়িত করে তোলে যে, দুনিয়ার প্রতি তার আসক্তি এবং দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা গভীর হয়ে যায়। ফলে সে রিযিকের ধান্দাতেই সমগ্র সময় ব্যয় করতে থাকে। অবস্থা এই যে, সব সময় কেবল বলতে থাকেঃ 'কি খাব, কি পরিধান করবো, আহা! শীতকাল এসে গেলো, আমার শীতের কাপড় নেই। গরম এসে গেলো অথচ আমার কিছুই নেই যে, গরমে শান্তিতে দিন কাটাবো ! এমনও তো হতে পারে যে, আমার জীবন সহসাই শেষ হচ্ছে না, হয়তো আমি বহুদিন বেঁচে থাকবো। তখন আমার অনেক কিছুরই প্রয়োজন। বৃদ্ধ বয়সে মানুষের প্রয়োজন অনেক বেড়ে যায়। তখন আমার যেন খাওয়া-পরার কোন অভাব না হয়, মানুষের নিকট যেন আমার হাত পাততে না হয়।' মোটকথা, এ চিন্তা মানুষকে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি-প্রবণ করে তোলে এবং সম্পদ জমা করার দিকে আগ্রহী করে। এমনকি, যা কিছু তার আছে, তাও খরচ করা থেকে বিরত রাখে।

আসল কথা এই যে, এ ধরনের মনোবৃত্তি ও চিন্তা মানুষকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, তার সময়ের অপচয়·ঘটায়, জীবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। সাথে সাথে অনাহূত দুঃখ, বেদনা ও ক্লেশ বৃদ্ধি করে।

হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ সেই একটি দিনের চিন্তাই, যেদিন এখনো আগমন করে নাই, মেরে ফেললো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ আয়, আবূ যর! কোন্ দিন? তিনি জবাব দিলেনঃ আমার আশা আমার বয়সকে অতিক্রম করে গেছে।

চতুর্থত, অন্তরে কঠোরতা ও আখিরাত সম্পর্কে নির্ভাবনার জন্য। এমনকি আখিরাতের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া। কারণ মানুষ যখন দীর্ঘ জীবনের আশা পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়, তখন তার না মওতের কথা মনে থাকে, না কবরের কথা স্মরণ হয়।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেনঃ আমি নিজের জন্য যেমন দু'টি বিষয়কে ভয় করি, তেমনি সে বিষয় সম্পর্কে তোমাদের ব্যাপারেও ভয় করি। এ দু'টি বিষয় হলোঃ দীর্ঘ জীবনের (অতিরিক্ত আশা মাত্রই) আশা এবং প্রবৃত্তি-লালসার দাসত্ব। সাবধান! দীর্ঘ জীবনের কামনা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় আর প্রবৃত্তি-লালসার অনুসরণ সত্য থেকে বিচ্যুত করে। মনে রেখো, এমন অবস্থায় উপনীত হলে মানুষের সকল চিন্তা-ভাবনা তার সকল প্রকার বড় বড় ও মহৎ কার্যাবলী পার্থিব বিষয়ে এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের সরঞ্জাম-উপকরণের ভালবাসার মধ্যে পরিগণিত হবে। ফলে অন্তঃকরণ হয়ে পড়ে কঠোর। কারণ অন্তঃকরণ স্বচ্ছ, নির্মল ও সজীব হয় মওত, কবর, হিসেব-নিকেশ এবং আখিরাতের বিভিন্ন অবস্থা স্মরণের দ্বারা। সুতরাং যখন এসবের কোন কিছুই স্মরণ থাকে না, তখন অন্তঃকরণে কি করে সজীবতা, নির্মলতা ও পবিত্রতা আসবে?

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ -

অতঃপর তাদের জীবনের বহু দিন অতিক্রান্ত (তথাপিও তওবা করেনি) — সুতরাং তাদের অন্তঃকরণ (খুবই) শক্ত হয়ে গেছে।

সুতরাং তুমি যখন তোমার জীবনকে দীর্ঘ মনে করবে, তখন তোমার নেকী হ্রাস পাবে, তওবা ভুলে যাবে, গুনাহ্ বেশী হবে এবং লোভ-লালসা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ না করুন, কিন্তু যদি আল্লাহ্ পাক তোমার আখিরাতের সম্পর্কে তোমার প্রতি সদয় না হন, তাহলে তোমার আখিরাত সত্যি বরবাদ হয়ে যাবে। তাহলে এবার চিন্তা করে দেখো, এর চাইতে অধিক খারাপ অবস্থা আর কি হতে পারে? আর এর চাইতে বড় বিপদই বা আর কি আছে? এ সবই হলো অতিরিক্ত আশা, দীর্ঘ জীবনের আশা পোষণের পরিণাম। অপরপক্ষে, তুমি যখন জীবনকে খাটো মনে করবে-- নিজেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী বলে ধারণা করবে, তোমার সমবয়সী ও ভাই-বন্ধু মৃত্যু যাদের সহসাই এসে জীবনের দীপশিখা নিভিয়ে দিয়ে গেছে-- যে মৃত্যু সম্পর্কে তারা একটু সচেতন ছিল না--তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে এবং নিজের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের বলবে যে, 'তাদের মতোই যে-কোন সময় তোমারও সেই অবস্থা হতে পারে। সুতরাং হে নফ্স!

অহংকারী হয়ো না, ভয় করো সেই মৃত্যুকে। তাহলে নিশ্চয়ই নফ্‌সের অহংকারী ও দীর্ঘ জীবনের আশা তোমার নিমিষে মিলিয়ে যাবে এবং এসব জীবনকেই ঘৃণা করতে শুরু করবে। সেই সাথে তোমার নফ্‌সকে আউফ ইবনে আবদুল্লাহ্‌র বাণী স্মরণ করিয়ে দাও। তিনি বলেছেনঃ এমনও বহু ব্যক্তি রয়েছে যারা দিন শুরু করে তা সমাপ্ত করতে সক্ষম নয়, অর্থাৎ দিনের মধ্যেই মৃত্যু এসে যায়। তেমনি বহু লোক এমনও রয়েছে যারা আগামী দিনের প্রতীক্ষা করে কিন্তু সেই আগামী দিন তাদের আর কখনো আসে না।

এভাবে তুমি যদি মৃত্যু ও যে-কোন মুহূর্তে তার আগমন সম্পর্কে সচেতন হতে পারো, তাহলে কোন ব্যাপারেই দীর্ঘ আশা, কোন বিষয়েই অহংকার জন্মিতে পারবে না, বরং এগুলোর প্রতি সুস্পষ্ট ঘৃণা জন্মলাভ করবে।

হযরত ঈসা (আ)-র বাণী কি তোমরা শোন নাই? তিনি বলেছেনঃ দুনিয়া তিনটি কালের সমষ্টি। অতীত — যা গত হয়ে গেছে, তা তোমার হাতছাড়া, সে সময় তোমার আর ফিরে আসবে না। সে অতীতের কোন কিছুই তোমার কাছে বিদ্যমানও নেই। ভবিষ্যৎ — যে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই, সে ভবিষ্যৎ তোমার আসবে কিনা তাও তুমি জান না। সুতরাং আজকের দিনই তথা বর্তমান মুহূর্তই তোমার কাছে বিদ্যমান। এ বর্তমানকেই সকলে অধিকতর দামী মনে করো। বর্তমান মুহূর্তই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

অতঃপর স্মরণ করো হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর বাণী। তিনি বলেছেনঃ দুনিয়ার তিনটি কাল রয়েছে। একটি কাল বা সময় তো চলে গেছে— তা এখন অতীত। আর একটি কাল বর্তমানে বিদ্যমান। তৃতীয় কালটি তুমি পাবে কিনা, তা জানা নেই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে একটি সময় বা কাল ব্যতীত বাকিগুলোর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। আর তাছাড়া, মওত যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। সুতরাং বর্তমান ব্যতীত তোমার হাতে আর কিছুই নেই।

এরপর আমাদের বুযুর্গদের বাণীগুলোকে পর্যালোচনা করা দরকার। তাঁরা বলেছেনঃ দুনিয়াটা তিনটি নিঃশ্বাসের ন্যায়। একটা শ্বাস ছাড়া হয়েছে, সে সময় তোমার যা করার ছিল, তা তুমি করেছ। আর একটি শ্বাস, যা তুমি বর্তমানে নিচ্ছ। তৃতীয়টি সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তাই নেই যে, তুমি তা নিতে সক্ষম হবে কি না! কেননা, অনেক শ্বাস গ্রহণকারীই পরবর্তী শ্বাস নেয়ার অবকাশ পায় না—

তার আগেই মৃত্যু এসে তাকে ঘিরে নেয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তুমি একটি শ্বাস ব্যতীত অবশিষ্ট কিছুরই অধিকারী নও, একদিন বা এক ঘন্টা তো দূরের কথা। সুতরাং মৃত্যু আসার পূর্বে যতটুকু সময় পাচ্ছ—তাতে নেক কাজের প্রতি, আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে মনোযোগী হও। এরই মধ্যে তওবা সেরে নাও। কেননা, দ্বিতীয় শ্বাস গ্রহণের পূর্বেই হয়তো বা মৃত্যু এসে তোমাকে পরপারে নিয়ে যাবে। তাছাড়া রিযিকের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকা উচিত নয়। কারণ, সে রিযিকের পূর্বেই তোমার ইন্তেকালও তো হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তুমি যদি তা নিয়ে ব্যস্ত থাক, তাহলে তোমার সে ব্যস্ততা একটি সময়ের অপচয়, মূল্যবান জীবনের বরবাদী এবং মিথ্যা জিনিসের জন্য পেরেশানী ব্যতীত আর কিছুই প্রতিপন্ন করবে না। মানুষের জন্য কিছুতেই সমীচীন নয় যে, সে একদিন বা এক ঘন্টা এমনকি একবার নিঃশ্বাস ত্যাগের সমান সময়ও রিযিকের অনুসন্ধান ও ফিকিরে বিনষ্ট করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সে ফরমান থেকে কি তোমরা নসীহত হাসিল করছ না, হযরত উসামা (রা) সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেনঃ তোমরা কি উসামার কার্যে আশ্চর্যান্বিত হও নাই? উসামা এক মাস অবস্থানের জন্য জিনিসপত্র ক্রয় করে। উসামা খুবই দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি ভূমিতে এমন একটি পদও ফেলি না, যেটা সম্পর্কে ধারণা করি যে, তা তুলতে সক্ষম হবো। তেমনি এমন একটি লোকমাও মুখে তুলি না, যেটাকে আমি চিবাতে সক্ষম হবো বলে ধারণা করি। বরং মনে করি যে, পা ফেলা ও উঠিয়ে নেয়ার মধ্যে যে তফাতটুকু কিংবা লোকমা মুখে পুরে দেয়া ও তা চিবানোর মধ্য যে সময়ের অবকাশ, তার মধ্যেই মৃত্যু এসে যেতে পারে। আমার জীবন যাঁর হাতে, তাঁর কসম! তোমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট হয়েছে, তা অবশ্যই ঘটবে—তাকে তোমরা কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না।

মোটকথা, হে মানব, যখন তুমি উপরিউক্ত আলোচিত বিষয়সমূহ থেকে নসীহত হাসিল করবে এবং বারবার তা আলোচনা করবে, তখন আল্লাহ্‌র মর্যী ও তাঁর ফযলে দীর্ঘ জীবনের আশা তোমার নিমিষেই মিলিয়ে যাবে। তুমি দেখতে পাবে যে, তুমি অবলীলাক্রমে সওয়াবের পথে এগিয়ে যাচ্ছ এবং দ্রুত তওবা সম্পাদন করছো। ফলে তোমার পাপ হ্রাস পাবে, আর তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ও তা সাধন করার মহান মর্যাদা। এর দ্বারা আল্লাহ্

তা'আলা তোমার হিসেব-নিকেশ ও শাস্তির বোঝা হাল্কা করে দেবেন। এভাবে তোমার অন্তঃকরণ লিপ্ত হবে আখিরাতের চর্চা এবং তার বিপদাপদের স্মরণে। দুনিয়া হয়ে যাবে তোমার নিকট তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ। এভাবে প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি নিঃশ্বাস তোমাকে এগিয়ে নেবে সওয়াবের পথে। ফলে অন্তরের কাঠিন্য দূর হয়ে তাতে দেখা দেবে সজীবতা, নির্মলতা ও পবিত্রতা।

অতঃপর অন্তঃকরণে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ের সঞ্চার হবে। ফলে ইবাদতে আসবে সুস্থতা ও স্থিতি। মনে জাগবে দৃঢ়-প্রত্যয় যে, আমি আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি, আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করছি। এভাবেই ইনশাআল্লাহ্ আখিরাতেও লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে।

দীর্ঘ জীবনের আশা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এসব কিছুই আল্লাহর ফযলে যে-কোন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্ণিত আছে, যোহরা ইবনে আওফা (রা)-কে তাঁর ইন্তেকালের পরে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তাঁর নিকট কোন্ আমলটা উত্তম? তিনি জবাবে বলেছিলেন? সন্তুষ্টি ও আশা পরিত্যাগ।

সুতরাং সকলেরই নিজের বিবেক দিয়ে যাচাই করে দেখা উচিত যে, সে কতখানি আশার ছলনায় লিপ্ত রয়েছে। এ ব্যাপারে গভীর চিন্তা করা দরকার এবং সকল প্রচেষ্টাকে এ মহান বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য ব্যয় করা উচিত। কেননা, আশা পরিত্যাগ অন্তঃকরণের সংশোধন ও নফ্সের শুদ্ধির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ।

হিংসার অপকারিতা

হিংসা সওয়াব ধ্বংসকারী এবং গুনাহ্র প্রতি আহবানকারী। এটা এমন একটা জঘন্য রোগ যে, সাধারণ মানুষ এবং অজ্ঞ লোকই শুধু নয়, অনেক আলিম এবং জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেও এ রোগ বিদ্যমান। এমনকি, বহু আলিম ও জ্ঞানী-গুণীকে এ রোগেই ধ্বংস করে দোযখের দ্বার-প্রান্তে উপনীত করে ছেড়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফরমান কি তোমরা শোন নি? তিনি বলেছেনঃ ছয় প্রকারের মানুষ ছয়টি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। আরব গোত্র-বৈষম্যের জন্য, শাসক জুলুমের জন্য, কৃষক অহংকারের জন্য, ব্যবসায়ী খেয়ানতের জন্য, গ্রামবাসী মনুষ্যত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য এবং উলামায়ে কিরাম হিংসার জন্য দোযখে

দাখিল হবে। সুতরাং এ মারাত্মক ধ্বংসকারী জিনিস থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া হিংসা আরও পাঁচটি ধ্বংসকারী অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রথমত, হিংসা সওয়াব ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

اَلْحَسَدُ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْ كُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -

হিংসা সওয়াবকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে (ধ্বংস করে), যেভাবে আগুন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে (পুড়িয়ে ফেলে)।

দ্বিতীয়ত হিংসা গুনাহ্ ও অন্যায় কার্যে প্রলুব্ধ করে। দাহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ (রা) বলেছেনঃ হিংসা পোষণকারী ব্যক্তির তিনটি নিদর্শন রয়েছে। সাক্ষ্যদানের সময় সে তোষামোদ করবে, অনুপস্থিত ব্যক্তির গীবত করবে, আর বিপদে পড়লে তা থেকে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বের করবে।

তোমাদের জন্য এ-ই যথেষ্ট যে, আল্লাহ পাক শয়তান ও জাদুকর থেকে যেমন আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তেমনি হিংসা পোষণকারী থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, যেমন তিনি বলেছেনঃ

وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ -

সুতরাং একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, হিংসাকারীর মধ্যে কতখানি খারাবী এবং ফিতনা বিদ্যমান রয়েছে, যার জন্য হিংসাকে শয়তান ও জাদুকরের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি, হিংসাকারী ব্যক্তির থেকে আশ্রয়ের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন গত্যন্তরই নেই।

তৃতীয়ত, হিংসার দ্বারা অকারণ ব্যথা-বেদনা ও ক্লেশ বাড়ানো হয় অথচ সাথে সাথে গুনাহ্ও বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়। ইবনে সাম্মাক (রা) বলেছেনঃ হিংসুকের চাইতে বড় জালিম আর কেউ হতে পারে না। কারণ হিংসার চাইতে আর কোন বড় জুলুম নেই। অথচ এর ফলে হিংসাকারীর নফ্স থাকে পেরেশান, চিত্ত হয়ে পড়ে অস্থির। আর ব্যথা, ক্লেশ ও দুশ্চিন্তা হয় তার নিত্য সাথী।

চতুর্থত, হিংসার দরুন মানুষের অন্তরের উপর কালো পর্দা পড়ে যায়। এমনকি, আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকাম বুঝবার ক্ষমতাও তাতে আর বিদ্যমান থাকে না। সুফিয়ান সওরী (রা) বলেছেনঃ বেশীক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার অভ্যাস

করবে। তাতে পরহেযগারী হাসিল হবে। দুনিয়ালোভী হয়ো না। তাহলে নিরাপদ ও নিশ্চিত জীবন যাপন করতে পারবে। গালিগালাজ করো না। তাহলে মানুষের সমালোচনা ও গালাগাল থেকে নিরাপদ থাকবে। হিংসুক হয়ো না। তাহলে বিবেক ও বোধশক্তি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং তীক্ষ্ণ হবে।

পঞ্চমত, হিংসার দরুন অসম্মান লাভ হয় আর মানুষ হতভাগ্য হয়ে যায়। কারণ হিংসা থাকলে তার কোন উদ্দেশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না এবং সে ব্যক্তি তার কোন শত্রুর উপর জয়ী হতে পারে না। হাতিম আসিম (র) বলেছেনঃ বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পোষণকারী কখনো দীনদার হয় না, অপবাদ দানকারী ইবাদত-গোযার হয় না, চোগলখোর নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে না আর হিংসুক কখনো সাহায্য পায় না।

হিংসুক কি করে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হবে? হিংসুকের উদ্দেশ্য তো হলো আল্লাহ্‌র অনুকম্পা প্রাপ্ত ব্যক্তি যেন তা না পায়, আর হিংসুক কি করে তার শত্রুর উপর জয়ী হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য প্রাপ্ত হবে? হিংসুকের লক্ষ্যস্থল তো হলো মু'মিন ব্যক্তি। আবূ আইয়ুব (রা) কি সুন্দরই না বলেছেনঃ আয় আল্লাহ্! তোমার বান্দাদের পরিপূর্ণ নিয়ামত এবং তাদের অবস্থার ব্যাপারে আমাকে সবর করার তৌফিক দান করো। কারণ এটা এমন একটি রোগ, যা সমস্ত নেক-প্রবৃত্তি ধ্বংস করে দেয়, মন্দ ও কুপ্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করে, নফ্‌সের শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে আর শত্রুর উপর জয়ী হওয়ার এবং নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে নিজের বিবেককে অকেজো করে দেয়।

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হিংসার চাইতে জঘন্যতম রোগ আর নেই। এ রোগের প্রতিকারের জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

তাড়াতাড়ির কুফল

এটাও এমন একটি অভ্যাস যা উদ্দেশ্যকে বানচাল এবং মানুষকে গুনাহ্‌তে লিপ্ত করে। তাড়াতাড়ির ফলে মানুষের জীবনে চার রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

প্রথমত, ইবাদত-গোযার মানুষের পক্ষে ইবাদতে স্থির এবং উৎকর্ষ হাসিল করার কামনা থাকাই স্বাভাবিক এবং এজন্য চেষ্টা-যত্ন করাও কর্তব্য। কিন্তু

অনেক সময় তাড়াতাড়ি করার ফলে সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। ফলে সে হতাশ হয়ে পড়তে পারে। এমনকি, এ হতাশাই তাকে ইবাদত থেকে দূরে নিয়ে যেতে থাকে এবং সে ইবাদতে স্থিতি ও সৌকর্য হাসিলের চেষ্টাই পরিত্যাগ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তাড়াতাড়িই তাকে এমন একটি মহান মকাম হাসিল থেকে বঞ্চিত করে। কিংবা সে মকাম হাসিলের জন্য অতিরিক্ত আত্মনিয়োগ করে দ্রুত নফ্সকে ক্লান্তিতে নিমজ্জিত করে। এভাবেও এ মকাম হাসিল থেকে সে হয় বঞ্চিত। এসব ব্যাপার সংঘটিত হয় কেবলমাত্র তাড়াতাড়ি করার জন্যই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

اِنَّ دِيْنَنَا هَذْمَتَيْنِ فَادْ خَلَ فِيْهِ بِرِ فْقٍ فَاِنَّ الْمُبْنَتَ لا اَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهْرًا اَبْقٰى -

আমাদের এই দীন অত্যন্ত মজবুত। সুতরাং এতে বিনয়ের সাথে প্রবেশ করো। কারণ এ থেকে যা অর্জিত হয়, তা এমন জমিন নয় যে, তাকে অতিক্রম করা যাবে কিংবা এমন অতিরিক্ত মালও নয় যে, অবশিষ্ট থেকে যাবে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, তাড়াতাড়ি করো না— উদ্দেশ্য হাসিল হবে। কোন এক ব্যক্তি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে না, সে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই করতে পারে। আর যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে, তার পদস্খলনের আশঙ্কাই বেশী।

দ্বিতীয়ত, মানুষের কোন একটা বিষয়ের প্রয়োজন হলে তা পাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে— এমনকি, তা পাওয়ার জন্য খুবই কান্নকাটিও করে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এমন হয় যে,তার দোয়া কবূল হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি শুরু করে দিয়ে তা লাভ করার ব্যাপারে সে হয় ব্যর্থ। ফলে, সে হতাশ হয়ে পড়ে। এমনকি, ভীষণ দুঃখিত হয়ে দোয়া করাই পরিত্যাগ করে। পরিণামে সে ব্যক্তি নিজের কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে আর পৌঁছতে সমর্থ হয় না।

তৃতীয়ত, কোন ব্যক্তির উপর হয়তো অপর কেউ জুলুম করলো। ফলে প্রথম ব্যক্তি ক্রোধে নিপতিত হয়ে জুলুমকারীর জন্য বদদোয়া করার ব্যাপারে জলদবাজী করে বসে। ফলে, তার দরুন একজন মুসলমানের মাল, সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি, অনেক সময় সীমাতিক্রম করে গিয়ে নিজেই গুনাহ্ ও ধ্বংসে নিপতিত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন।

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً -

মানুষ মন্দের (অভিশাপ) জন্য তেমনিভাবেই দোয়া করে যেমন করে কল্যাণের জন্য। মানুষ (সত্যিই) দ্রুতগামী। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১)

চতুর্থত, ইবাদতের ভিত্তিই হলো পরহেযগারী আর পরহেযগারীর বুনিয়াদ হলো, প্রত্যেক ব্যাপারে পূর্ণতা বিধান; ধীর-স্থীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা-- প্রত্যেক বিষয় নিয়েই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং খাওয়া-দাওয়া, পরিধান, কথাবার্তা তথা সকল কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু মানুষ যখন দ্রুততাকারী হবে, তখন কোন কাজ করার ব্যাপারে এবং কোন কথা বলার সময় সে তার যথার্থতা যেমন অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না, তেমনি সে তা যথাযথভাবে করতে বা বলতেও সক্ষম হবে না। পরিণাম এই হয় যে, যেহেতু সকল কাজেই বিবেচনা, চিন্তা-ভাবনা জরুরী, সেহেতু দ্রুততার ফলে তার কোন কাজেই সাফল্য লাভ হয় না।

মোটকথা, কথা বলার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করলে হবে ভুল, আর খাওয়া ও এ-ধরনের অন্যান্য ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করলে হারাম এবং অসিদ্ধ কার্যে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। এমনিভাবে সকল কাজেই তাড়াতাড়ির পরিণামে ব্যর্থতা এসে ঘিরে নেবে। ফলে পরহেয্গারীও অপসৃত হতে থাকবে। একদিন তা বিলুপ্তই হয়ে যাবে অথচ পরহেযগারী ব্যতীত ইবাদতে কোনই কল্যাণ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কেবল তাড়াতাড়ির জন্যই যখন মানুষ কল্যাণকর ও উত্তম মকাম থেকে বিচ্ছিন্ন, মনোবাঞ্ছা থেকে বঞ্চিত হয়, অপর মুসলমানের ধ্বংস তথা নিজেরও ধ্বংস ও বরবাদী আনয়ন করে এবং তার সবচাইতে মূল্যবান ও প্রধান বৈশিষ্ট্য পরহেয্গারীই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন সকল মানুষেরই অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাড়াতাড়ি করার অভ্যাসটি দূর করার চেষ্টা করবে। অতঃপর নিজের নফ্সের সংশোধনার্থে অগ্রসর হবে।

অহংকারের কুফল

অহংকার বস্তুত মানুষের ভিত্তিই ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ পাকের ফরমান কি তোমরা শোন নি? তিনি বলেছেনঃ

اَبٰى وَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ -

সে নির্দেশ অমান্য করলো এবং অহংকার করলো– সে ছিল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা বাকারাঃ ৩৪)

তাছাড়া, এ অভ্যাসটি অন্যান্য মন্দ অভ্যাসের ন্যায় কেবলমাত্র আমল ও অন্যান্য বিষয়ের আংশিক ক্ষেত্রেই ক্ষতি ও খারাবী আনয়ন করে না, বরং এ অভ্যাসটি বুনিয়াদ বা ভিত্তিই ধ্বংস করে এবং দীন ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ না করুন, এ অভ্যাসটি যদি শক্তিশালী হয়ে পড়ে এবং প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে তার উৎপাটন খুবই কঠিন ব্যাপার। এ অভ্যাসের ফলে অন্তত চারটি বিষয় উদ্ভূত হয়। প্রথমত, সত্য লাভে বঞ্চিত হওয়া— আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন ও তাঁর আহ্কামের মা'রিফাত লাভের ব্যাপারে মানুষের অন্তরে কালো পর্দা পড়ে যায় (অর্থাৎ) তা বুঝতে বা চিনতে পারে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ -

আমি সে সকল লোককে আমার নিদর্শন থেকে বিমুখই রাখবো, যারা দুনিয়ায় অহংকার করে, যে অহংকারের কোন অধিকার তাদের নেই। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৬)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেনঃ

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ -

যত অহংকার ও বিদ্রোহী রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে সেভাবেই মোহরাংকিত করেন। (সূরা মুমিনঃ ৩৫)

দ্বিতীয়ত, অহংকারীকে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধে নিপতিত হতে হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ -

নিশ্চিতই তিনি অহংকারীকে ভালবাসেন না।

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আ) আরয করেছিলেনঃ আয় পরওয়ারদিগার! তোমার মখ্‌লূকের মধ্যে তোমার নিকট সবচাইতে অধিক ঘৃণিত কে? জবাব দেয়া হলোঃ যে ব্যক্তি অন্তরে অহংকার পোষণ করে, জবান দারায করে, নিজের চক্ষুকে প্রসারিত করে, নিজের হস্ত বাড়িয়ে তোলে এবং নিজের চরিত্রকে দূষিত করে।

তৃতীয়ত, অহংকারের দরুন দুনিয়া ও আখিরাতে অসম্মান এবং শাস্তি—উভয়ই ক্রয় করা হয়।

হাতিম (রা) বলেছেনঃ তিনটি জিনিস থেকে সর্বদা দূরে থাকবে—যাতে এ তিনটি দোষসহ তোমার মৃত্যু না হয়। জিনিস তিনটি হলোঃ অহংকার, লোভ এবং দম্ভ। কারণ, অহংকারীকে আল্লাহ্ পাক ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে আহবান করেন না, যতক্ষণ না তাকে দুনিয়ার নীচাশয় ও দুর্বৃত্ত শ্রেণীর মানুষের দ্বারা অসম্মান ও বেইয্যত করেন, লোভীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক এই দুনিয়া থেকে আহবান করেন না, যতক্ষণ না খাওয়ার একটি লোকমা ও এক ঢোক পানির জন্য চূড়ান্তভাবে গত্যন্তরহীন না করেন। তেমনি দাম্ভিককেও ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক এ দুনিয়া থেকে আহবান করেন না, যতক্ষন না পংকিলতা ও কালিমায় তাকে নিমজ্জিত না করেন।

বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নাহকভাবে অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ করে, আল্লাহ্ পাক তাকে হকভাবেই অসম্মানে পতিত করেন।

চতুর্থত, আখিরাতে আযাব ও দোযখের আগুনে পুড়তে হবে। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعُظْمَةُ اِزَارِيْ فَمَنْ نَازَ عَنِيْ فِيْ وَاحِدٍ مِّنْهَا اَدْخَلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ -

বড়াই আমার চাদর এবং গরিমা ও সম্মান আমার কোর্তা। সুতরাং যে ব্যক্তি এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটা আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়–আমি তাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করবো।

অর্থাৎ গরিমা ও অহংকার আল্লাহ্‌র এমন দু'টি গুণ, যা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো জন্যই সমীচীন নয়। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে তা প্রকাশ

করতে যাওয়াও ধৃষ্টতা। মানুষের চাদর ও কোর্তা যেমন তার নিজস্ব ব্যবহারের জিনিস, তাতে অন্য কারো অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না—এ ব্যাপারটিও তেমনি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অহংকার এমন একটি অভ্যাস যা সত্যকে চিনে নেয়া এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শন বোঝার পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এমনকি, তাঁর হুকুম- আহকামের যথার্থতা, যা সকল কাজের ভিত্তি, তাকে অনুধাবনের পক্ষেও অহংকার বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে শাস্তি, পৃথিবীতে অসম্মান এবং পরকালে দোযখের কঠোর আযাব তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

সুতরাং কোন বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষেই এ ব্যাপারে অসতর্কতার পরিচয় দেয়া উচিত নয়। বরং প্রত্যেকের এ মন্দ অভ্যাস দূর করে আল্লাহর শাস্তি এবং ইহকাল ও পরকালে অসম্মান ও আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

উপরিউক্ত চারটি চারিত্রিক ত্রুটির কুফল সম্পর্কে আমার যতদূর ধারণা ছিল, তা আমি বর্ণনা করে দিলাম। বুদ্ধিমান মানুষের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

মোটকথা, অন্তরকে বিশুদ্ধ করার জন্য এগুলো দূর করা অপরিহার্য। মনে প্রাণে চেষ্টা করলে এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করে কাজে অগ্রসর হলে নিশ্চয়ই এ অসম্ভব নয়। আল্লাহ্ পাক তৌফিক দান করুন।

বর্ণিত দোষ থেকে মুক্তির উপায়

উপরে যে কয়টি চারিত্রিক দোষের বিষয় বর্ণনা করা হলো, সেগুলোর প্রতিক্রিয়া অতি মারাত্মক ও ব্যাপক। এজন্য এসব থেকে নিজেকে রক্ষা করা অপরিহার্য কর্তব্য। এগুলো থেকে বাঁচবার চেষ্টা করতে গেলে প্রথমেই এগুলোর বিভিন্ন অবস্থা ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। সুতরাং এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে এগুলোর প্রত্যেকটি এমন ভয়াবহ বিষয় যে, প্রত্যেকটির ব্যাপারেই দীর্ঘ আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু ক্ষুদ্র গ্রন্থে তা সম্ভব নয়। মৎপ্রণীত 'ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্দীন' গ্রন্থে আমি এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে কেবলমাত্র যা না হলে গত্যন্তর নেই, তেমন ধরনের কিছু আলোচনা করা হলো।

অতিরিক্ত আশা

কোন বিষয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত সম্পর্কে নিশ্চয়তাবোধসহ আকাঙক্ষা পোষণ করা। অপরপক্ষে, নিশ্চয়তাবোধ পরিত্যাগ করাই হলো এর বিপরীত। অর্থাৎ কোন আশা পোষণের ব্যাপারে 'যদি আল্লাহ্ চাহেন,' 'আল্লাহ্র ইচ্ছায় যদি এমন সম্ভব হয়'— এ ধরনের বাক্য জুড়ে দিতে হবে। এমনকি যদি কেউ তার জীবনের পরবর্তী ঘন্টা বা পরবর্তী দিন সম্পর্কেও এমন ধারণা পোষণ করে যে, আমি অমুক সময় পর্যন্ত বা অমুক দিন পর্যন্ত জীবিত থাকবো, তাহলেই তা নাহক আশা বা অতিরিক্তি আশার পর্যায়ভুক্ত হবে। কারণ, ভবিষ্যতের খবর তার জানা নেই। অথচ সে সেই অনধিকার বিষয়ের সাথেই নিজের আকাঙক্ষাকে জড়িত করলো।

আর যদি সে আকাঙক্ষাকেই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও মরজির উপর নির্ভরশীল রাখা হয়— যেমন যদি বলা হয় যে, ইনশাআল্লাহ্ জীবিত থাকবো। কিংবা আল্লাহ্ জানেন, তিনি হয়তো জীবিত রাখবেন, তাহলে তা উক্ত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর তাহলেই তা আশা থেকে মুক্ত বলে প্রতিপন্ন হবে।

তেমনি যদি পরবর্তী সময় সম্পর্কেও নিশ্চয়তাবোধসহ আকাঙক্ষা পোষণ করা হয়, তাহলে তা অবৈধ আশা বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি তাতে শর্ত লাগানো হয়, তবে তা হবে না।

সুতরাং জীবিত থাকা বা অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা পোষণের ব্যাপারে নিশ্চয়তাবোধকে পরিত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ অন্তরে তেমন ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে অন্তরে অমন নিশ্চয়তাবোধ স্থিতি লাভ না করতে পারে।

আশার দু'টি প্রকার রয়েছে। প্রথমত, সাধারণ মানুষের আশা, দ্বিতীয়ত বিশেষ শ্রেণীর মানুষের বিশেষ আশা।

সাধারণ মানুষের আশা বলতে বেঁচে থাকা এবং দুনিয়া লাভের আকাঙক্ষায় পরিপূর্ণ থাকাকে বোঝায়। এ ধরনের আশা সোজাসুজি গুনাহ্। এসব আশা পরিত্যাগ ব্যতীত এ গুনাহ্ থেকে মুক্তির আর পথ নেই। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ -

আপনি তাদের সৎ–অবস্থার উপর ছেড়ে দিন, তারা খুব খেয়ে নিক এবং উপভোগ করুক এবং কল্পনার সুখস্বপ্ন তাদের বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করুক। অচিরেই তারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারবে। (সূরা হিজর ঃ ৩)

আর বিশেষ শ্রেণীর মানুষের আশা বলতে এমন নেক আমলের ব্যাপারে দীর্ঘায়িত করার আকাঙক্ষা করা, যে আমল পুরো করতে বাধা-বিঘ্ন ও অসুবিধা রয়েছে। অথচ এর মধ্যে নিশ্চিত সংশোধন ও সুস্থতা বিধান বিদ্যমান থাকে না। এজন্য অনেক সময় নেক কাজ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সে স্ব-ইচ্ছার শিকারে পরিণত হয়ে নেক আমলটি আদায় করতে সমর্থ হয় না।

মোটকথা, নামায, রোযা প্রভৃতি নেক আমল শুরু করার সময় মানুষের এমন সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয় যে, সে তা আদায় করবেই। কারণ, সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার— এ সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নেই। কিংবা দৃঢ় নিশ্চয়তার সাথে অমন সংকল্পও করা উচিত নয়। কারণ, অনেক সময় এর দ্বারা তার সংশোধন ও সুষ্ঠুতা বিধান হতে পারে না। বরং এসব বিষয়কে সংশোধনের শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট করা উচিত, যাতে করে আশার দোষ থেকে তা মুক্ত থাকে। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রাসূল (স) কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

وَ لاَ هَوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ -

আপনি কোন কাজ সম্পর্কে এমন কথা বলবেন না যে, কাজটি আগামীকাল সমাধা করবো। বরং তার সাথে আলাহ্র ইচ্ছাকে শামিল করুন।

উলামায়ে কিরাম-এর বর্ণনানুযায়ী উপরিউক্ত আশা ও আকাঙক্ষার বিপরীত হলো নিয়তে মাহমুদা (প্রশংসিত নিয়ত)। এ প্রকার নিয়তেও এক ধরনের আশার অবকাশ রয়েছে। তা সত্ত্বেও নিয়তে মাহ্মুদা রক্ষাকারী ব্যক্তি অবৈধ আশা থেকে দূরে থাকে। এটাই হলো নিয়তে মাহ্মুদার বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এখন জানা দরকার, নিয়তে মাহ্মুদার পরিচয়। উলামায়ে কিরাম বলেছেনঃ কোন একটা কাজ শুরু করার সময় নিশ্চিতবোধের সাথে আকাঙক্ষা করা—-আর সে কাজ সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ করা।

এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শুরুতে নিশ্চয়তাবোধকে কেন জায়েয আর সমাপ্তিতে সমর্পণকে ওয়াজিব করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, কাজ শুরুর নিশ্চয়তাবোধে কোন প্রকার অসুবিধা বা বিঘ্ন আদৌ নেই। যত বাধা ও অসুবিধা, তা হলো কাজ সম্পন্ন করায় এবং সমাপ্তিতে। এতে দুই রকমের অসুবিধা বিদ্যমান। প্রথমত, সে কাজের সমাপ্তি পর্যন্ত পৌছার ব্যাপারে অসুবিধা ও আশঙ্কা, এমন আশঙ্কা বিদ্যমান যে, হয়তো সে পর্যন্ত পৌছতেই সক্ষম হবে না। দ্বিতীয়ত, গোলযোগ ও বিভ্রান্তির আশঙ্কা অর্থাৎ সে কাজে, যথার্থতা বিদ্যমান কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ। সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পণ ও সংকল্পে শর্তারোপ অবশ্য কর্তব্য। যখন এ শর্ত হাসিল হবে, তখন তা নিয়তে মাহ্‌মুদায় পরিগণিত হয়ে অবৈধ আশা থেকে পৃথক বস্তুতে পরিণত হবে। মনে রাখবে, আশা দূর করার উপায় হলো মওতকে স্মরণ করা। তেমনি অন্তর থেকে আশা উৎসাদনের উপায় হলো অকস্মাৎ মৃত্যু আসার চিন্তা করা। সাথে সাথে মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন থাকার পরিণাম সম্পর্কেও ভাবতে হবে।

মোটকথা, উপরিউক্ত সার-সংক্ষেপকে মনে রাখলে এবং তদনুযায়ী আমল করলে অবশ্যই আশার প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। ছোট বলে মনে হলেও এর মধ্যেই অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে। সুতরাং এ মূল্যবান উপদেশটিকে আজই কার্যকরী করতে শুরু করো এবং মানুষের সমালোচনায় নষ্ট করো না।

হিংসা

হিংসা মুসলমান ভ্রাতার এমন কোন নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আকাঙক্ষা করা, যে নিয়ামত সে পাওয়ার যোগ্য এবং যোগ্যতা বিদ্যমান। যদি অপরের বঞ্চিতের কামনা না হয়ে কেবল নিজের জন্য অনুরূপ কামনা করা হয়, তাহলে এটি জায়েয। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِيْهِ اِثْنَيْنِ -

যদি কোন মুসলমান ভ্রাতা থেকে এমন কোন নিয়ামত বিলুপ্তির আকাঙক্ষা করা হয়, যে নিয়ামতের সে যোগ্য বা উপযুক্ত নয়--তবে তা হিংসা নয়--বরং গরিমা। মোটকথা, শেষোক্ত বিষয়টি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হিংসার বিপরীত হলো কল্যাণ

অর্থাৎ নিজের অপর ভ্রাতার জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ামত কামনা এবং নিয়ামত আছে তা অব্যাহত থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা— যে নিয়ামতের সে যোগ্যও।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন্ মানুষের মধ্যে কোন্ নিয়ামত পাওয়ার যোগ্যতা আছে, তা কি করে বুঝতে পারা যাবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তার সাথে হিংসা অথবা তার কল্যাণ কামনা করবো?

এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। কারণ অনেক সময় কোন একজন মানুষের কোন একটা দিক সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা পোষণ করা হয়। যদি বুঝতে পারা যায় যে, অতিরিক্ত ধারণাই সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হিসেবে দাঁড়িয়েছে, তাহলে এমতাবস্থায় সন্দেহের প্রচুর অবকাশ বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় কোন মুসলমানের কোন নিয়ামত-বিলুপ্তি কামনা বা তা অব্যাহত থাকার আকাঙ্ক্ষা করা যাবে না। তবে শর্ত লাগিয়ে তা করা যাবে, যাতে হিংসায় পরিণত না হয় এবং কল্যাণ-কামনার উপকার হাসিল হয়।

হিংসা করা থেকে নিজেকে রক্ষা এবং অপরের কল্যাণ-কামনার মনোভাব জাগ্রত করার উপায় হলোঃ মুসলমানদের প্রতি অপরের সহানুভূতি প্রদর্শনের যে নির্দেশ রয়েছে, তা স্মরণ করা। এর চাইতে আরও উচ্চ পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করার উপায় হলো ঃ মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ পাক যেসব কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা আলোচনা করা এবং এসব পালনের ফলে মু'মিনের যে মর্যাদা ও সম্মান লাভ হয় তা স্মরণ করা এবং স্মরণ করা সে সব উচ্চ মর্যাদা ও মহিমার কথা, যা আখিরাতে মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেসব উপকার ও কল্যাণপ্রসূ বিষয়সমূহের কথাও স্মরণ করতে হবে-- জামায়াত, জুমা প্রভৃতিতে অপর মু'মিনের সাহচর্য ও সহযোগিতায় যা লাভ করা হয় এবং তার থেকে আখিরাতে যে সুপারিশের আশা আছে। এসব বিষয় স্মরণ ও আলোচনা প্রত্যেকটি মুসলমানের কল্যাণ কামনায় আগ্রহী করে তোলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত কোন নিয়ামতের জন্য হিংসার উদ্রেক থেকে করেন মুক্ত।

তাড়াতাড়ি

এটা অন্তরে একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ প্রতিক্রিয়া প্রথমেই মানুষকে বিনা চিন্তা-ভাবনায়ই কাজ করার প্রেরণা যোগায়। এভাবে কাজ শুরু করলে প্রকৃত তাড়াতাড়ি রূপ লাভ করে। অপরপক্ষে এর বিপরীত প্রভাবও রয়েছে। সে

প্রভাবটি অন্তরে চিন্তা-ভাবনাসহ কাজ করায় উদ্বুদ্ধ করে। তাড়াতাড়ি কাজ করলে যেসব ক্ষতির আসংকা ও পরে যে অনুতাপের কারণ দেখা দিতে পারে— তা আলোচনা এবং স্মরণ করলেই এ অভ্যাসটি দূর করা সম্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি না করলে অন্তঃকরণে যে স্থিতি এবং কাজে যে পরিপূর্ণতা আসে, তাও স্মরণ করতে হবে। কারণ তাড়াতাড়ি অভ্যাস বন্ধের ব্যাপারে এ ব্যবস্থাটিও খুবই ফলপ্রসূ।

অহংকার

অন্তঃকরণে নিজেকে উচ্চ এবং বড় ধারণা করা থেকে অহংকারের উদয় হয়। এভাবে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, যা পরে অহংকাররূপে প্রকাশ পায়। নিজেকে দুর্বল, অসহায়— নিজেকে তুচ্ছ ও ছোট মনে করার ফলে সৃষ্টি হয় বিনীত স্বভাব। এগুলোর প্রত্যেকটিই দুই প্রকারের। যেমন সাধারণ বিনয়— বিশেষ বিনয়; তেমনি সাধারণ অহংকার ও বিশেষ অহংকার। সাধারণ বিনয় হলো পোশাক-পরিচ্ছদ, থাকা-খাওয়া এবং যানবাহনের ব্যাপারে অল্পে তুষ্ট থাকা। অপরপক্ষে, এর বিপরীত হলো সাধারণ অহংকার অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যাপারেই অধিক উপরে উঠে যাওয়া এবং অধিক কিছুর আকাঙ্ক্ষা করা।

বিশেষ বিনয় হলো, সত্য গ্রহণে অগ্রসর হওয়া— তা সে ব্যক্তি যত উঁচু পর্যায়ের হোক আর নিম্ন পর্যায়েরই হোক। আর বিশেষ অহংকার হলো সত্য থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বে মনে করা বা তা এড়িয়ে যাওয়া। এটা মস্তবড় গুনাহ্, মারাত্মক গুনাহ্।

সাধারণ বিনয় রক্ষা করার উপায় হলো ঃ নিজের জীবনের শুরু ও শেষ সম্পর্কে আলোচনা এবং তা স্মরণ করা। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করা সেসব অবস্থার কথা, যা মানুষকে পংকিলতা ও বিপদাপদে পতিত করে। কেউ কেউ বলেছেন ঃ মানুষের জীবনের শুরু হয় এক বিন্দু বীর্য থেকে আর শেষ হয় মরা লাশ এবং দুর্গন্ধময় শরীররূপে। আর তুমি এই দুইয়ের মাঝখানে নিমজ্জিত— পংকিলতা ও আবর্জনায়।

বিশেষ বিনয় রক্ষার উপায় হলো ঃ সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণাম এবং ভুল ও বাতিল গ্রহণ এবং বাতিল পথে চলার দরুন শাস্তির আলোচনা করা।

মোটকথা, বুদ্ধিমান ও বিবেকবানদের উপরিউক্ত আলোচনা যথেষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ্ সকলকে তৌফিক দান করুন।

পঞ্চম সোপান

পেট ও তার হেফাজত

এরপর ইবাদতকামীর জন্য পেটের হেফাজত এবং পেটকে পবিত্র করা দরকার। ইবাদতকারীর জন্য এ অঙ্গটির সংশোধন অন্যান্য অঙ্গের সংশোধনের চাইতে অসুবিধাজনক এবং দুষ্কর। তেমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এটির কর্মও ব্যাপক। সে জন্য এর অপবিত্রতা যেমন ক্ষতির দিক থেকে ব্যাপক তেমনি তা মারাত্মকও। কারণ, এ অঙ্গটিই সবকিছুর খনি এবং ভিত্তি। এর সাথেই সকল অঙ্গের সম্পর্ক। শক্তি ও দুর্বলতা এবং পবিত্রতা ও উচ্ছৃংখলতার দিক বিবেচনায় প্রথমেই পেটকে হারাম ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে রক্ষা করা কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, যদি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার হিম্মত হয়, তবে পেটকে অপ্রয়োজনীয় হালাল থেকেও রক্ষা করা জরুরী।

হারাম ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে পেটকে রক্ষা করার তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবার জন্য। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْ كُلُوْنَ بُطُوْنَهُمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا –

যারা জুলুম করে ইয়াতিমের সম্পদ খায়, তারা নিশ্চিতই নিজের পেটের মধ্যে আগুন পুরে দেয়– অতি শীঘ্রই সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

(সূরা নিসাঃ ১০)

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَلِنَّارِ اَوْ لٰى بِهٖ –

হারামে পরিপুষ্ট গোশ্ত (শরীর) দোযখের আগুনেরই যোগ্য।

দ্বিতীয়ত, হারাম ও সন্দেহজনক উপায়ে অর্জিত অর্থ ও হারাম বিষয়-সম্পত্তি ভোগকারী মরদূদ (অভিশপ্ত)। এ ধরনের ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ্‌র ইবাদতের তৌফিক হয় না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য তার পক্ষেই সম্ভব, যে ব্যক্তির সবকিছু স্বচ্ছ ও পবিত্র। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কি অপবিত্র ও নাপাক ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ এবং ওযূহীন ব্যক্তিকে কুরআনুল করীম স্পর্শ করতে নিষেধ করেন নি? আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا-

নাপাক অবস্থায় প্রবেশ করো না (তবে পথ অতিক্রমের জন্য হলে, তাতে কোন ক্ষতি নেই) যতক্ষণ না গোসল করো। (সূরা নিসা ঃ ৪৩)

আরও বলেছেন ঃ

لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ -

এ পবিত্র কালাম পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করবে না।

(সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৭৯)

অথচ অপবিত্র ও নাপাক অবস্থা— উভয় বিষয়ই স্বাভাবিক। সুতরাং যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ ও সন্দেহজনক হারামের পংকিলতায় নিমজ্জিত সে ব্যক্তির জন্য কি করে অনুমতি হতে পারে? এ ধরনের মানুষ কি করে আল্লাহ্ তা'আলার খেদমত করতে সক্ষম হবে ? তার জন্য আল্লাহ্‌র যিকিরে অনুমতিও কিছুতেই সম্ভব নয়। মোটকথা, এ ধরনের ব্যক্তির জন্য এমন কোন মর্যাদা অর্জনই সম্ভব নয়। ইয়াহিয়া ইবনে মাআয রাযী (র) বলেছেন ঃ নেক কাজ ও ইবাদত আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে তালাবদ্ধ— এ তালার চাবি হলো দোয়া। এ চাবির কাঁটা (দাঁত)-এর চিহ্ন হলো হালাল বিষয়সমূহ। সুতরাং যখন চাবির দাঁতই থাকবে না, তখন ভাণ্ডারের তালা খুলবে কিসের দ্বারা? আর নেক কাজ এবং ইবাদতই বা হাসিল করবে কোথা থেকে ?

তৃতীয়ত, হারাম ও সন্দেহজনক খাদ্য ভক্ষণকারী নেক কাজ থেকে বঞ্চিত। যদি কোনক্রমে নেক কাজের তৌফিক হাসিল হয়ও— তথাপি সে মরদূদ। সুতরাং তা কবূল হয় না। এমতাবস্থায় তার দ্বারা বিদ্রোহ, রূঢ়তা এবং সময় কাটানো ব্যতীত আর কিছুই হাসিল হবে না।

হুযূর আকরাম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

كَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مَنْ قِيَامِهِ اِلاَّ السُّهُوْرُ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الْجُوْعُ وَالظَّمَاءُ -

এমন বহু দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত গোযরানকারী আছে, যাদের রাতে (নামাযে) দণ্ডায়মান থাকায় ঘুম কামাই ব্যতীত আর কিছুই হয় না। তেমনি এমনও বহু রোযাদার আছে, যাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই অর্জন হয় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তির ইবাদত কবূল করেন না, যার পেটে হারাম মাল রয়েছে।

সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনাসহ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

অধিক খাদ্য গ্রহণে দশটি অসুবিধার উদ্ভব হয়

প্রয়োজনাতিরিক্ত হালাল অর্থাৎ অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ ইবাদতগোযার ব্যক্তিদের জন্য বিপদস্বরূপ এবং আল্লাহ্র পথের অভিযাত্রীদের জন্য পরীক্ষার মকাম। বহু চিন্তা-ভাবনার পর অধিক খাদ্য গ্রহণের ফলে দশটি বিপদ ও অসুবিধার সৃষ্টি হয় বলে আমার নিকট ধরা পড়েছে।

প্রথম বিপদ এই যে, অধিক খাদ্য গ্রহণে অন্তঃকরণ শ্রান্ত এবং অন্তরের প্রভা বিলুপ্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لاَتُمِيْتُوا الْقَلْبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَاِنَّ الْقَلْبَ لَيَمُوْتُ كَالزَّرْعِ اِذَا كَثُرَ الْمَاءُ -

অতিরিক্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে অন্তরকে ভারী করো না। কারণ, তাতে অন্তর মরে যায়, যেমন অতিরিক্ত পানির জন্য শস্য মরে যায়।

অনেক সালেহীন এ বিষয়টি সম্পর্কে অন্যভাবে উপমা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ পাকস্থলী অন্তঃকরণের নিচে এমন একটি হাঁড়ির ন্যায়, যার মধ্যে খাদ্য ও পানি উথলে উঠছে এবং এর থেকে উত্থিত বাষ্প অন্তঃকরণের দিকে

যাচ্ছে। সুতরাং অতিরিক্ত বাষ্প ওদিকে উঠলে অন্তঃকরণকে ময়লাযুক্ত এবং বিষাক্ত করে তুলবে।

দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ফিতনায় নিপতিত এবং প্রয়োজনীয় এবং ফাসিক কার্যের প্রতি অগ্রসর করা হয়। কারণ, মানুষ যখন আরাম পায় এবং নেশাগ্রস্ত হয়, তখন তার দৃষ্টি হারাম বিষয়সমূহের অপ্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হবে; তার কান তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হবে— তার জবান তা বলার জন্য হবে উদগ্রীব এবং গুপ্তাঙ্গ আসক্তি পূরণের জন্য বেকারার হবে এবং পা সেদিকে অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। আর যদি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে, তাহলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিশ্চুপ এবং নির্জীব হয়ে পড়ে থাকবে। ফলে, উপরিউক্ত বিষয়ের কোন একটি বিষয়ই কোন অঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করবে না। সেদিকে সে অগ্রসরও হবে না।

ওস্তাদ আবূ জাফর (র) বলেছেন ঃ পেট এমন একটি অঙ্গ যে, এটা যদি ক্ষুধার্ত থাকে, তাহলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আরামে থাকে অর্থাৎ নির্লিপ্ত থাকে— তখন কোন অঙ্গই কোন কিছু প্রত্যাশা করে না। আর যদি এ অঙ্গটি স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম (ভরা) পায়, তাহলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে।

পরিষ্কার কথা এই যে, মানুষের সকল কর্ম ও কথা খাওয়া ও পান করার উপর নির্ভরশীল। পেটে যদি হারাম ঢুকানো হয়, তাহলে কর্ম ও কথায় তাই বের হবে। যদি পেটে বাজে ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস ঢুকানো হয়, তবে কথায় ও কাজে তাই বের হবে। মোটকথা পেটে যা দেয়া হয় অর্থাৎ যা কিছু খাওয়া হয়, তা হলো কথা ও কাজের বীজের ন্যায়।

তৃতীয় বিপদ এই যে, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণে বিবেক ও বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়।

দারানী (র) বলেছেন ঃ যখন দুনিয়া কিংবা আখিরাত সংশ্লিষ্ট কোন দরকারী ও প্রয়োজনীয় কিছু করতে চাও, তখন তা পূরণ বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করো না। কারণ, খাদ্য গ্রহণ করার ফলে বুদ্ধিতে পরিবর্তন সাধিত হয়। বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যে কেউ পরীক্ষা করলে এটার প্রমাণ পেতে পারেন।

চতুর্থ বিপদ এই যে, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে ইবাদত হ্রাস পায়। কারণ, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করলে মানুষের শরীর ভারী, চোখের পাতায় ঘুম আর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলে হয়ে আসে। এমতাবস্থায় শয়ন ব্যতীত তার পক্ষে

আর কিছুই করা সম্ভব হয় না— সে যত চেষ্টাই করুক না কেন, তখন তার অবস্থা একটি শবদেহের ন্যায়ই হয়ে পড়ে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, অতিরিক্ত খাওয়ার অর্থ নিজেকে অকেজো করে তোলা।

হযরত ইয়াহিয়া (আ) থেকে বর্ণিত—একদিন তাঁর সামনে শয়তান এসে হাযির হলো। শয়তানের হাতে কিছু সংখ্যক বাঁশের ফলা ছিল। হযরত ইয়াহিয়া (আ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার হাতে এগুলো কি ? সে জবাব দিল ঃ এগুলো আকাঙ্ক্ষা ও কামনার জিনিস— এর দ্বারা আমি মানুষকে শিকার করে থাকি হযরত ইয়াহিয়া (আ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর মধ্যে আমার জন্যও কিছু আছে না কি? শয়তান বললঃ না, নেই। তবে এক রাতে আপনার পেট খুব ভরা ছিল। আমি আপনাকে নামাযে ক্লান্ত করে দিয়েছিলাম। একথা শুনে হযরত ইয়াহিয়া (আ) বললেনঃ আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আজ থেকে আর কোনদিন পেট পুরে খাদ্য গ্রহণ করব না। শয়তান বলল ঃ আজ থেকে আমিও আর কাউকে এ তথ্য জানাবো না।

ভেবে দেখুন ! হযরত ইয়াহিয়া (আ)-এর ন্যায় ব্যক্তিও সারা জীবনে একদিন মাত্র রাতে পেট পুরে খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন বলে যখন এমন হয়েছিল, তখন যারা জীবনে এক রাতও ক্ষুধার্ত থাকে না তাদের অবস্থা কি হতে পারে ? এরপরে আর ইবাদত করার অবকাশ থাকে কোথায়?

সুফিয়ান (র) বলেছেন ঃ ইবাদত এমন একটি পেশা, যার সরঞ্জাম হলো নির্জনতা ও ক্ষুধার্ত থাকা।

পঞ্চমত, অতিরিক্তি খাদ্য গ্রহণ করলে ইবাদতের মজা ও আনন্দ বিনষ্ট হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) বলেছেনঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমি কখনো পরিতৃপ্ত হয়ে খাদ্য গ্রহণ করিনি— যাতে করে আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধুরতা অনুভব করতে সক্ষম হই। তেমনি পরওয়ারদিগারের মোলাকাতের আকাঙ্ক্ষায় ইসলাম গ্রহণের পর কখনো আমি তৃপ্তির সাথে পানি পান করিনি।

এই-ই ছিল ঐশী-প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অবস্থা। হযরত আবূ বকর (রা) ঐশী-প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

contents

مَا فَضَلَكُمْ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) بِفَضْلِ صَوْمٍ وصَلٰوةٍ و اِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَرَّ فِى نَفْسِهٖ -

তোমাদের মধ্যে আবূ বকর (রা)-এর ফযীলত নামায ও রোযার আধিক্যের জন্যই নয়, বরং তা অন্য একটি জিনিস, যা তার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

দারানী (র) বলেছেন ঃ ইবাদতের অধিকতর স্বাদ ও মধুরতা তখনই অধিক অনুভূত হওয়া সম্ভব, যখন কারো পেট পিঠের সাথে লেগে যাবে।

ষষ্ঠত, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস শেষ পর্যন্ত মানুষকে হারাম ও সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত করে দিতে পারে। কারণ, হালাল পথে নিতান্ত প্রয়োজনীয় যা, তাই লাভ হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ -

اِنَّ الْحَلَالَ لَايَاْتِيْكَ اِلاَّ قُوْتًا وَ الْحَرَامُ يَاْتِيْكَا جُرُ فًا جُزُفًا-

হালালের দ্বারা তো তোমার কেবল নিতান্ত জরুরী বিষয়ই অর্জিত হবে; কিন্তু হারামে অর্জিত হবে বেশুমার— অগণ্য।

সপ্তম বিষয় এই যে, অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ মানুষের শরীর ও মনকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকম কাজে বা চিন্তায় লিপ্ত রাখে। প্রথমত, সে খাদ্য উপার্জন করা; দ্বিতীয়ত, প্রস্তুত করা। তৃতীয়ত, খাওয়া; চতুর্থত, খাওয়া থেকে অবসর হওয়া; পঞ্চমত, অখাদ্য থেকে নিরাপদ থাকা অর্থাৎ তাতে যেন আপদ উপস্থিত না হয়। মোটকথা, দুনিয়ার সকল ঝামেলা ও ঝঞ্ঝাট এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

সকল রোগের উৎস হলো বদহজমী, আর সকল ঔষধের ভিত্তি হলো ক্ষুধা ও অল্প খাওয়া।

মালিক ইবনে দিনার থেকে বর্ণিত— তিনি বলতেন ঃ হে লোক সকল! আমার বারবার পায়খানা যাওয়ার দরকার হয়। এমনকি, অতিরিক্ত খাওয়ার দরুন আমার পরওয়ারদিগারের জন্য লজ্জা হতে লাগলো। আহা! যদি আল্লাহ্

পাক আমায় আহার্য একটিমাত্র পুটলীতেই নির্দিষ্ট করে দিতেন, তাহলে কেবল সেটাই আমি শুষতে থাকতাম এবং আমৃত্যু সেটা শুষেই জীবন কাটাতাম।

তাছাড়া অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের দরুন মানুষের মনে দুনিয়ার প্রতি লোভ ও আসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সময়ের যথেষ্ট অপচয় হয়।

অষ্টম বিষয় এই যে, উপরিউক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরকালে ক্লেশ এবং মৃত্যুর সময় দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ায় আস্বাদ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যু-যন্ত্রণা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি যত বেশি দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করিবে, মৃত্যু-যন্ত্রণা তার তত বেশি হবে।

নবম বিষয় এই যে, আখিরাতে সওয়াব হ্রাস পাবে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَا تِكُمْ فِىْ حَيَا تِكُمُ الدُّ نْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الاَرْضِ

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ -

দুনিয়ায় তোমরা তোমাদের জীবনে স্বাদ হাসিল করে নিয়েছ এবং যথেষ্ট উপভোগ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদের সে স্বাদের শাস্তি দান করা হবে এ জন্য যে, তোমরা নাফরমানী করতে। (সূরা আহকাফ ঃ ২০)

দুনিয়ার স্বাদের পরিমাণে আখিরাতের স্বাদ কম করে দেয়া হবে। এ জন্যই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন দুনিয়াকে আমাদের নবীয়ে করীম (সা)-এর সামনে পেশ করেছিলেন, তখন বলছিলেন যে, তোমার আখিরাতের মধ্য থেকে কোন জিনিসই কম করা হবে না। এটা ছিল তাঁর জন্যই খাস। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, অপর ব্যক্তিদের ব্যাপারে তা অবশ্যই করা হবে। অবশ্য যদি আল্লাহ্ পাক কারো প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, সেটা আলাদা কথা।

বর্ণিত আছে, খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে দাওয়াত করেছিলেন। তাঁর জন্য যে আহার্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা দেখে হযরত উমর ফারূক (রা) বললেন ঃ এত সব কিছু আমাদের জন্যই প্রস্তুত হয়েছে ? কিন্তু গরীব মুহাজিরীন, যাঁরা ইন্তেকাল করে গেছেন, তাঁদের জন্য কি ছিল—

তাঁদের তো সামান্য শুকনো রুটি পর্যন্ত জুটেনি। হযরত খালিদ (রা) জবাবে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন ! তাঁদের জন্য তো জান্নাতই নির্দিষ্ট রয়েছে। হযরত উমর (রা) পুনরায় বললেন ঃ তাঁরা তো জান্নাতই লাভ করেছেন— কিন্তু আমাদের এ দুনিয়ায় এতটুকু মিলছে— সুতরাং তাঁরাই তো আমাদের চাইতে অগ্রগামী হয়ে গেছেন।

আরও বর্ণিত আছে, একদিন হযরত উমর (রা)-এর খুব তৃষ্ণা বোধ হলে তিনি পানি চাইলেন। এক ব্যক্তি একটি পাত্রে খানিক পানি এনে উপস্থিত করলেন। সে পানিতে খানিকটা খেজুরের রস মিশ্রিত ছিল। হযরত উমর (রা) পানির পাতটি মুখে লাগালে তা মিষ্টি এবং ঠাণ্ডা অনুভূত হলো। ফলে, তিনি পানি পান করা থেকে বিরত হলেন এবং বললেন ঃ ব্যাপার কি? সেই ব্যক্তি আরয করলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমীরুল মু'মিনীন ! পানিতে আমি তেমন কোন মিষ্টি দ্রব্য মিশাইনি।

হযরত উমর (রা) বললেন ঃ এই মিষ্টতাই আমাকে পানি পান করা হতে বিরত করেছে। চুপ করো। যদি আখিরাত বলে কোন কিছু না থাকতো, তাহলে আমি তোমার এই আরাম-আয়েশে যোগ দিতাম।

দশম বিষয়, অপ্রয়োজনীয় হালালে লিপ্ত হলে তাতেও হিসেব-নিকেশ এবং লাঞ্ছনার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া এভাবে আদব পরিত্যাগ ও কামনাকে লাগামহীন করা হয়। কারণ, দুনিয়ায় যা কিছুই হালাল আছে তারও একটা হিসেব দিতে হবে— অপরপক্ষে যা কিছু হারাম, তাতে লিপ্ত হলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তেমনি হারামের যে চাকচিক্য তাই-ই মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মোটকথা, অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় খাওয়ার দশটি বিপদ বর্ণনা করা হলো। বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষের জন্য এই-ই যথেষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

যারা আল্লাহ্র ইবাদত করার প্রয়াসী এবং তাঁর পথের অভিযাত্রী, তাদের রুজি-রোজগার ও জীবন যাপন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়েই সতর্কতা অবলম্বন করে চলা দরকার, যাতে কিছুতেই হারাম অথবা সন্দেহজনক কোন কিছুতে সে লিপ্ত না হয়ে পড়ে। কারণ, এর পরিণাম ভয়াবহ শাস্তি। তারপর তাকে হালাল

বিষয়েও ততটুকুকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে, যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যার দ্বারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করার মতো শক্তি অর্জন হয় মাত্র। এর বাইরে কিছুতেই অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। কারণ তাতে কেবলমাত্র বিব্রত অবস্থা ও পেরেশানীতে পতিত হওয়া ছাড়া আর কোন কিছুই অর্জন হবে না।

হারাম ও সন্দেহজনক বিষয়ের পরিচয়

এখন হারাম ও সন্দেহজনক বিষয়ের পরিচয় নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। কারণ, এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা অতি প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে 'ইয়াহইয়াউল উলুমুদ্দীন'-এ আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এখানে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে অতি কম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও যাতে করে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন, তজ্জন্য খানিকটা আলোচনা করছি। কারণ, এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র ইবাদত প্রয়াসী ও আল্লাহ্‌র পথের অভিযাত্রীদের যাতে খানিকটা উপকার হয়, তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করা।

অনেক আলিম বলেছেনঃ যে জিনিস বা বিষয় অপরের অধিকারভুক্ত এবং শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ বলে তুমি নিশ্চিত জানতে পারবে, তোমার জন্য তার সবকিছুই হারাম। আর যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারা না যায়, বরং যদি তা কেবল বেশির ভাগ ধারণাপ্রসূত হয়, তাহলে তা পরিগণিত হবে সন্দেহজনক বস্তু বা বিষয়ে। আবার কতক আলিম বলেন যে, নিশ্চিত বিশ্বাস হোক, আর বেশির ভাগ ধারণা হোক, তা সরাসরি হারামের মধ্যেই পরিগণিত হবে। তাঁরা বলেন, উভয় অবস্থায়ই তা সরাসরি হারাম। কারণ, বেশির ভাগ ধারণা বহু আহ্‌কামের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস এবং জ্ঞানের (জানার পর্যায়ে) স্থলাভিষিক্ত বলেই ধরা হয়। আর যখন হালাল কি হারাম, তা বোঝা যায় না এবং হালাল ও হারাম— উভয়টিই সমান হয়, কোনটার উপরই কোনটাকে অগ্রাধিকার দেয়া যায় না, সেক্ষেত্রে সে বিষয় বা বস্তুকে সন্দেহজনক বলতে হবে। কারণ, সে বিষয় বা বস্তুর হালালের মধ্যেও হারাম হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। সুতরাং ঐ হালালটুকুও সন্দেহজনক পর্যায়ে পরিগণিত।

মনে রাখতে হবে, যা হারাম, তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা ওয়াজিব এবং ফরয। আর সন্দেহজনক জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করা হলো তাক্ওয়া। আলিমদের এ অভিমতটিই আমার নিকট পছন্দীয়।

অত্যাচারী শাসকের উপঢৌকন

বর্তমান যুগে[১] শাসনকর্তা ও সুলতানের নিকট থেকে তোহ্ফা বা উপঢৌকন গ্রহণ করা যায় কি না, এ বিষয়টিও আলোচনা করা দরকার। এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

একদল আলিম বলেন ঃ যে বস্তু সম্পর্কে এ কথা নিশ্চিতভাবে জানা না যাবে যে, তা হারাম, সেই বস্তু গ্রহণ করা জায়েয আবার অন্য একদল আলিম বলেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তুর হালাল হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ, বর্তমান যুগের শাসক ও সুলতানদের মালের অধিকাংশই যে হারাম, তাতে সন্দেহ নেই। বরং তাদের মালে হালাল খুবই কম— এমনকি নেই বললেও চলে।

আলিমদের অন্য এক দল বলেন ঃ সুলতান এবং আমীরদের উপঢৌকন উপহার ধনী-গরীব সকলেই গ্রহণ করতে পারে— যতক্ষণ পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, প্রদত্ত বস্তুটি হারাম। এ ক্ষেত্রে যদি গুনাহ্ বা অন্য কিছু হয়, তবে তা হবে দাতার— গ্রহণকারীর এ ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ্ মকুকাসের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি ইহুদীদের নিকট থেকে ঋণও গ্রহণ করেছেন অথচ ইহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ফয়সালাই জানিয়ে দিয়েছেন যে ঃ

اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ -

এরা বড্ড হারামখোর। (সূরা মায়িদা ঃ ৪২)

তাছাড়া, সাহাবায়ে কিরামদের অনেকেই ফিতনার যামানায় জীবিত ছিলেন। তাঁরাও এ ধরনের আমীরদের নিকট থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন। এ সকল সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত ইবনে উমর (রা)-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

আলিমদের অপর একটি দল বলেন ঃ কোন অবস্থাতেই কারো জন্যই (এ ধরনের অত্যাচারী বাদশাহ্, সুলতান ও আমীরদের উপঢৌকন) তা হালাল নয়— তা সে গ্রহণকারী ধনী হোক আর গরীব হোক— যদি সে সুলতান বা আমীর

১. ইমাম গাযালী (র)-র যুগে।

জালিম হয় এবং তার সম্পদের অধিকাংশই হয় জুলুম এবং হারামের। কারণ, অধিকাংশ ও অধিকের উপরই হুকুম বর্তে। সুতরাং তাদের সম্পদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা জরুরী এবং ওয়াজিব। আর একদল বলেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত মালের হারাম হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মাল গরীবের জন্য হালাল— আর ধনীর জন্য এক্ষেত্রেও হালাল নয়। যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এ মাল সরাসরি আত্মসাতের বা জোর-দখল করা, তাহলে এমতাবস্থায় তা গরীবের জন্যও গ্রহণ করার অনুমতি নেই। তবে হ্যাঁ, মালের প্রকৃত মালিককে তা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তা নিতে পারে।

গরীবের জন্য বাদশাহ্‌দের মাল নেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। কারণ, সে মাল যদি বাদশাহ্‌রই মালিকানাধীন হয় এবং পরে তা গরীবকে দান করা হয়, তাহলে গরীব তা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারে। আর যদি সে মাল যুদ্ধলব্ধ, রাজস্ব অথবা ওশরের মাল হয়, তথাপিও তাতে গরীবের হক রয়েছে।

হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করে এবং প্রকাশ্যে কুরআন শরীফ পাঠ করে, মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে বছরে সে দুইশত দিরহাম পাওয়ার অধিকারী। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন— দু'শো' স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) পাওয়ার অধিকারী। তিনি আরো বলেছেনঃ যদি সে এ দুনিয়ায় তা না পায়, তবে আখিরাতে সে তা অবশ্যই পাবে। মোটকথা, এ ক্ষেত্রে গরীব আলিম ও ফকীর উভয়েই তাদের অংশগ্রহণ করতে পারে।

আলিমগণ বলেছেনঃ যখন মাল কেড়ে নেয়া মালের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং তা পৃথক করার কোন উপায় থাকে না কিংবা এমন জবর-দখল করা মাল যার মালিক অথবা তার বংশধর কেউই বর্তমান থাকে না, তদবস্থায় সে মাল ফিরিয়ে দেয়া অসুবিধাজনক। এমতাবস্থায় বাদশাহ্‌র পক্ষে সে মাল সাদকা করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের মাল ফকীরকে সাদকা করার হুকুম দেন না আর ফকীরকেও এ মাল গ্রহণে নিষেধ করেন। অথবা ফকীরকে যদি সেই মাল গ্রহণের অনুমতি দান করেনও, তথাপি ফকীরের জন্য নির্দিষ্ট জবর-দখল করা মাল ও হারাম মাল বাদ দিয়ে অন্য মাল গ্রহণ করা সঙ্গত। হারাম মাল ও জবর-দখল করা নির্দিষ্ট মাল কোন অবস্থাতেই তার পক্ষে গ্রহণ জায়েয নয়।

মোটকথা, এ ধরনের মাস'আলা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত ফতোয়া দেয়া খুবই মুশকিল।

এ ব্যাপারে যদি অধিকতর জানবার ইচ্ছা হয়, তাহলে মৎপ্রণীত 'ইয়াহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন'-এর 'হালাল ও হারাম' অধ্যায়টি অধ্যয়ন করুন। ইনশাআল্লাহ্, সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন।

ব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধবের উপঢৌকন

বাজারের লোক, ব্যবসায়ী ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট হতে উপহার ও উপঢৌকন গ্রহণ সম্পর্কে কোন বাধা-নিষেধ আছে কিনা, এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। কারণ এ ধরনের লোক অধিকাংশই অসতর্ক (হালাল-হারামের ব্যাপারে) বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

মানুষের বাহ্য অবস্থা ও আচরণে যদি সততা ও অপংকিলতার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে তার উপহার-উপঢৌকন এবং সাদকা-খয়রাত গ্রহণ করায় কোন ক্ষতি নেই। বরং এমতাবস্থায় সময়-কাল খারাপ হয়ে গেছে— কাউকেই বিশ্বাস বা নির্ভর করা যায় না— একথা বলে প্রমাণ চাওয়া ঠিক নয়। কারণ এতে একজন মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হয়। অথচ এ ব্যাপারে মৌলিক দু'টি নীতির বিষয় ভালভাবে জানা থাকা উচিত। এখন তাই আলোচনা করা যাক।

মোটকথা, উপরে উল্লিখিত সকল অবস্থার জন্য দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমত, শরীয়ত এবং তার প্রকাশ্য হুকুম, আর দ্বিতীয়ত তাকওয়া এবং তার দাবি।

শরীয়তের হুকুম এই যে, কোন ব্যক্তি তোমার নিকট কোন বস্তু নিয়ে এসে হাযির হলো— তুমি বাহ্যত দেখলে যে, বস্তুটি গ্রহণের অনুপযুক্ত নয় (অর্থাৎ হারাম বা সন্দেহজনক কিছু নয়) এবং তাতে সততার চিহ্ন বিদ্যমান, তাহলে তোমার তা গ্রহণ করা উচিত। তবে হ্যাঁ, যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারো যে, হুবহু বস্তুটি জবর-দখলের অথবা হারাম, এমতাবস্থায় সে মাল গ্রহণ করার অনুমতি নেই।

অপরপক্ষে, তাকওয়ার নির্দেশ হলো ঃ করো নিকট থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করো না, যতক্ষণ সে জিনিস সম্পর্কে সকল দিক থেকে সবকিছু জেনে না নাও

এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস না জন্মে যে, এ জিনিসের মধ্যে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নেই। নতুবা সে মাল ফিরিয়ে দেয়া উচিত।

হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর এক গোলাম তাঁর খেদমতে দুধ নিয়ে হাযির হলো। তিনি দুধটুকু পান করলেন। গোলাম আরয করলো ঃ আমি আপনার খেদমতে যখনই কোন জিনিস নিয়ে আসি, আপনি সে জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকেন। কিন্তু আজ এ দুধ সম্পর্কে তো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তখন হযরত আবূ বকর (রা) দুধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। গোলাম জানালো, জাহিলিয়াতের (ইসলাম-পূর্ব) যুগে আমি একটি গোত্রের ঝাড়-ফুঁকের কাজ করেছিলাম। তারই জন্য তারা আমাকে এ দুধ দিয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা) একথা শুনে তখনই বমি করে দুধ বের করে ফেললেন এবং বললেন ঃ হায় আল্লাহ্ ! আমার নসীবে এই-ই ছিল।

এরপর সে দুধের কোন প্রভাব তাঁর শরীরে আর অবশিষ্ট রইলো না। তিনি নিশ্চিত বোধ করলেন।

মোটকথা, এ ঘটনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য কোন বস্তু গ্রহণের আগে সে বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও তার সবদিক জেনে নেয়া ওয়াজিব ও জরুরী। সুতরাং তোমার যদি তাকওয়া এবং তাকওয়ার দাবি সম্পর্কে সচেতনতা থাকে, তাহলে এ নীতি অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, উপরিউক্ত ক্ষেত্রে তাকওয়ার নীতি তো শরীয়তের পরিপন্থী হয়ে যাচ্ছে (কারণ শরীয়ত বলছে) জিজ্ঞাসাবাদ করে মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা প্রকাশ করো না— আর তাকওয়া বলছে ঃ জিজ্ঞাসাবাদ করে নেয়া ওয়াজিব ও জরুরী। এর জবাবে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার যে, শরীয়তের ভিত্তি হচ্ছে সহজ ও সারল্যের উপর। এ জন্যই নবী আকরাম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি সহজ মিল্লাতসহ প্রেরিত হয়েছি। অপরপক্ষে, তাকওয়ার ভিত্তি হচ্ছে কঠোরতা ও সতর্কতার উপর। যেমন বলা হয়েছে যে, মুত্তাকীদের জন্য অসংখ্য কঠিন ব্যাপার বিদ্যমান।

আবার তাকওয়াই শরীয়ত। মূলের দিক দিয়ে তাকওয়া ও শরীয়ত একই। তবে শরীয়তে দুই রকম আহকাম বিদ্যমান। একটি জায়েয পদ্ধতি, অপরটি উত্তম ও সতর্কতা-সিদ্ধ পদ্ধতি। সুতরাং জায়েয পর্যায়ের পদ্ধতিকে শরীয়তের

নির্দেশ এবং উত্তম ও সতর্কতা-সিদ্ধ পর্যায়ের পদ্ধতিকে তাকওয়ার নির্দেশ বলা যেতে পারে। অতএব, এ উভয় পদ্ধতিই স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও মূলের দিক থেকে একই।

উপরিউক্ত আলোচনার পর যদি বলা হয় যে, যে বস্তু বা মালে সামান্যতমও দোষ-ক্রুটি থাকার আশঙ্কা রয়েছে, সে বস্তু বা মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধান করা জায়েয, তাহলে বর্তমান যুগে আর কোন্ মালই বা এমনিতে গ্রহণ করা চলবে? তদুপরি তাকওয়াপন্থীদের জন্য তো প্রথম পর্যায়েই বিপদ্ ও সঙ্কট নেমে আসবে। কারণ, যথাসম্ভব আল্লাহ্র পথে থেকে নেকী অর্জনই তো তাকওয়াপন্থীদের কাম্য।

মনে রাখতে হবে যে, তাকওয়ার ব্যাপারটি খুব সোজা ব্যাপার নয়— এটা অতি কঠিন বিষয়। এ পথে যিনি চলতে চান, এসব কঠিন জীবন ও বিপদাপদ বরদাশ্ত করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য। কারণ তা না হলে এ পথে পূর্ণতা অর্জন কখনো সম্ভব নয়।

এ জন্যই মুত্তাকী ও বুযুর্গ পাহাড় ও জনমানবহীন স্থানে চলে গেছেন। তাঁরা ঘাস, গাছের পাতা ও জঙ্গলের ফল-মূলকেই জীবন ধারণের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ, এসব জিনিসের হালাল হওয়া সম্পর্কে সামান্যতমও সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তাকওয়ার ন্যায় এমন উচ্চ মর্যাদা হাসিল করতে চান, তাঁকে তা অর্জনের জন্য অবশ্যই এসব বিপদাপদ ও কঠিন জীবন বরদাশ্ত করা, তাতে ধৈর্য ধারণ এবং এই সকল মহৎ ব্যক্তিদের পদাংক অনুসরণ করতে হবে। আর যদি তিনি মানুষের মধ্যেই বসত করেন এবং তাদের অর্জিত বস্তু খান, তাহলে তাঁকে মৃত ব্যক্তির ন্যায় হয়েই থাকতে হবে অর্থাৎ নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত কোন দিকে সামান্যও পদক্ষেপ করবেন না। তাছাড়া, কেবল ততটুকুই গ্রহণ করবেন, যার দ্বারা আল্লাহ্র ইবাদত ও নেক কাজ করার শক্তি বজায় থাকে। এ ক্ষেত্রেও বিষয়টি একটি ওযর হিসেবে গণ্য হবে। যদি গৃহীত বস্তু বা মালে সন্দেহও থাকে, তথাপি ওযরের এ পর্যায়ে তা কোন ক্ষতির কারণ হবে না। কারণ আল্লাহ্ পাক ওযরকে যথেষ্ট কবূল করেন।

এ জন্যই হাসান বসরী (র) বলেছেনঃ বাজারের কুপ্রভাব ও পংকিলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করো। আর নিতান্ত প্রয়োজনীয়কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে থাকো অর্থাৎ তার বাইরে একটুও অগ্রসর হয়ো না।

আমি বিশেষভাবে জানতে পেরেছি, ওয়াহাব ইবনে দারদ (র) একদিন-দুইদিন— এমনকি, উপর্যুপরি তিনদিন পর্যন্ত উপোস করার পর মাত্র একটি রুটি হাতে নিতেন এবং বলতেন ঃ আয় আল্লাহ্! তুমি নিশ্চয়ই জান যে, ইবাদত করার শক্তি-সামর্থ্যও আমার আর অবশিষ্ট নেই, আরও দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি এমন না হতো, তাহলে আজকেও আমি রুটি গ্রহণ করতাম না। আয় আল্লাহ্! এই রুটিতে যদি কিছু অবৈধ বা হারামের লেশমাত্র থেকে থাকে তবে সে জন্য তুমি আমাকে পাকড়াও করো না। তারপর সে রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেতেন।

উপরে যে দু'টি পদ্ধতি বর্ণিত হলো, তা হলো তাকওয়া পন্থীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবস্থা ও মহিমার কথা। তাছাড়া, অবশিষ্ট শ্রেণীর তাকওয়া পন্থীদেরও নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী তাকওয়া অবলম্বনের চেষ্টা করা উচিত। মনে রাখবে, আল্লাহ্ পাক কারো সামান্যতমও নেকী যেমন বিনষ্ট হতে দেন না, তেমনি তিনি সকলের আমল সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিফহাল।

হালাল বস্তুর বিবরণ

এ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা হারাম বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এবার হালালের পরিচয় এবং অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের যে সীমা বর্ণনা করা দরকার, যে পর্যন্ত পৌঁছার পর হিসেবের সম্মুখীন এবং শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে। সে সাথে এ-ও বর্ণনা করা দরকার যে, মানুষ কখন কতটুকু পরিমাণ গ্রহণ করবে। কতটুকু গ্রহণ করলে তা সমীচীন বলে গণ্য হবে— অপ্রয়োজনের সঙ্গে গৃহীত পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং যা গ্রহণ করলে হিসেব-নিকেশ ও শাস্তি—কোনটারই সম্মুখীন হতে হবে না।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, সামগ্রিকভাবে হালাল বস্তু তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, মানুষ যদি হালাল জিনিসও গৌরব, প্রদর্শনীমূলক (রিয়া) এবং অহংকারের ভিত্তিতে অর্জন করেন, তাহলে এ অর্জন অন্যায়ের মধ্যে পরিগণিত হবে। আর তার এই বাহ্য-ক্রিয়ার দরুন হিসেব-নিকেশ, লাঞ্ছনা ও শাস্তি অনিবার্য। এমনকি, এটি এমন একটি অন্যায় কাজ যে, এর অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া অর্থাৎ অধিকতর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং অহংকার-- উভয়টির জন্যই

দোযখের আযাব হবে। কারণ, এ ধরনের সংকল্প সরাসরি গুনাহ্। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ

وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ -

দুনিয়ার এ জীবন খেলা, তামাশা এবং সজ্জিতকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর পরস্পরের মধ্যে বড়াই করা, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করা। যেমন বৃষ্টি চাষীর নিকট উত্তম বলে প্রতীয়মান হয়। (সূরা হাদীদ ঃ ২০)

নবীয়ে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالاً مُبَاهِياً مُكَاثِراً مُفَاخِراً مُرَائِيًا لَقِى

اللّٰهَ تَعَالٰى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانَ -

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় হালালকে প্রদর্শনীমূলক, অহংকার ও গৌরব প্রকাশের মনোবৃত্তি নিয়ে উপার্জন করবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তখন তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।

সুতরাং মনে মনে সংকল্প করার জন্যই শাস্তি অবধারিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হালাল উপার্জন হলো নিছক প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। অন্য কোন উদ্দেশ্য এর পেছনে কাজ করে না। এটি অত্যন্ত খারাপ এবং অতি মন্দ। এরও হিসেব-নিকেশ দিতে হবে এবং এ জন্য শাস্তি অনিবার্য।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -

আর সেদিন তোমাদের সকলকেই প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে হিসেব দিতে হবে। (সূরা তাকাসুর ঃ ৮০)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ حَلَالُهَا حِسَابٌ -

হালাল বিষয়েরও হিসেব-নিকেশ হবে।

আর তৃতীয় শ্রেণী হলো এই যে, হালাল বস্তুর মধ্য থেকে নিতান্ত প্রয়োজনে কেবল ততটুকু গ্রহণ করা, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে শক্তি ও সামর্থ্য হাসিল হয়। এর বেশি একটুও নয়।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর হালাল উপার্জনই হলো নেকীর কাজ এবং সমীচীন। এ ব্যাপারে কোন প্রকারের হিসেব ও শাস্তি অবধারিত নয়। বরং এ জন্য সওয়াব ও প্রশংসাই প্রাপ্য। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا -

এ ধরনের মানুষ তাদের উপার্জিত অংশ লাভ করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ وَسَعْيًا عَلَى عَالِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ -

যে ব্যক্তি সওয়াল করা থেকে মুক্ত থাকে, প্রতিবেশীকে সাহায্য দান করে এবং নিজের পরিবার-পরিজনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হালাল উপার্জন করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তাঁর চেহারা চতুর্দশী চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল প্রতিভাত হবে।

মনে রাখবে, এত সব সওয়াব ও প্রশংসা কেবল তার পবিত্র ও নির্মল নিয়তের জন্য লাভ হবে। সুতরাং সকলেরই এ নীতি অবলম্বন করা উচিত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জায়েয এবং হালাল বিষয়ের শর্ত কি? কারণ নেকী হাসিলের জন্য এ বিষয়টি সম্পর্কেও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। মনে রাখা দরকার যে, উত্তম এবং নেক হওয়ার জন্য মূলত দুইটি শর্ত অপরিহার্য। প্রথমত, অবস্থার দিক থেকে। দ্বিতীয়ত, নিয়ত ও সংকল্পের দিক দিয়ে।

প্রথম অবস্থাটি হলো গত্যন্তরহীনতা ও উপেক্ষণীয় পর্যায়ের। যদি তাতে লিপ্ত না হয়, তাহলে জীবনের আশঙ্কা আছে কিংবা স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা অন্তত পুরোপুরি বিদ্যমান অর্থাৎ কোন মানুষের অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হওয়া যে, সে যদি এ জায়েয ব্যাপারে লিপ্ত না হয়, তাহলে তার ফরয ও সুন্নত আদায়েই

অসুবিধা হবে। এমনকি, তাতে অপারগও হয়ে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় জায়েয বিষয়কে গ্রহণ করাই তার জন্য উত্তম। কারণ দুনিয়ার হালাল ও জায়েয জিনিসকে পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্য ফযীলত অর্জন। কিন্তু যদি তা গ্রহণ না করলে ফরযে অপারগতা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, তাহলে এটাকে মজবুরী হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো নিয়ত ও সংকল্প সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে শক্তি ও সামর্থ্যের সংকল্প ও নিয়ত হবে এবং মনে মনে বলবে যে, এর মধ্যে যদি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের মাধ্যম ও কারণ না থাকে, তাহলে এর মধ্যে কোন কিছুতেই আমি লিপ্ত হবো না। মোটকথা, এটা হলো এ ব্যাপারে প্রমাণ ও দলিলের কথা। নিতান্ত প্রয়োজন এবং গত্যন্তরহীনতার ক্ষেত্রে যদি এ বিষয়টি (যাকে দলিল ও প্রমাণ বলা হলো) পাওয়া যায় বা অর্জিত হয়, তাহলে দুনিয়ার হালাল বস্তু উপার্জন নেকীর কাজও সমীচীন বলে প্রতিপন্ন। এটাকে মজবুরী হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যদি অবস্থাটি অপরাগতারই হয় অর্থাৎ উপরিউক্ত সংকল্প না থাকে এবং মনে মনে উপরিউক্ত বিষয় স্মরণ না করা হয় কিংবা যদি সংকল্প ও বিষয়টি স্মরণও করা হয় কিন্তু মজবুরী ও অপারগতা না থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় হালাল বস্তু উপার্জন নেকীর কাজ বলে গণ্য হবে না।

এখন মনে রাখতে হবে যে, এ নীতি ও আদর্শকে যদি তুমি রক্ষা করে চলতে চাও, তাহলে দৃঢ়সংকল্প, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন হবে খুব অধিক। বস্তুত আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য শক্তি-সামর্থ্য বজায় রাখার জন্য ব্যতীত দুনিয়ার কোন জিনিসই তুমি গ্রহণ করবে না।

এখন যদি প্রশ্ন উঠে যে, কামনার বশবর্তী হয়ে দুনিয়ার হালাল বস্তুতে লিপ্ত হলে, তা কি পাপের মধ্যে পরিগণিত হবে ? এবং তা আযাবের কারণ হবে কি না? আর ওযরের অবস্থার হালাল বস্তু উপার্জন ফরয কি না?

মনে রাখতে হবে যে, হালাল বস্তু পরিত্যাগ একটা ফযীলতের ব্যাপার। যে ফযীলত হলো নেকী ও কল্যাণে সমৃদ্ধ। এ নীতি পালন করে চলা একটি আদবের কাজ। অপরপক্ষে কামনা পরিপূর্ণ করা মন্দ ও গুনাহ্র কাজ। এ থেকে নিজেকে রক্ষা করাটা হলো সাবধানতা ও সতর্কতার মতোই। এতে গুনাহ্ নেই সত্য কিন্তু তাতে লিপ্ত হওয়ার দরুন হিসেব-নিকেশ এবং লাঞ্ছনার ভয় আছে।

মানুষের যে হিসেব-নিকেশ অবধারিত, তা কি? তা এই যে, কিয়ামতের দিন বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে– কোথা হতে উপার্জন করেছো, কোথায় তা খরচ করেছো আর সে উপার্জনের সময় নিয়ত কি ছিল? এ হিসেব-নিকেশ জান্নাত গমনের পথে বাধার সৃষ্টি করবে। ভয় ও আশঙ্কায় হৃদয় থাকবে দোদুল্যমান, সকলেই থাকবে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। মোটকথা, যে ব্যক্তি নসীহত হাসিল করতে চায়, তার জন্য এ বর্ণনাটুকুই যথেষ্ট।

এখন যদি বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য যা হালাল করে দিয়েছেন তা ভোগ বা তাতে লিপ্ত হওয়ার দরুন লাঞ্ছনা ও অপমান কেন?

তাহলে শুনে রাখ– লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হলো আদব পরিত্যাগ। যেমন কোন ব্যক্তি যদি বাদশাহ্র খানার মজলিসে শামিল হয়, কিন্তু সে খানার আদবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তাহলে তার জন্য লাঞ্ছনা বা অপমান নেমে আসা স্বাভাবিক, যদিও তাতে সকলেরই খাওয়ার অধিকার আছে। সুতরাং আসল কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সকল দিক থেকেই আল্লাহ্র বান্দা। সুতরাং বান্দার জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, সে যথাসম্ভব সকল প্রকারেই আল্লাহ্র ইবাদত করবে। আর যে প্রকারে হোক, নিজের সকল ক্রিয়াকর্মকে করে তুলবে ইবাদতেরই অনুকরণীয় রূপে। যদি মানুষ তা না করে নিজের কামনা-বাসনাকে অগ্রাধিকার দান করে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে নিশ্চিতই সে অপমান ও লাঞ্ছনার যোগ্য বলেই প্রমাণিত হবে। বস্তুত দুনিয়াটা প্রকৃতপক্ষে কেবল ইবাদতের স্থান। এটা আরাম-আয়েশের জায়গা নয়। সুতরাং আরাম-আয়েশে গা এলিয়ে দিলে, ভোগে মত্ত হয়ে পড়লে পরিণামে যে আল্লাহ্র তরফ থেকে অপমানের বোঝা নেমে আসবে তাতে সন্দেহের কিছুই নেই।

যা হোক, আমি বিভিন্ন শিরোনামায় যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করলাম, তাতে উদ্দেশ্য মাত্র বলতে গেলে একটিই। তা হলো নফসের সংশোধন এবং তাতে তাকওয়ার লাগাম লাগানো। সুতরাং এ বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা ও দৃঢ়তা অবলম্বন করে চলতে পারলে আখিরাতে অসংখ্য পুরস্কার ও সীমাহীন সাফল্যের গৌরবে দীপ্ত হবে তোমার মুখমন্ডল।

ষষ্ঠ সোপান

দুনিয়া, সৃষ্ট জীবন, শয়তান এবং নফসের চিকিৎসা

হে লোক সকল ! এ দীর্ঘ ও মহাসঙ্কটময় ঘাঁটি অতিক্রম করার জন্যই তোমাকে সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে হবে। কারণ, এই ঘাঁটিটি মহাসঙ্কটময়, ইহা অতিক্রম অতি ক্লেশপূর্ণ– সতত বিপদের আশঙ্কা। কাজটি এত কঠিন যে, তার তুলনা নেই। কারণ, এ সৃষ্টি জগতে যা কিছুই, আর যে কেউই ধ্বংস হয়েছে, তা কেবল সত্য পথ থেকে বিচ্যুতির জন্যই। সত্য পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াই সকল অনিষ্টের কারণ। আবাব এ কারণের মূলে আছে হয় সৃষ্ট জগতের কিছু, নয় শয়তান অথবা স্বয়ং নফস। আমি আমার অন্যান্য গ্রন্থ– যেমন 'ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দনি' ও 'কিতাবুল আসরার' প্রভৃতিতে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং এসবের প্রতিকারের বিধানও বাতলিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে আমি কেবল এসবের প্রতিকারের এমন মূল্যবান কয়েকটি কথা বলেই ক্ষান্ত হতে চাই, যে কথাগুলো হবে সংক্ষিপ্ত ধরনের, কিন্তু তার অর্থ হবে ব্যাপক আর অনুসন্ধানকারীদের নিয়ে তুলবে সৌভাগ্যের রাজপথে। মোটকথা, দুনিয়া, শয়তান, সৃষ্ট জগত ও নফসের চিকিৎসা বা প্রতিকারের ব্যাপারে এ কথাগুলো অকল্পনীয় সাফল্য আনয়ন করতে সক্ষম।

দুনিয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা অপরিহার্য কর্তব্য। এ জন্য সম্ভব মতো দুনিয়া বর্জন করতে হবে। কারণ, তুমি যে-ই হও না কেন, বিষয়টি তিনটি অবস্থার বাইরে নয়।

তুমি যদি জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিমান হও তাহলে তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট যে, দুনিয়া আল্লাহ্র দান। এটা তোমাকে মোহিত ও অভিভূত করার ক্ষমতা রাখে। ফলে এতে লিপ্ত হলে তোমার বিবেকই বিলুপ্ত হয়ে যাবে অথচ বিবেকই তোমার মূলধন। আর তুমি যদি আল্লাহ্র ইবাদতে নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের

মাধ্যমে প্রচেষ্টাকারী হও, তাহলে তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট যে, দুনিয়ার পদে পদে এত সঙ্কট ও এত অবাঞ্ছিত জিনিস রয়েছে যে, সেগুলো তোমার প্রচেষ্টায় সর্বদা শুধু বাধারই সৃষ্টি করে। এগুলো তোমার বুদ্ধি-বিবেককে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং অনুরূপ অবস্থায় এ দুনিয়া তোমার কি কাজে আসবে ?

আর যদি গাফিল, সত্য-উপলব্ধির ব্যাপারে অক্ষম হও এবং তোমার এমন শক্তি ও সামর্থ্য নেই যে, তোমাকে নেকী করার ব্যাপারে প্রেরণা যোগায়— এমতাবস্থায় তোমার জন্য সবচাইতে মঙ্গল ও কল্যাণকর হলো তোমার জন্য দুনিয়াটাই অবশিষ্ট না থাকুক অথবা তুমিই দুনিয়া কিংবা দুনিয়া তোমা থেকে আলাদা হয়ে যাক্। হাসান বসরী (র) বলেছেন ঃ দুনিয়া তোমার সঙ্গে থাকলে, (মনে রাখবে) তোমার সাথে কিছুই নেই।

সুতরাং, দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে তোমার এ অমূল্য জীবনের অপচয়ে কি ফায়দা? তাই কোন এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ দুনিয়াকে পরিত্যাগ করো, শান্তি ও স্বস্তি লাভ হবে। দুনিয়ার গতি কি বিলুপ্তির দিকে নয় ? তাহলে যে জীবনের ভরসাই নেই, তার থেকে আর কি-ই বা আশা করা যায় ? দুনিয়া এমন একটি ক্ষতের ন্যায়, রাতের আগমন ও নির্গমন যার অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেছে। দুনিয়া একটি ছায়া-সদৃশ, যে ছায়া তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আবার তখনি বিদায় জানায়।

সুতরাং, কোন জ্ঞান ও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে দুনিয়ার ধোঁকায় নিপতিত হওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়। কোন এক ব্যক্তি কত সুন্দর করেই না বলেছেন ঃ দুনিয়া মতিভ্রমের স্বপ্নের ন্যায় অথবা অপসৃয়মান ছায়া সদৃশ।

বিবেকবান ব্যক্তি কখনো এ ধরনের সুস্পষ্ট ধোঁকায় পতিত হতেই পারেন না।

শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে লক্ষ্য করে যে কথা বলেছেন, তাকে স্মরণ রাখাই যথেষ্ট। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ -

বলো, আয় পরওয়ারদিগার ! আমি শয়তানের ধোঁকা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আয় রব, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সে জন্য যে, সে আমার নিকট উপস্থিত হবে। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৯৭-৯৮)

বিশ্বের সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; জ্ঞান-গরিমায়, বিবেক ও মর্যাদায় যিনি সবচাইতে শ্রেষ্ঠ, সে মহামানবকেই যদি শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে রক্ষা পেতে হয়, তাহলে তোমার অবস্থা কি হতে পারে, একবার বিবেচনা করে দেখো! অথচ তাঁর তুলনায় তোমার অজ্ঞতা, অসচেতনতা তো অতি সুস্পষ্ট।

এরপর আসে মখলূক অর্থাৎ সৃষ্ট-জগতের কথা। এ বিষয়েও আলোচনা করা যাক।

তুমি যদি মখলূকাতের সাথে মিলমিশ এবং সম্পর্ক তৈরির কাজে লিপ্ত হও এবং তার কামনায় সাথী হও— তাহলে তোমার আখিরাত ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। আর যদি মখলূকাতের কোন কাজে বিরোধিতা করো, তাহলে তাদের সকল দুঃখ-কষ্ট বিপদ-মুসীবত তোমাকে বিব্রত করে তুলবে। তোমার পার্থিব জীবনটাই দুর্ভোগের হয়ে যাবে। এ সত্ত্বেও তাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ হতে পারবে না। তারা তোমাকে তাদের অহংকার ও গৌরবের নিকট বিনয়াবনত করার চেষ্টা করবে। ফলে, তুমি তাদের অনিষ্টের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হবে। যদি কখনো তারা তোমার প্রশংসা ও মহিমা গায়, তাহলে তাতে স্বার্থ ও ফিতনার আশঙ্কা আছে।

আর যদি তারা তোমাকে তুচ্ছ এবং হেয় জ্ঞান করে, তাহলে কখনো বা এ ব্যাপারটা তোমাকে ব্যথিত করবে, আবার অনেক সময় এ ব্যাপারটাই রাগান্বিতও করতে পারে। এতদুভয়ই ধ্বংস ও বরবাদকারী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তাছাড়া চিন্তা করে দেখো! তুমি কবরে গিয়ে তিনদিন অবস্থানের পর একবার তোমার অবস্থার সাথে তাদের অবস্থা তুলনা করে দেখলে দেখবে যে, তারা কিভাবে তোমাকে কবরে ফেলে চলে গেছে— তারপর এ কয়দিনেই এমনভাবে ভুলে গেছে যে, তুমি যেন কখনো তাদের সাথে ছিলেই না। এমনকি কিছুদিনের মধ্যেই তোমার নামটি পর্যন্ত আর কেউ উল্লেখ করবে না— যেন তোমাকে তারা চিনতোই না। তখন একমাত্র ভরসাস্থল থাকবেন আল্লাহ্ পাক।

সুতরাং যে মখলূকের এই-ই পরিচয়, তার সাথে জড়িত হয়ে নিজের অমূল্য জীবনের সময় খরচ করাটা কি বিরাট ক্ষতি নয় ? অথচ সে মখলূকের কৃতজ্ঞতাও যেমন নেই– তেমনি তার সবই অস্থায়ী। অথচ তুমি সেই পাক-যাতকে পরিত্যাগ করছো, তাঁর ইবাদতের কথা ভুলে গেছো– যিনি এক এবং অদ্বিতীয়; যাঁর কোন শরীক নেই– সবকিছুই যাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। তিনিই কেবল বান্দার চিরন্তন সাথী। যা কিছু প্রয়োজন, তা কেবল তাঁর কাছেই চাওয়া যায়। তাঁর উপরই সকল ও পূর্ণ ভরসা। সকল অবস্থায় তাঁর আশ্রয় কামনাই সঠিক পন্থা। সকল বিপদ-মুসীবত, সকল ব্যথা-বেদনা তাঁকেই জানানো দরকার। কারণ তিনিই প্রকৃত ত্রাণকর্তা।

হে অনুসন্ধানী! এ বিষয়গুলো উত্তমভাবে চিন্তা করো– উপলব্ধি করো। ইন্‌শাআল্লাহ্ অচিরেই তোমার হৃদয় হিদায়তের রওশনীতে উজ্জ্বল হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তোমাকে সে সৌভাগ্য দান করুন।

অবশিষ্ট রইলো নফস। নফসের সকল গতিবিধি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং তার চাওয়া ও কামনা, ন্যক্কারজনক ভূমিকা এবং তাকে অবলম্বন করার পরিণাম—এসব বিষয় ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলেই এর প্রতিকারের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা বেরিয়ে আসবে। কারণ নফস কামনার সময় পশু, গোস্বার সময় হিংস্র প্রাণী এবং মুসীবত ও পেরেশানীতে ছোট্ট শিশুর ন্যায় রূপ ধারণ করে। আবার এ নফসই স্বাচ্ছন্দ্য ও খোশহাল অবস্থায় ফিরাউন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় পাগল, তৃপ্ত হলে অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে পড়ে। তুমি নফসকে পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াও, সে অহংকারী এবং বিদ্রোহী হয়ে যাবে। ক্ষুধার্ত রাখো, আর্তনাদ করবে– ভয় পাবে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নফসের এভাবে পরিচয় দান করেছেন যে, নফস সেই নীচাশয় গাধার ন্যায়, যাকে পেট ভরালে মানুষকে লাথি মারে আর ক্ষুধার্ত রাখলে আর্তনাদ করে।

সালিহীনদের কেউ কেউ ঠিকই বলেছেন যে, নফসের অজ্ঞতা ও নীচাশয়তা প্রত্যক্ষ করার জন্য লক্ষ্য করে দেখুন যে, নফস যখন কোন গুনাহ্ করতে আগ্রহী হয় কিংবা কামনা চরিতার্থ করার উদ্যোগী হয় তখন তাকে তা থেকে ফিরাবার চেষ্টা করুন, আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করান। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এমনকি সমস্ত নবী—রাসূল, সমস্ত আসমানী কিতাব ও সালিহীনদের

কথা স্মরণ করিয়ে দিন, স্মরণ করিয়ে দিন মউত, কবর, কিয়ামত এবং জান্নাত ও দোযখের কথা— তথাপি কিছুই হবে না। কিছুতেই নফসকে বাগে আনতে পারবেন না। সে কিছুতেই কামনা পরিত্যাগ করতে চাইবে না। কিন্তু নফসকে একটি রুটি দেয়া বন্ধ করুন— দেখবেন, ক্ষুধায় কাতর হয়ে সে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে— সকল কামনা তার ভেস্তে গেছে।

এতে সহজেই নফসের নীচাশয়তা ও হীনতা অনুমান করা যায়। সুতরাং— হে মানুষ " এ নফসের ব্যাপারে কোন অবস্থাতেই, কোনক্রমেই অসতর্ক হয়ো না। কারণ নফসের ধোঁকার কথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ পাক নফস সম্পর্কে বলেছেন ঃ

. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِا لسُّوْءِ –

নফস তো সব সময় সকলকেই কেবল মন্দ কথাই বাত্লিয়ে থাকে।

(সূরা ইউসুফ)

যা হোক, বিবেকবানদের জন্য এ আলোচনাই যথেষ্ট।

আহমদ ইবনে আকরাম বলখী থেকে বর্ণিত— তিনি বলেছেন ঃ একবার আমার নফস আমাকে জিহাদে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলো। আমি ভাবলাম, বেশ কথা দেখছি। আল্লাহ্ পাক বলেন যে, নফস সব সময় মন্দ কাজে আহবান জানায়, আর আমার এ নফস দেখছি উত্তম কাজের প্রতি তাকীদ দিচ্ছে। এমন তো কিছুতেই হতে পারে না। বললাম, হে নফস! তুই নির্জনতায় বুঝি ভয় পেয়ে গেছিস— মানুষের সাথে মিলতে চাস এবং তাদের মধ্যে গিয়ে আরাম পেতে চাস। আর হয়তো কামনা করছিস যে, মানুষ তোকে খুবই সম্মান করুক। কিন্তু আমি তোকে কিছুতেই প্রাধান্য বিস্তার এবং খ্যাতি অর্জন করতে দেব না। নফস আমার একথার জবাব দিল। কিন্তু এমন জবাব দিল যে, আমার সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পেলো। কারণ, আমি জানি আল্লাহ্ পাক সবচাইতে সত্যবাদী (সুতরাং নফস সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তা-ই ঠিক)। তাই আমি নফসকে ভয় দেখালাম যে, আমি যদি জিহাদে যাই, তাহলে শত্রুর মধ্যে এমনভাবে এগিয়ে যাব যে, প্রথমে তোকেই নিহত হতে হবে। নফস একথারও একটি জবাব দিল। তার জবাবে আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো। এভাবে নফসের কামনার

কতিপয় বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করলে নফসের নিকট থেকে একই রকমের জবাব পেলাম। তখন আমি আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত করলাম ঃ আয় আল্লাহ্ ! নফসের এ পীড়াপীড়ি সম্পর্কে তুমি আমাকে অবহিত করো। কারণ, আমি নফসকে বিভ্রান্তিকর এবং তোমাকেই সত্য পথ-প্রদর্শক মনে করি। যা হোক, কাশ্ফের মাধ্যমে বিষয়টি আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নফস যেন আমাকে বলছে ঃ আয় আহমদ ! তুমি সব সময় আমার কামনায় বাধ সেধে এবং লালসা পরিপূর্ণ না করে আমাকে মেরে ফেলেছো। কিন্তু তুমি যে আমাকে মারছো, তা অন্য কেউ জানতে বা বুঝতে পারছে না। তুমি যদি জিহাদে যাও, তাহলে আমি মাত্র একবারে নিহত হয়ে তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবো। তাছাড়া, মানুষের মধ্যেও একথা ছড়িয়ে পড়বে যে, আহমদ শহীদ হয়ে গেছে। এ বিষয়টি আমার জন্য গৌরব ও মর্যাদার কারণ হবে।

আহমদ বলখী বলেন ঃ একথা জানতে পেরে আমি ঠিক করলাম যে, আমি এবার আর জিহাদেই যাব না।

কোন এক ব্যক্তি ঠিকই বলেছেন ঃ নিজের নফসের হিফাজত করো। নফসের ধোঁকায় নিপতিত হয়ো না। কিংবা তার ধোঁকার কথা ভুলে যেয়ো না। মনে রাখবে, নফস শয়তানের চাইতে সত্তর গুণ বেশি দুষ্কৃতিশীল। এ দুষ্কৃতিশীল দাগাবাজের নির্দেশ সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকবে। নফস যাই বলুক মনকে, তার বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে তাতে 'তাকওয়া'র লাগাম পরিয়ে দেবে। এছাড়া, নফসের উপর জয়ী হওয়ার আর অন্য কোন পথ নেই।

এখানে আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার যে, ইবাদত দুই প্রকার। একটি হলো উপার্জন করা, আর দ্বিতীয়টি হলো পরহেয করা। আল্লাহ্র আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রথমটি হাসিল হয় আর দ্বিতীয়টি হাসিল হয় গুনাহ্ ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। শেষোক্তটির একমাত্র মাধ্যম হলো 'তাকওয়া'।

পরহেযের পন্থাটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং অতি উপকারী। ইবাদত গুযারদের জন্য উপার্জনের পন্থা অপেক্ষা এটিই অধিকতর উত্তম। এ জন্যই দেখা যায় যে, ইবাদতে ইলাহীর শুরুকারিগণ, যারা চেষ্টার পর্যায়ে আছেন, তাঁরা সাধারণত নিজেদের সকল প্রচেষ্টাকে 'উপার্জন পদ্ধতিতে' সীমাবদ্ধ রাখেন। অর্থাৎ তাঁরা দিনে রোযা রাখেন, রাতে জেগে ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকেন প্রভৃতি। আবার

ইবাদত গুযারদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আসীন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের সকল প্রচেষ্টাকে দ্বিতীয় অর্থাৎ গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার কাজে কেন্দ্রীভূত করেন। অন্তঃকরণকে গায়রুল্লাহ্ থেকে দূরে রেখে তার বিশুদ্ধতা ও নির্মলতা রক্ষা করা, পেটকে হারাম এবং অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় হালাল থেকে নিরাপদ রাখা, নিজের জবানকে বেহুদা ও বাজে কথা থেকে দূরে রাখা, নিজের দৃষ্টিকে এমন কোন জিনিসের উপর পতিত করা থেকে বিরত রাখা যেখানে পতিত হলে কোন ফায়দা নেই– এসব ব্যাপারেই তাঁদের প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয়।

সপ্ত-ইবাদতকারীর দ্বিতীয়জন এ বিষয়টিই ইউনুস (র)-কে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ আয় ইউনুস (র)! মানুষের মধ্যে বহু লোক আছেন, যাঁরা নামায পড়াকে অধিক পছন্দ করেন। তাঁরা নামাযের উপর অন্য কিছুকে অগ্রাধিকার দিতে চান না। সত্যিই তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্র ইবাদতে স্থির, আল্লাহ্র প্রতি সততায় অবিচল এবং বিনয়ের মূর্তিমান প্রতীক।

আবার বহু লোক এমনও আছেন, যাঁরা রোযা রাখাকে খুবই পছন্দ করেন। এ শ্রেণীর লোকও রোযার উপর অন্য কিছুকে অগ্রাধিকার দিতে রাযী নয়। তেমনি কতিপয় ব্যক্তি সদকা-খয়রাতে অধিক আগ্রহী। এরাও সদকা ও খয়রাতকেই অধিক পছন্দ করে।

ওহে ইউনুস ! আমি তোমাকে এর সবগুলো অভ্যাসেরই ব্যাখ্যা বর্ণনা করছি। নামাযের স্থায়িত্ব, মুসীবতে সবর এবং আল্লাহ্র সকল নির্দেশ পালনের দ্বারা সম্পন্ন করো। তোমার রোযাকে সকল মন্দের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকায় রূপান্তরিত করো আর তোমার সকল সদকা ও খয়রাতকে সকল প্রকার মন্দ ও পঙ্কিলতা থেকে বিরত রাখায় পরিবর্তিত করো। কারণ এর চাইতে অধিক সদকা আর কোন প্রকারেই তোমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আর এর চাইতে নিজেকে পবিত্র ও নির্মল রাখাও আর কোন উপায়ে হতে পারে না।

সুতরাং, একথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরহেয ও বিরত থাকার পন্থাটিই সকল দিক থেকে উত্তম। যদি উভয় পদ্ধতিই হাসিল করতে পার, তাহলে তো তোমার সকল ব্যাপারই পূর্ণাঙ্গ এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। তুমি হবে সকল দিক থেকেই নিরাপদ। কিন্তু যদি একটিমাত্র পদ্ধতি হাসিল করতে সক্ষম হও, তাহলে আর কিছু না মিলুক, অন্তত মন্দ থেকে তুমি

নিরাপদ হয়ে যাবে। অন্যথায় উভয় পদ্ধতিই তোমাকে খোয়াতে হবে। আর যদি তা-ই হয়, তাহলে এরপর ইবাদতে রাত জাগরণও কোন উপকার সাধন করতে পারবে না। কারণ, একটি মাত্র ধোঁকা বা সন্দেহ দ্বারা সমস্ত নেকী বরবাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। তেমনি দিনের রোযাও ফলপ্রসূ হবে না। কারণ একটি মাত্র উক্তির দরুনই সব বিনষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি এ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন— যাদের একজন একদিকে যেমন খুব নেক কাজ করে, আবার তেমনি খুব মন্দ কাজ করে। আর দ্বিতীয়জন প্রথমজনের ঠিক বিপরীত অর্থাৎ-তার নেকীও কম, গুনাহ্ও কম। তিনি জবাবে বললেন ঃ কারো সম্পর্কেই আমি নিরাপত্তা ও শান্তির রায় দিতে পারছি না।

উপরে যে দুইটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছি, তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ধরুন, একজন মানুষ রোগাক্রান্ত হয়েছেন। কবিরাজ তাঁর চিকিৎসার জন্য স্বভাবতই দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। একটি ঔষধ দিয়ে রোগ দূরীকরণ, দ্বিতীয়ত, দূষণীয় বা ক্ষতিকর কোন কিছু থেকে বিরত থাকার উপদেশ। উভয়টিই যদি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়, তাহলে রোগী শীঘ্র সুস্থ ও সবল হবে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। আর যদি উভয়টি সম্ভব নাও হয়, তাহলে দূষণীয় ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ ক্ষতিকর ও দূষণীয় বিষয় থেকে বিরত না হলে ঔষধ মোটেই ফলপ্রসূ হবে না। অপরপক্ষে, ঔষধ না হলেও ক্ষতিকর ও দূষণীয় বিষয় থেকে বিরত থাকার ফলে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اَصْلُ كُلِّ دَوَاءِ الْحَمِيَّةُ –

সকল ঔষধের মূল হলো (ক্ষতিকর ও দূষণীয় বিষয় থেকে বিরত) থাকা।

মোট কথা, এই 'বিরত থাকা'ই সকল ঔষধের কাজ করে যায়। তখন অন্য ঔষধের আর বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। এই জন্যই বলা হয়েছে যে, হিন্দুস্তানবাসীদের (উপমহাদেশের অধিবাসী) উত্তম চিকিৎসা হলো 'বিরত থাকা'। অর্থাৎ তারা রোগীকে কিছুদিনের জন্য খাওয়া-দাওয়া ও কথাবার্তা বলার

ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ফল এই হয় যে, রোগী শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে এবং স্বাস্থ্য ও বল ফিরে পায়।

এই আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কম কথা বলা সকল দিক থেকেই উত্তম এবং একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য। উচ্চ শ্রেণীর ইবাদতগুযারদের বৈশিষ্ট্যও এটিই।

সুতরাং, এ বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য। চেষ্টা করলে আল্লাহ্ পাক অবশ্যই নেক তওফীক দান করবেন।

চোখ, জিহ্বা, পেট এবং অন্তঃকরণ সংশোধন

অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চারটি প্রধান অঙ্গের হিফাজত ও সংশোধনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। এ চারটি প্রধান অঙ্গের মধ্যে আবার চোখই অধিকতর অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ, সকলেরই জানা আছে যে, দীন-দুনিয়ার সকল কাজের উৎস হলো অন্তঃকরণ। এ অন্তঃকরণের সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সকল বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে চোখের মাধ্যমে। এ জন্যই হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার চোখের উপর জয়ী হতে পারবে না, তার অন্তঃকরণের কোন মূল্য নেই।

দ্বিতীয় অঙ্গ হলো জিহবা। একথা সকলেরই জানা যে, এ জিহবাতেই মানুষের সকল কল্যাণ ও সম্পদ বিদ্যমান। কারণ, মানুষের সকল চেষ্টার ফল, সকল পরিশ্রমের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্র পথে উপার্জিত নেকী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ইবাদত ও নেকীর সংরক্ষণ বা ধ্বংস একমাত্র জিহবা 'জবানের দ্বারাই সাধিত হয়। কারণ কথার দ্বারা যেমন তা হিফাজতের ব্যবস্থা হয়, তেমনি একটি কথার দ্বারা তা বিনষ্টও হয়ে যেতে পারে। যেমন গীবত, মিথ্যা এবং বানিয়ে কথা বলা। এমন ধরনের একটি কথার দ্বারাই এক বছরের ইবাদতের সকল পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা নিমিষে পণ্ড হয়ে যায়। এমনকি, এ ধরনের একটি কথার দ্বারা পাঁচ-সাত বছরের ইবাদতের প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমও বরবাদ হতে পারে। এজন্যই বলা হয়েছে যে, জবানকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া কোন কাজেই সফলতা সম্ভব নয়।

বর্ণিত আছে— সপ্ত-ইবাদতগুযারের কোন একজন ইউনুস (র)-কে

বলেছিলেনঃ হে ইউনুস! ইবাদতকারী যখন ইবাদত করার চেষ্টা করে তখন বহুদিনের জন্য অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিত্যাগ করে। অন্যথায় কোন জিনিসের দ্বারাই ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয় না।

অতঃপর উপরিউক্ত কথাটিকেই অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলেছেনঃ 'জবানের হিফাজতের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার মতো তোমার আর কিছুই নেই। এর পরেই হিফাজত করা দরকার নিজের অন্তঃকরণের। সুতরাং, এ উপদেশটি সতর্কতার সাথে পালন করা অবশ্য কর্তব্য।'

তাছাড়া, ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের কথাই একবার ভেবে দেখো। তোমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথেই জীবনের সময় অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে। এ অমূল্য সময়ে যদি তোমার মুখ থেকে বাজে বেহুদা কথা বের হয়, তাহলে কেবল তা তোমার ক্ষতিই বহন করে আনবে। অপরপক্ষে, বেহুদা কথা বলার পরিবর্তে যদি তুমি 'আস্‌তাগফিরুল্লাহ্' পড়— তাহলে হয়তো বা এ সময়টুকুই তোমার জন্য অমূল্য সওগাত নিয়ে আসতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ পাক যদি তোমার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন, তাহলে এ সময়ই তো তোমার জন্য সবচাইতে মূল্যবান।

কিংবা বাজে কথা বলার পরিবর্তে যদি তুমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' জপনা করো— তবে তাও তোমার জন্য সওয়াবের এমন ভাণ্ডার সংগ্রহ করতে সমর্থ হবে যে, তুমি নিজেই তা দেখে তাজ্জব হয়ে যাবে।

অথবা যদি বলো যে, 'আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি, তাহলে এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে, আর তোমার দোয়া লাভ করবে কবূলের মর্যাদা। ফল এই হবে যে, দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল বিপদ-মুসীবত এবং দুঃখ-ক্লেশ থেকে তুমি হবে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

তাহলে এটা কি মস্তবড় আহাম্মকী এবং বিপুল ক্ষতি নয় যে, তুমি তোমার নফস ও সময়কে বেহুদা কাজে লিপ্ত রেখে তাকে এ মহা উপকার থেকে বঞ্চিত করছো? অথচ এ বেহুদা কথার জন্য কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং অসম্মানে পতিত হতে হবে। কোন এক ব্যক্তি বলে গেছেনঃ যখন তোমার বাজে কোন বিষয়ে কথা বলার ইচ্ছা হয়, তখন তৎপরিবর্তে "সুব্‌হানাল্লাহ্' বলো।

তৃতীয় অঙ্গ হলো পেট। এ ব্যাপারে একটি কথা স্মরণ রাখাই যথেষ্ট যে, তোমার লক্ষ্য হলো ইবাদতে ইলাহী। আর খাদ্য হলো ক্রিয়াকর্মের বীজ স্বরূপ।

এ খাদ্য থেকেই কর্ম রূপ লাভ করে। সুতরাং বীজই যদি খারাপ হয়, তাহলে ফসল কিছুতেই উত্তম হতে পারে না। বরং বীজ যদি খারাপ হয়, তবে এমনও আশঙ্কা আছে যে, তোমার আবাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং চিরদিনের জন্য তাতে সাফল্যের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

এ একই ধরনের কথা আমি মা'রূফ কুরখী (র)-র নিকট থেকেও জানতে পেরেছি। তিনি বলেছেন যে, তুমি যখন রোযা রাখো, তখন তুমি পূর্বাহ্নেই চিন্তা করবে যে, তুমি কিসের দ্বারা, কোথায় ইফতার করবে এবং ইফ্তারের সময় কোন্ খাদ্য গ্রহণ করবে। কারণ বহু রোযাদার এমন খাদ্য গ্রহণ করে যে, তার অন্তঃকরণ পূর্বাবস্থায়ই ফিরে যায়। আর রোযার সৃষ্ট অবস্থাটি সাথে সাথে হয়ে যায় বিলুপ্ত। আবার এমন বহু খাদ্যও আছে, যা রাতে জেগে ইবাদত এবং তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত করে। বহু দৃষ্টি এমনও আছে, যা কোন কোন প্রকার তিলাওয়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় মানুষ এমন একটি লোকমা মুখে নেয়, যার দরুন এক বছরের ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। সুতরাং হে লোক সকল! যদি তোমরা অন্তঃকরণকে নির্মল এবং নিজেকে আল্লাহ্র ইবাদতের যোগ্য রাখতে চাও, তাহলে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অতি সতর্কতার সাথে রুযী-রোযগার করবে। কারণ এ ব্যাপারে সামান্যতম বিচ্যুতিও এবং যৎসামান্য অসতর্কতাও সমূহ ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

এরপর লক্ষ্য রাখবে—খাওয়ার আদবের প্রতি। এ বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে লক্ষ্য না রাখলেও তুমি সময় অপচয়কারীর মধ্যে পরিগণিত হবে। কারণ আমি নিশ্চিত জানতে পেরেছি এবং বাহ্যত পরীক্ষাও করে দেখেছি যে, পেটভরা অবস্থায় কোনক্রমেই ইবাদত সম্ভব হবে না— তা তুমি নফসকে যতই বাধ্য কর না কেন, আর যত রকমের চেষ্টা তদবিরই কর না কেন। তাছাড়া, এ অবস্থায় ইবাদতের পূর্ণ স্বাদ এবং খাঁটি মাধুর্য কিছুতেই অনুভব করতে সক্ষম হবে না। এজন্যই বলা হয়েছে যে, অতিরিক্ত খাওয়ার পর ইবাদতের স্বাদ ও মাধুর্য অনুসন্ধান বৃথা। বিষয়টি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে— কারণ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

অথচ মানুষের নফসে ইবাদত ব্যতীত, আর ইবাদতের ইলাহীতে স্বাদ ও মাধুর্য ব্যতীত আর কি রত্ন অর্জন হতে পারে? এদিকে ইঙ্গিত করেই ইব্রাহীম আদহাম (র) বলেনঃ আমি লেবানন পাহাড়ের বহু আল্লাহ্ওয়ালা লোকের সাথে

অবস্থান করেছি। তাঁরা আমাকে সব সময় ওসীয়ত করতেন যে, আমি যখন জনসমাজে প্রত্যাবর্তন করবো, তখন যেন তাদের অবশ্যই চারটি বিষয়ে বিশেষভাবে নসীহত করি। তাদের যেন আমি নসীহত করি যে, যে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করে, সে ইবাদতের স্বাদ ও মাধুর্য অনুভব করতে পারে না। যে ব্যক্তি অধিক নিদ্রা যায়, সে তার জীবন থেকে বরকত হাসিল করতে পারে না। যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার ভাবনায় মগ্ন থাকে, কখনো আল্লাহ্‌র খোশনুদী তার হাসিল হয় না। তেমনি যে ব্যক্তি কথা বলতে বাজে বকে বা গীবত করে, সে দুনিয়া-সর্বস্বই থেকে যায়, ইসলামের মর্ম উপলব্ধি তার দ্বারা কখনো হওয়া সম্ভব নয়।

সহল (রা) থেকে বর্ণিত – তিনি বলেছেনঃ সমস্ত কল্যাণ চারটি স্বভাবের মধ্যে একত্র হয়েছে। সে চার স্বভাব হলোঃ ভুখা এবং চুপ থাকা, মখলূক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং রাত-জাগা।

কোন কোন মারেফাতপন্থী বলেছেনঃ ক্ষুধার্ত থাকাই আমাদের সকল কাজের ভিত্তি। অর্থাৎ ইবাদতে স্বাদ ও মাধুর্য, সকল ব্যাপারে নিরাপত্তা ও শান্তি এবং জ্ঞান ও আমলের ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য– এ সব কিছুই হাসিল হয় কেবল ভুখা থাকার জন্য এবং ক্ষুধায় কাতর হলেও না খেয়ে আল্লাহ্‌র নামে সবর করার দরুন।

শেষোক্ত অঙ্গটি হলো অন্তঃকরণ। এজন্য এতটুকু স্মরণ রাখাই যথেষ্ট যে, অন্তঃকরণই হলো সব কিছুর ভিত্তি ও উৎসমূল। যদি অন্তর বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে সকল কাজই বিকৃত হয়ে যাবে। আর যদি অন্তরকে ঠিক এবং নিরাপদ রাখতে পার, তবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ঠিক এবং নিরাপদ থাকবে। মোটকথা, অন্তঃকরণ (হৃৎপিণ্ড) একটি বৃক্ষের ন্যায়– অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা মাত্র। বৃক্ষের মাধ্যমেই শাখা-প্রশাখা শক্তি লাভ করে। সুতরাং বৃক্ষের ভাল–মন্দের উপরই শাখা-প্রশাখার ভাল-মন্দও নির্ভরশীল। অন্তঃকরণ বাদশাহ আর অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার প্রজা। যখন বাদশাহ ঠিক থাকবে, তখন সমস্ত প্রজাও ঠিক থাকবে। আর বাদশাহ যদি উচ্ছৃঙ্খল ও বিকৃত হয়ে পড়ে, তাহলে সমস্ত প্রজাও একই অবস্থায় নিপতিত হবে। সুতরাং চোখ, জবান, পেট প্রভৃতির সুস্থতা প্রকারান্তরে অন্তঃকরণের সুস্থতা ও সবলতারই পরিচায়ক। আর যদি এগুলোতে কোন প্রকারের বিভ্রান্তি ও বিকৃতি প্রতীয়মান হয়, তাহলে

বুঝতে হবে, অন্তঃকরণের বিভ্রান্তি ও বিকৃতিতেই তা প্রতিভাত হয়েছে অর্থাৎ অন্তঃকরণে যা সৃষ্টি হয়েছে, তারই প্রতিক্রিয়া পড়েছে এ অঙ্গগুলোতে। সাবধান! অন্তঃকরণে বিভ্রান্তি ও বিকৃতির আশঙ্কা খুব বেশী।

সুতরাং, অন্তঃকরণকে সংশোধন ও নির্মল সুস্থ রাখার জন্যই তোমার সকল প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ অন্তঃকরণের সুস্থতা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তৎক্ষণাৎ সুস্থ করে তোলে। যার ফলে মানুষ লাভ করতে সক্ষম হয় পরিপূর্ণ শান্তি, পূর্ণ নিরাপত্তা এবং আরাম ও স্বস্তি।

মনে রাখবে, অন্যান্য বিষয়ের চাইতে অন্তঃকরণের ব্যাপারটি অতি কঠিন, অতি জটিল। কারণ, সকল ধোঁকা ও বিভ্রান্তির এটা কেন্দ্রস্থল। তাছাড়া এটি তোমার সামর্থ্যেরও বাইরে। এর আনুগত্য ও অনুসরণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও অনেক সাধনার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে যথেষ্ট বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ- ক্লেশেরও সম্মুখীন হতে হয়। এজন্যই সাধনা ও চেষ্টাকারীদের নিকটও অন্তরের সংশোধন কঠিন কাজ। অর সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট এর প্রয়োজন ব্যাপক।

আবি ইয়াযিদ (র) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেছেনঃ আমি আমার অন্তঃকরণ, আমার জবান ও আমার নফসের দশ বছর ধরে চিকিৎসা করেছি। এই তিনটির মধ্যে অন্তঃকরণের চিকিৎসাই আমার কাছে জটিল বোধ হয়েছে।

সুতরাং, এ ব্যাপারে অধিক পরিশ্রম, অধিক সতর্কতার প্রয়োজন।

আর এক দফা আলোচনা

এরপর যে চারটি স্বভাবের কথা পূর্বে আলোচনা করেছি, সেগুলোর প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। সে স্বভাব চারটি হলো অতিরিক্ত আশা, দ্রুত কার্য সম্পাদন অর্থাৎ কাজে তাড়াতাড়ি করা, হিংসা ও অহংকার।

এখানে পুনরায় এ বিষয়গুলোর আলোচনা, সমস্ত অভ্যাসের মধ্য থেকে এ চারটি অভ্যাসকে বেছে নেয়া এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপর অধিক গুরুত্ব দানের কারণ এই যে, চারটি অভ্যাস বিশেষ করে কারী সাহেবদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ এ অভ্যাসগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে আর

কারী সাহেবদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। ফল এই হয় যে. এ জিনিসগুলো অতি ন্যক্কারজনক এবং জঘন্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

কারী সাহেবদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন— তাদের আশা হবে সীমাহীন অথচ এটাকে তারা 'নিয়্যতে খায়ের' অর্থাৎ নেক নিয়্যত মনে করবে। ফলে তাদের আমলে আলস্য এবং বিলম্বিতকরণ সৃষ্টি হবে। তেমনি মর্যাদা হাসিলের ব্যাপারে করবে তাড়াতাড়ি। ফলে সে মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে। নেক দোয়া কবূলের ব্যাপারেও তাড়াতাড়ি করবে। ফলে তার সুফল থেকে হবে বঞ্চিত। অথবা কারো সম্পর্কে বদদোয়া করার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি (যেমন নূহ (আ) থেকে বর্ণিত আছে) করবে, যার জন্য লাভ করবে অপমান ও লাঞ্ছনা।

কারী সাহেবদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরও দেখতে পাবেন যে, তারা তাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথেই সেই বিষয় নিয়ে হিংসা করবে, আল্লাহ্ পাক তাদের যে ফযীলতের সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত করেছেন। এমনকি এসব ব্যাপারে তারা এতদূর পৌঁছবে যে, তাদের এমন জঘন্য ও ন্যক্কারজনক পর্যায়ে নামিয়ে দেবে, যে পর্যায়ে কোন পাপাসক্ত বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও নামতে সক্ষম নয়।

সুফিয়ান সওরী (র) এ বিষয়টি অন্যভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি আমার জীবনের ব্যাপারে কারী এবং আলিম ব্যতীত আর কারও জন্য ভয় করি না। সওরী (র)-র মন্তব্য উপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট খুব খারাপ বোধ হওয়ায় তিনি বললেনঃ একথা আমি নিজ থেকে বলছি না—কথাটি বলেছেন ইবরাহীম নখয়ী।

হযরত আতা (র) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান সওরী (র) আমাকে বলেছেনঃ কারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করো— আর আমাকেও তাদের থেকে নিরাপদ রেখো। তা এইজন্য যে, যদি আমি তাদের বিরোধিতা করি, তাহলে একটি ফল নিয়েই আমার সাথে ঝগড়া শুরু করবে। আমি যদি বলি এটা মিষ্টি। তারা বলবে, এটা তেতো! এমনকি, আমার তো ভয় হয় যে, একথার জন্যই তারা আমাকে হয়তো জালিম বাদশাহ্র হাতে সমর্পণ করবে।

মালিক ইবনে দিনার বলেনঃ আমি সমস্ত মখলূকাতের বিরুদ্ধে কারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নিতে রাযী আছি। কিন্তু তাদের একজনের বিরুদ্ধে অপরজনের

সাক্ষ্য আমি কিছুতেই কখনো গ্রহণ করবো না। তার কারণ এই যে, অধিকাংশ কারীকেই আমি হিংসুটে পেয়েছি।

ফুযায়েল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছেনঃ কারীদের থেকে দূরে গিয়ে বাড়ী কিনবে। কারণ যদি আমার বা দলের কারো যদি সামান্য পদস্খলন ঘটে, তবে এরা আমাদের সম্মানহানি ঘটাবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা কোন নিয়ামত দান করেন, তাহলে এরা হিংসা করবে। মোটকথা, লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, কারীরা মানুষের সাথে অহংকার করছে। মুখ বিকৃত করে চোয়াল বিস্তৃত করে কথাবার্তা বলবে! মনে হবে, মানুষের উপর দু'রাকাত নফল নামায পড়ে তারা যেন ইহ্সান বিলিয়ে ফিরছে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে তমঘা কিংবা দোযখ থেকে মুক্তির সনদ লিখে এনেছে অথবা সৌভাগ্যশালী ও পূণ্যবান হওয়াটা তাদের জন্য নিশ্চিত আর অবশিষ্ট সমস্ত মানুষের জন্য দুর্ভাগ্য একেবারেই অবধারিত বলে নির্ধারিত হয়ে গেছে। (আল্লাহ্ তাদের থেকে রক্ষা করুন)

তাছাড়া, তারা সূফী-সাধক ও খাকসারদের পোশাক পরেও করবে বিলাসিতা। অহংকার ও বড়াই প্রকাশের জন্য তারা এ পন্থা বেছে নিয়েছে। ব্যাপারটি একেবারেই অশোভনীয়। কারণ, সূফী-সাধকগণ তাদের সমমর্যাদার তো ননই— এমনকি বলতে গেলে সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। কিন্তু অন্ধ তো আর চোখে দেখবে না।

বর্ণিত আছে, ফরকদ সঞ্জী একদা হযরত হাসান বসরী (র)-র নিকট আগমন করলেন। সে সময় হযরত হাসান (র)-এর পরনে ছিল 'জুব্বা' আর সঞ্জী জড়িয়ে এসেছিলেন একটি কম্বল। ফরকদ সঞ্জী সেখানে উপস্থিত হয়েই হাসান বসরী (র)-র গায়ের জুব্বায় হাত বুলাতে লাগলেন। এই দেখে হাসান বসরী (র) বললেনঃ আমার কাপড়ে কেন হাত বুলাচ্ছ? কি ব্যাপার? আমার কাপড় জান্নাতীদের কাপড়, আর তোমার কাপড় দোযখীদের কাপড়। আমি জেনেছি যে, দোযখের অধিকাংশ বাসিন্দাই হবে কম্বলওয়ালা। অতঃপর হাসান বসরী (র) আরও বললেনঃ দেখো ফরকদ! কাপড় তো দুনিয়া বর্জনকারীদেরই পরেছো, কিন্তু অন্তরে অহংকার আর বড়াই পরিপূর্ণ রেখেছ।

যুন্নুন মিসরী (র) বলেছেনঃ সাধারণ পোশাক পরিধান করো না। কারণ, তাতে মানুষ বিভ্রান্তিতে পতিত হবে। কেননা এমন বহু লোকও আছে, যারা

এমন পোশাককে অহংকারসহ পরিধান করে। তারা বিনয় প্রকাশের জন্য তা করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে থাকে অহঙ্কার। সুতরাং তাতে অহঙ্কারই প্রকাশ পায়। তবে খাকসারী পোশাকে অহঙ্কার ও বড়াই প্রকাশ পায় না। মোটা সোটা কাপড় পরো। তাহলে তোমাকে বিশ্বাসী বলে মনে হবে। এ ধরনের পোশাক পরিধানের উদ্দেশ্যও আমানতদারী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মোটকথা, হে লোক সকল! আলোচিত এ চারটি অভ্যাস পরিত্যাগ করো। বিশেষ করে অহঙ্কার থেকে বাঁচা চাই। কারণ, অবশিষ্ট তিনটি কেবল বিভ্রান্তিকর। যদি কখনো ভুলক্রমে তাতে কেউ লিপ্ত হয়, তাহলে নাফরমান হওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু অহংকার সম্পূর্ণ ধ্বংসকারী। কারণ, অহংকার মানুষকে কুফরী ও বিদ্রোহিতার অকূল সমুদ্রে নিমজ্জিত করে।

ইবলিসের ঘটনাটিকে কখনোই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করেছিল এবং অহংকার করেছিল। ফলে, সে কাফির হয়ে গেছে।

আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সকলের এ-ই হোক প্রার্থনা যে, আল্লাহ্! তুমি তোমার করুণায় সিক্ত করে আমাদের এ সব কু-অভ্যাস থেকে পরিত্রাণ করো।

বিশেষ কথা

পরিষ্কার কথা যে, হে মানুষ! তুমি যদি সুষ্ঠু বিবেক প্রয়োগে গভীরভাবে চিন্তা করো, তাহলে অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবে যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী মাত্র। এ থেকে যা লাভ হবে, তা এর ক্ষতিপূরণে যথেষ্ট নয়।

দুনিয়ার ধাঁধাঁয় নফসকে পেরেশান এবং দুনিয়ার ব্যাপারে অন্তরকে মশগুল করা প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের জন্য এমন কঠিন আযাব ও শাস্তির ব্যবস্থা করা, যা সহ্য করার কথা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

এ বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি এবং হৃদয়েপূর্ণভাবে গ্রথিত করে নিতে সক্ষম হওয়ার পর তাকে প্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বিষয় পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ও নিতান্ত দরকারী, কেবল তাই সে গ্রহণ করবে। এর বেশী কিছুতেই নয়।

সকল রাজার রাজা, সকল শক্তির একচ্ছত্র অধিকারী, সকল বিষয়ের উৎস ও আধার সেই পরম কারুণিক করুণাময় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য এবং অন্তত নিয়ামত

ভরা জান্নাতের আশায় তাকে অবশিষ্ট সকল নিয়ামত, সকল স্বাদ পরিত্যাগ করতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে, মখলূকের কেউই এবং কিছুই কৃতজ্ঞ নয়,বাজে-বেহুদা বিষয়ে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার চাইতে তাদের থেকে প্রাপ্ত বিপদাপদ ও দুঃখ-বেদনা অনেক বেশী। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত মানুষের সাথে মেলামেশাই পরিত্যাগ করতে হবে। মখলূকের যা ভাল, তা থেকে ফায়দা হাসিল করবে, কিন্তু যা মন্দ তা সযত্নে করবে পরিহার।

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা তাদের সাথেই হবে, যাদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসা দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা নেই। বরং এ ধরনের লোকের সেবা-যত্নের ব্যাপারে দ্বিধা করা উচিত নয়। এ ধরনের বুযুর্গদের সাথে উঠা-বসা, চিঠিপত্র প্রভৃতি মারফত সম্পর্ক অটুট রাখবে, যাতে সকল অবস্থায়ই তারা তোমার দৃষ্টিগোচর হয়— যা তোমার দুনিয়া ও আখিরাত-উভয় ক্ষেত্রেই কাজে লাগে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اَحْفِظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ حَيْثُ اتَّجَهْتَ -

আল্লাহ্ তা'আলার হকসমূহ রক্ষা করো, তাহলে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তাঁকে পাবে।

অপরপক্ষে একথাও সকলের উত্তমভাবেই জানা আছে যে, শয়তান একটা খাবিস অর্থাৎ দুষ্কৃতিকারী। সে তোমার শত্রুতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। সুতরাং সেই অভিশপ্ত কুকুর থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র আশ্রয় হাসিল করতে হবে। সাবধান! শয়তানের ধোঁকা ও দাগা সম্পর্কে অসতর্ক হয়ো না। সে অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দেবে। শয়তানের কথায় কখনো ভয় পাবে না। কারণ তুমি যদি সত্য পথে দৃঢ় হও— তোমার দৃঢ়তা যদি খাঁটি হয়, তবে সে কিছুই করতে পারবে না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ-

তার রাজত্ব কিছুতেই সে সব লোকের উপর চলতে পারে না, যাঁরা ঈমানদার এবং তাদের পরওয়ারদেগারের উপর নির্ভরশীল।

আবূ হাতিম (র) সত্যই বলেছেনঃ দুনিয়া ও শয়তানের অস্তিত্ব কোথায়?

দুনিয়ার যে অংশ অতীত হয়েছে– তা স্বপ্নে পরিণত হয়েছে, যা বাকী আছে, তাও আশা ব্যতীত আর কিছু নয়। আর শয়তান– আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তার অনুসরণ করা হয়েছিল, তাতে কোন ফলোদয় হয়নি। শয়তানের কথা অনেকেই শোনেনি, তাদেরও কোন ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া নফসের অজ্ঞতা ও বিদ্রোহ এবং তার ফলে ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে সেসব বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতামত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত, যারা এ সবের পরিণতি সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিফহাল। এ পন্থাটিই তোমার জন্য উত্তম বলে প্রমাণিত হবে। কোন বিষয়েই বালকের ন্যায় স্থুল দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত নয়। এ ধরনের লোক বিপদের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে না এবং তেতো ঔষধের নাম শুনে পলায়ন করে। নফসকে তাকওয়ার লাগাম পরিয়ে দাও। অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কিছু গ্রহণ থেকে বিরত থাকো।– সে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাই হোক আর খাওয়া-দাওয়ার বিষয় হোক অথবা অপ্রয়োজনে কোন দিকে দৃষ্টি ফেলাই হোক। বদ অভ্যাসের দরুন কোন বিষয়ে সন্দেহ ও ধোঁকায় পতিত হয়ো না। অতিরিক্ত আশা, কাজে তাড়াতাড়ি, হিংসা এবং অহংকার ও দম্ভের যেখানে প্রয়োজন নেই, সেখানে তা প্রকাশ করা কিংবা কেবলমাত্র খারাপ উদ্দেশ্য এবং কামনার ইন্ধন যোগাবার জন্যই খাওয়া-দাওয়া– এসব পরিত্যাগ করো। নফসের কেবল সেসব বিষয়েই লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দাও, যা না হলে কিছুতেই চলে না এবং যেসব বিষয়ে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। এজন্য যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের তাঁর রহমতের ছায়ায় স্বাচ্ছন্দ্য দান করে থাকেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে যেসব বিষয় ক্ষতিকারক, তা থেকেও রক্ষা করেন। সুতরাং এর বেশীর কোন প্রয়োজনই তোমার করে না।

কোন কোন সালেহীন যেমন বলেছেন যে, তাকওয়া খুব সহজ ব্যাপার, তাই-ই প্রকৃতপক্ষে সঠিক। যখন কোন জিনিসকে বিভ্রান্তিকর প্রতীয়মান হয়, তা সযত্নে পরিহার করবে। কারণ, নফস এমন যে, একবার কোন কিছুতে লিপ্ত হলে তা আর ছাড়তে চায় না। নফসে যে বিষয় অভ্যাস হয়ে উঠে, তা দূর করা অসুবিধাজনক।

কোন ব্যক্তি বলেছেনঃ নফসে কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলে যদি দমন না করা হয়, তাহলে তৎপ্রতি নফস আসক্তি প্রবণ হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে, সামান্য

জিনিসকেই যদি যথেষ্ট মনে করা হয়, তাহলে নফস তাতেই সন্তুষ্ট থাকায় অভ্যস্ত। নফস এমন যে, একে যে কোনরূপ করে গড়ে তোলা যায়। যত বোঝা-ই এর উপর চাপাও, এ তাই বহন করবে, যত বেশী মুসীবতই সহ্য করো, ততই তা মুসীবত বরদাশত করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। একে যে অভ্যাসই করানো যাবে, সে সে অভ্যাসেই অভ্যস্ত হবে।

অপর এক ব্যক্তি বলেছেনঃ আমি আমার নফসকে স্বাদ গ্রহণ ও কামনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত রেখেছিলাম। অবশেষে তার কামনা ও স্বাদ গ্রহণের ইচ্ছাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমি তার প্রতিটি বাসনার সামনে বাধা দাঁড় করেছি– সে তাই মেনে নিয়েছে। নফসকে তুমি যেভাবে, যে কাজে লাগাতে চাইবে, সে তা-ই করবে। তুমি কোন কিছু করতে চাও– নফস সে আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করবে। নতুবা সে নিশ্চুপ পড়ে থাকবে।

মোটকথা, এসব বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করলে তুমি সহজেই দুনিয়া বর্জনকারী এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হতে সক্ষম হবে।

মনে রাখবে, শত প্রশংসা তাদেরই প্রাপ্য, যারা (যাহিদ) দুনিয়া বর্জনকারী হতে পেরেছে। এই মর্যাদা অর্জনের পরই তুমি সেই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, যারা নিজেদের জীবনকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও খেদমতে উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছেন। এমন অবস্থায় উপনীত হলেই তোমার জীবন হবে সার্থক– জীবন হবে ধন্য।

কোন এক ব্যক্তি বলেছেনঃ একদল তো দুনিয়ায় লিপ্ত হয়ে তার চক্করেই মেতে গেছে। অপর একদল পরওয়ারদিগারের জন্য দুনিয়া থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। শেষোক্ত দলই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র খোশনুদীকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে সমস্ত মখলূক থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাতের নিস্তব্ধ ধরণীর বুকে যখন তারা কাতার বেঁধে দণ্ডায়মান হয়, তখন আল্লাহ্‌র রহমতের দৃষ্টি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে। এমন মহিমান্বিত দলই খুশীর মকামে পৌঁছতে সমর্থ– তখন তাদের জন্য নেমে আসে আনন্দের সওগাত–খোশখবরী। তাদের সকল দিক থেকে জানানো হয় মোবারকবাদ আর শান্তি।

এভাবেই তুমি সেই শ্রেণীর দুনিয়া বর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হবে, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যত্নবান এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ শ্রেণীর বান্দার অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ -

সত্যিই আমার যারা বান্দা, তাদের উপর তোমার (শয়তানের) কোন শাসন (আদৌ) কার্যকরি হবে না।

এখন তোমাকে সেই তাকওয়া ওয়ালাদের মধ্যে গণ্য করা হবে, যারা লাভ করেছেন দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য ও সৌভাগ্যের সনদ। এমনকি বহু ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের চাইতেও তোমার মর্যাদা হবে বেশী। কারণ, ফেরেশতাদের মধ্যে তো কামনাই বিদ্যমান নেই, সুতরাং তাদের খারাপ ও মন্দ কাজে প্ররোচনা দেবে কে? তেমনি তারা দুষ্কৃতিশীল নফস থেকেও মুক্ত, সুতরাং তাদের দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু তুমি তো এর সব কিছুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সব কিছুকে অতিক্রম বা পরাজিত করেছো। সুতরাং তুমিই ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছি এই জন্য যে, তিনি সকল প্রার্থনা কবূল করার অধিকারী। প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, সেই সৌভাগ্য-মকামে পৌছবার তওফীক দান করেন। তিনিই সকল ব্যাপারে যথেষ্ট, তাঁরই সহায়তায় সকল বিপদ-সংকট অতিক্রম করা যেতে পারে— অন্যথায় নয়।

সপ্তম সোপান

রিযিকের প্রশ্নে নির্ভরতা

এরপর আল্লাহর ইবাদত আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির জন্য সে সব বাহ্যিক বাধা অতিক্রম করা প্রয়োজন, যেগুলি আল্লাহ্র ইবাদতে কেবল বাধার সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় না বরং ইবাদতের রাস্তাই বন্ধ করে দেয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই শ্রেণীর বাধা চার প্রকারের।

প্রথম বিষয়ঃ রিযিক ও তার অনুসন্ধান

একমাত্র ভরসার দ্বারাই এই ঘাঁটি অতিক্রম করা যেতে পারে। এইজন্য রিযিক, রুযী–রোজগার এবং অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা অর্জন করতে হবে। দু'টি কারণে এ নির্ভরশীলতা অর্জন করা প্রয়োজন হয়।

প্রথমত, ইবাদতে-ইলাহীর জন্য সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাওয়া এবং নেক বিষয়সমূহের বিধিসমূহ পুরোপুরি পালন করা। যদি এতে নির্ভরশীলতার মহিমা সৃষ্টি না হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মানসিক স্থিতির অভাব থাকে এবং রিযিকের ধাঁধাঁ কৌশলে বাহ্যিক অথবা গোপন পন্থায় সক্রিয় থাকে কিংবা সাধারণের ন্যায়ই শারীরিক কামাইয়ে লিপ্ত থাকতে হয় অথচ ইবাদতে-ইলাহীর ব্যাপারে চেষ্টায় যারা ব্যস্ত, তাদের ন্যায়ই রিযিকের ধাঁধাঁ ইবাদতকারীকে সন্দেহ এবং ধোঁকায় নিপতিত করে। অথচ, ইবাদতের জন্য মনের দিক থেকে যেমন, তেমনি শারীরিক দিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, তা না হলে

ইবাদতের হকসমূহ পুরোপুরি আদায় করা যায় না। আর কেবলমাত্র নির্ভরশীল ব্যক্তিই সকল ব্যাপার থেকে মুক্ত হতে পারেন।

বরঞ্চ অমি তো বলি যে, সকল দুর্বল মনের অধিকারী, দুনিয়ার সামান্য জিনিস ব্যতীত যাদের অন্তর সন্তুষ্ট হয় না, তাদের দ্বারা দুনিয়া এবং আখিরাত— উভয় ক্ষেত্রেই কোন মহৎ কর্ম সম্পাদন সম্ভব নয়।

আমার উস্তাদ শায়খ আবূ মুহাম্মদ (র)-কে বারবার বলতে শুনেছি যে, দুনিয়ায় দুই শ্রেণীর মানুষই অধিক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়। নির্ভরশীল অথবা নির্ভর। আর কোন প্রকারভেদে যে ব্যক্তি কর্মে নিরত।

আমার উস্তাদের এ মন্তব্যটি ব্যাপক অর্থবহ। কারণ, বেপরোয়া ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বাভাবিক শক্তি ও মনের সাহসের উপর নির্ভর করে কর্মের সংকল্প গ্রহণ করে। এজন্য তার সংকল্প থেকে কেউ যেমন তাকে টলাতে পারে না, তেমনি ধোঁকা দিয়েও কেউ তার কর্মশক্তিকে দুর্বল করতে সক্ষম হয় না। ফলে, নির্ভয়ে ও নিঃশংকচিত্তে সে নিজের ‑কল কর্ম সম্পাদন করতে থাকে। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিও আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি অটল ভরসাসহ বিপুল শক্তি ও দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজে অগ্রসর হয়। সুতরাং সে কোন মানুষের উপর নির্ভর করে না। ফলে, কেউ তাকে বিব্রতও করতে সক্ষম হয় না। এমনকি, শয়তানের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধোঁকাবাজও তার উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বস্তুত এ ধরনের মানুষ তার উদ্দেশ্যে সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং অবশ্যই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে।

অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি দুর্বল সে তো সব সময় সন্দেহ, দ্বিধা ও সংকোচের আবর্তে পেরেশান। গাধা যেমন দেওয়াল-ঘেরা চারণক্ষেত্র এবং মুরগী যেমন খাঁচার মধ্যেই চক্কর দিতে থাকে, এ ধরনের মানুষও তেমনি সন্দেহ, ভয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে সব সময় আবর্তন করতে থাকে। তার যে মনিব সাজে, সে তাকে যা দেয়, তার দ্বারাই জীবন যাপন করতে থাকে— এর মধ্যে আর কোন ব্যতিক্রম সে করতে সাহসী হয় না। কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই বিদ্যমান থাকে না। ফলে সাহস বলতে যা কিছু তা সম্পূর্ণ বিলোপ হয়ে যায়। সে কোন মহৎ কর্ম-সাধনের সংকল্প পর্যন্ত করবার ক্ষমতা রাখে না। আর যদি কখনো বা সংকল্প করেও, তাতে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয় না।

তোমরা কি ভেবে দেখছো না যে, নফস, সম্পদ ও প্রাণ সম্পর্কে উদাসীন না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়াতে কোন মানুষ কখনো কোন উচ্চ মর্যাদা অর্জন বা বিরাট কোন কীর্তি সাধন করতে সক্ষম হয় না। লক্ষ্য করুন, যিনি রাজত্ব লাভ করেন, তাকে কি করতে হয়? যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, শত্রুকে পরাজিত করতে হয়, নিজের জীবনকে ঝুঁকির সম্মুখীন করতে হয় সর্বদা। তবেই না মিলে রাজত্ব।

বর্ণিত আছে, সিফ্ফীনের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষের সৈন্য দাঁড়িয়ে গেছে তখন মু'আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা) সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ যারা বড় কিছু চায়, তাদের নিজের জীবন নিয়েও বড় কিছু করতে হয়।

লক্ষ্য করুন, নাবিক ও সওদাগর সমুদ্রে যাতায়াতকালে নিজের জীবনকে কিভাবে বিপন্ন করে? এক দেশ হতে অন্য দেশে সওদা নিয়ে ফিরতে গিয়ে তাদের জীবনকে সর্বদাই হাতের তালুতে রাখতে হয়। তবুও তারা তা করে। তারা সর্বদাই দু'টি জিনিসের জন্য প্রস্তুত থাকে– একটি যে কোন মুহূর্তে প্রাণ হারানো অথবা পুরোপুরি লাভ। ফল এই হয় যে, তারা পুরোপুরিই লাভবান হয়, বিপুল সম্পদ লাভ করে, হয় বিত্তশালী। কিন্তু দুর্বল চিত্তের অধিকারী নাবিক সংকল্পেও হয় দুর্বল। সে তার মনকে কিছুতেই তার নফস ও সম্পদ থেকে আলাদা করতে পারে না। তার জীবনের আয়ু গৃহ থেকে দোকানে আসা-যাওয়ার মধ্যে ব্যয়িত হয়। সুতরাং সে বাদশাহ্র ন্যায় যেমন উচ্চ-মর্যাদাও হাসিল করতে পারে না, তেমনি পারে না বিপদজনক সওদাগরের ন্যায় অঢেল সম্পদ সংগ্রহ করতে। বাজারে যদি কিছুটা সুবিধা হয়, তাহলে হয়তো দু'চার পয়সা লাভ হতেও পারে, আর তাই-ই– তার জন্য যথেষ্ট। কারণ তার মন এক পরিচিত পন্থা, এক পরিচিত এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ– এর বাইরে তার দৃষ্টি যায় না। দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের ব্যাপারে এই-ই হয়ে থাকে।

তেমনি আখিরাত-ওয়ালাদেরও প্রধান সম্পদ হলো এ নির্ভরশীলতাই। আর সকল প্রকার দুশ্চিন্তা এবং সকল আকর্ষণ থেকে নিজের অন্তরকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া। যখন কেউ এ ব্যাপারে স্থিতি অর্জন ও দৃঢ় হয়ে যেতে সক্ষম হয়, তখন সে ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য মুক্ত হয়ে যাওয়া। এমতাবস্থায় পৌঁছে তিনি মখলূক থেকে আলাদা, পৃথিবীতে ভ্রমণ, দুনিয়ার যে কোন প্রান্ত, পাহাড় বা জংগলকে নিজের আবাসস্থল করে নিতে প্রস্তুত হয়। ফল এই হয় যে, তিনি মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর হয়ে যান, তিনি ধর্মীয় গূঢ়তা অর্জন

করতে সক্ষম হন এবং তিনিই হন 'স্বাধীন মানুষ'। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধরণীর আসল বাদশাহ হয়ে যান। যেখানে খুশী চলে যান, যেখানে খুশী শয়ন করেন আর যেখানে খুশী করেন বিচরণ। বড় বড় কাজের জ্ঞান অর্জন, ইবাদতের যে কোন পর্যায়ে অবতরণ এবং যে কোন সংকল্প করার ক্ষমতায় হন তিনি অধিষ্ঠিত। তাঁর জন্য সকল স্থান এক সমান, সকল সময় এক রূপ ধারণ করে। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّكُوْنَ اَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَ كَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ سَرَّ

اَنْ يَّكُوْنَ اَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَمَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّكُوْنَ اَغْنَى النَّاسِ

فَلْيَكُنْ بِمَا فِىْ يَدِ اللّٰهِ اَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِىْ يَدِهِ-

যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর হতে চায়, তাকে আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে। যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সম্মানী হতে চায়, তাকে আল্লাহ্ তা'আলার তাকওয়া ইখতিয়ার করতে হবে। আর যে ব্যক্তি মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিজেকে উর্ধ্বে রাখতে চায় তার উচিত হবে তার নিজের সম্পদের পরিবর্তে রিযিক ও মাল সম্পর্কে আল্লাহ প্রদত্ত ওয়াদার উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়া।

সোলায়মান খাওয়াস (র) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি সর্বান্তঃকরণে এবং সততার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে, তবে সমস্ত আমীর-ওমরাহও তার মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। কারণ এই যে, এ ব্যক্তি কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, যিনি সকল অভাব-অনটনের উর্ধ্বে।

ইবরাহীম খাওয়াস (রা) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেছেনঃ এক বিজন প্রান্তরে একটি বালকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাঁর চেহারা চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও মাধুর্যময়। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কোথায় চলেছ হে বালক ? সে জবাব দিলঃ মক্কা মোয়াজ্জমায় চলেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এ সম্বলহীন অবস্থায় এবং বিনা যানবাহনে? সে বললোঃ ওহে দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী! যিনি আসমান ও যমীনের হিফাজতের ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর নিশ্চয়ই এ ক্ষমতা আছে যে, তিনি আমাকে বিনা সম্বলে এবং বিনা যানবাহনে মক্কায় পৌঁছিয়ে দেবেন।

ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেনঃ অতঃপর আমি যখন মক্কায় পৌঁছলাম, দেখি যে, সে বালক বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করছে। মুখে তাঁর উচ্চারিত হচ্ছেঃ 'ওহ্ নফ্স! তুই হরদম বিপদে পতিত থাকিস এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে তোর উপর জয়ী হতে দিস না। হে নফ্স! পেটের জ্বালায়ই মরে যা।

অতঃপর বালকটি ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেয়ে বললোঃ ওহে শায়খ! দুর্বলতাই আপনাকে এত পেছনে ফেলেছিল।

আবূ মুতঈ (র) হাতিম আসিম (র)-কে বলেছিলেনঃ আমি জানতে পেরেছি যে, সম্বলহীন অবস্থায় তুমি নাকি জংগলে কেবল (তাওয়াক্কাল) নির্ভরতার দ্বারাই দিন কাটাও? হাতিম আসিম (র) জবাব দিলেনঃ আমার চারটি সম্বল আছে। তিনি বললেনঃ কি কি? হাতিম আসিম (র) বললেনঃ আমি মনে করি যে, দুনিয়া ও অখিরাতের সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার রাজত্বের আওতাধীন, সমস্ত মখলূক আল্লাহ্র দাসত্ব ও প্রতিপালন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। আমি জানি যে, সমস্ত রিযিক ও উপায়-উপকরণ ও কার্যকরণ— সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অধীন এবং আমি নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ বা বিধি-ব্যবস্থাই সমস্ত দুনিয়ায় কার্যকরী।

কোন এক ব্যক্তি কি সুন্দরই না বলেছেনঃ 'দুনিয়া' বর্জনকারীদের আমি আরাম-আয়েশে আনন্দিত দেখি। তাদের অন্তরই দুনিয়ার সকল স্বাদ গ্রহণ করছে। যখন তুমি তাদের দিকে দৃষ্টি ফেলবে, তখন দেখতে পাবে যে, তাদের দলটিই দুনিয়ার হয়ে গেছে। এ ধরনের লোকের বিশেষ নিদর্শন হলো জরাজীর্ণ অবস্থা।

এ ব্যাপারে (রিযিক ও রুযী রোজগারে ভাবনা মুক্তি) আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করার দ্বিতীয় কারণটি এই যে, আল্লাহর উপর ভরসা যদি পরিত্যক্ত হয়, বিপদের আশঙ্কা অধিক এবং মহাসংকটে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা কি মখলূকের সাথে রিযিককে সংশ্লিষ্ট বলে বাতলিয়ে দেন নি? তিনি বলেনঃ- خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

আমি সৃষ্টি করেছি এবং আমিই রিযিক দিয়ে থাকি।

একথা তো সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ রিযিকদাতা নেই। তিনি যেমন মখলূক সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি তাদের রিযিক দানের ওয়াদাও

করেছেন। এজন্য তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, এ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং রিযিক দানের বিষয়ও ঘোষণা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰه هُوَ الرَّزَّاقُ -

আল্লাহ্ স্বয়ং সকলকে রিযিক দিয়ে থাকেন।

অতঃপর এই ওয়াদা দিয়েই ক্ষান্ত দেননি, বরং নিজের যিম্মাদারীও বর্ণনা করেছেনঃ

ومَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُها -

এ ধরণীতে বিচরণকারী এমন কোন জীব বা প্রাণী (খাদ্য ছাড়া যে বাঁচে না) নেই, যার রিযিকের যিম্মা আল্লাহ্ গ্রহণ করেন নি।

এরপর আর একটু অগ্রসর হয়ে রিযিকদানের ব্যাপারে শপথ করে বলেছেনঃ

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ-

এসবের জন্য আসমানে সময় নির্ধারিত আছে। সুতরাং আসমান ও যমীনের পরওয়ারদিগারের কসম, তিনিই সত্য, যেমন তোমরা কথাবার্তা বলতে সক্ষম। (সূরা যারিয়াতঃ ২৩)

এতেও আল্লাহ পাক যথেষ্ট মনে করেন নি, বান্দাকে পূর্ণ নির্ভরশীলতার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভরসা না করা সম্পর্কে সাবধান করে ভয় দেখিয়ে বলেছেনঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ الْحَيِّ الَّذِىْ لاَيَمُوْتُ -

সেই চিরঞ্জীব আল্লাহ্র উপর ভরসা করো, যাঁর মৃত্যু নেই।

আরও বলেছেনঃ

وَعَلَى اللّٰه فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করো।

তাহলে কি আল্লাহ্ তা'আলার কথার উপর নির্ভর করা যাবে না? (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁর ওয়াদাকে যথেষ্ট মনে করা হবে না? তাঁর যিম্মাদারীতে কি সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়? তাঁর শপথ কি যথেষ্ট মনে করা হবে না? তবে কি তাঁর নির্দেশ, তাঁর ওয়াদা এবং তাঁর সাবধান বাণীর কোনই পরোয়া করা হবে না? সুতরাং চিন্তা করে দেখো, আল্লাহ্র উপর ভরসা হারালে কি অবস্থা হবে। আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতাহীন পরিশ্রম ও সাধনা কি ফল বহন করে আনবে? আল্লাহ্র কসম, এ নিয়ামত হারানো একটি মহাবিপদ। কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে অসতর্ক হয়েই আজ এমন পেরেশানীতে ধুঁকে মরছি।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্ন উমর (রা)-কে বলেছিলেনঃ

كَيْفَ اَنْتَ اِذَا بَقِيْتَ بَيْنَ قَوْمٍ يُنْجُؤْنَ رِزْقَ سَنَتِهِمْ لِضَعْفِ الْيَقِيْنِ -

তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন তুমি এমন একদল মানুষের মধ্যে অবস্থান করবে, যারা বিশ্বাস ও ঈমানের দুর্বলতার দরুন সারা বছরের রিযিক গোপন করে রাখবে?

হযরত হাসান (র) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাক সেই জাতিকে অভিশপ্ত করুন, যারা তাদের জন্য আল্লাহ্ পাক নিজে শপথ করা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি। কেননাঃ

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ-

(সূরা যারিয়াতঃ ২৩)

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ বলেছিলেনঃ মানব জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ, তারা তাদের পরওয়ারদিগারকে অসন্তুষ্ট করে দিয়েছে— এমনকি, তাদের রিযিক সম্পর্কে তাঁকে শপথ পর্যন্ত করতে হলো।

হযরত ওয়ায়েস করনী (র) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেছেনঃ তুমি আসমান ও যমীনে যতজন আছে একাই তাদের সকলের সমান আল্লাহ্র ইবাদত করো না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাঁকে সত্য বলে না জানবে, ততক্ষণ তোমার সে ইবাদত কবূল হবে না। তাঁকে সত্য জানা কিভাবে সম্ভব? এভাবে সম্ভব যে,

আল্লাহ্ তা'আলা তোমার রিযিক সম্পর্কে যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তার উপর ভরসাকারী ও নির্ভরশীল হতে হবে। আর নিজের তন-মনকে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য স্বাধীন (সবকিছু থেকে আলগা) করে নিতে হবে।

ওয়ায়েস করনী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইবৃন হাব্বানা (র) দুর্বল হয়ে গেছেন। তাঁকে কোথায় রাখা ঠিক হবে? এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে সিরিয়ার প্রতি নির্দেশ করলেন— সে দেশে। তখন তাঁর নিকট আরয করা হলো যে, তিনি তো অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। সুতরাং জীবিকার্জনের পন্থা কি হবে? একথা শুনে ওয়ায়েস করনী (র) বললেনঃ আফসোস এসব অন্তঃকরণের অধিকারীদের জন্য। এগুলোতে সন্দেহ আসন গেড়ে বসেছে। নসীহতের কথা কি করে এগুলোতে প্রভাব বিস্তার করবে?

আমি জানতে পেরেছি— এক কাফন চোর আবূ ইয়াযিদ বোস্তামী (র)-র হাতে তওবা করেছিল। তিনি চোরকে তার সকল বৃত্তান্ত বলতে নির্দেশ দিলে চোর বললোঃ আমি এক হাজার কবর থেকে কাফন চুরি করেছি। এক হাজার কবরের লাশগুলির মধ্যে দুইটি ব্যতীত সবগুলিকেই কেবলা থেকে মুখ ফেরানো অবস্থায় পেয়েছি। এ কথা শুনে বোস্তামী (র) বলেনঃ এরা অতি হতভাগ্য। কারণ, রিযিকের তালাশ ও রিযিকের চিন্তাই তাদের অমন করে কেবলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছে।

আমাকে আমার কতিপয় সাথী বর্ণনা করেছেন। তারা কোন নেক ও বুযুর্গ ব্যক্তি পেলে জিজ্ঞাসা করতেনঃ ঈমানকে সংরক্ষিত রাখতে পেরেছেন কি? —এ কথার উত্তরে তারা বলতেনঃ ঈমান তো কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসাকারী ও নির্ভরশীলদের নিকট সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকতে পারে।

আমি আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত করছি, তিনি যেন তাঁর করুণা দিয়ে আমাদের অবস্থা দোরস্ত করেন এবং আমরা যে অবস্থায় আছি তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করেন।

নির্ভরশীলতার প্রকৃত অর্থ কি?

তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আলোচনাকে চার ভাগে বিভক্ত ক যায়। প্রথমত, তাওয়াক্কুল-এর অর্থ, দ্বিতীয়ত, তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতার স্থ ও সময়, তৃতীয়ত, তাওয়াক্কুলের পরিচয় এবং চতুর্থত, শ্রেণীবিভাগ।

প্রথম বিষয়ঃ تـوكل তাওয়াক্কুল শব্দটি 'ওকালাত' وكالت ধাতু থেকে নির্গত। تـفعل হলো এর مصدر। সুতরাং কারো উপর সেই ব্যক্তি 'তাওয়াক্কুল' বা নির্ভর করতে পারে, যে কাউকে নিজের 'উকিল' মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে উকিল তার সকল কর্মই সম্পাদন করবেন, তার সংশোধনের যামিন এবং বিনা দ্বিধায় ও বিনা অজুহাতে তার সবকিছু আঞ্জাম দিবেন। এই- ই হল তাওয়াক্কুলের শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ তাওয়াক্কুল তিন স্থানে প্রয়োগ হয়। প্রথমত, বিতরণের স্থানে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করা যে, তিনি তোমার জন্য যতটুকু রিযিকের প্রয়োজন, তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তাতে কোনক্রমেই সামান্যতমও পরিবর্তন হতে পারে না। এ কথাটাই সব সময় স্মরণ রাখা দরকার এবং তদনুযায়ী জীবন নির্বাহ করা উচিত। দ্বিতীয় স্থান সাহায্যের অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সাহায্যের উপর পূর্ণ ভরসা থাকা উচিত। যখন তুমি আল্লাহ্র ইবাদতের ইচ্ছা কর তখনও তাঁরই সাহায্য সম্পর্কে পূর্ণ ভরসা রাখবে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

وَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

যখন তুমি (ইবাদতের) দৃঢ় সংকল্প করো, তখন তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করো।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেনঃ

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ -

যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে সাহায্য করো, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।

আল্লাহ্ পাক পুনরায় ইরশাদ করেছেনঃ

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের জন্য কর্তব্য বিশেষ।

উপরিউক্ত আয়াতে সাহায্যের অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে— এমন প্রতিশ্রুতি যা অবশ্যই প্রতিপালিত হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা অবশ্য কর্তব্য।

তৃতীয় বিষয় রিযিক ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল। অর্থাৎ যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং খিদমতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন তোমার রিযিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর যামিন আল্লাহ্ স্বয়ং—এ নির্ভরশীলতা অর্জন করতে হবে।

কারণ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ -

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا -

তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে যেভাবে ভরসা করা দরকার— তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের সেভাবেই রুযী পৌছাতেন, যেভাবে তিনি রিযিক দিয়ে থাকেন পক্ষীসমূহকে— তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়, আর সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে পরিতৃপ্ত হয়ে (ভরা পেটে)।

এ ক্ষেত্রেও ভরসা করা বান্দার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কারণ এ ক্ষেত্রে ভরসা করার বিষয় যুক্তি ও শরীয়ত— উভয় দিক থেকেই প্রমাণিত। তাছাড়া, রিযিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার দরকার হয় বেশী। এ ক্ষেত্রে ভরসাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তুও তাই।

সুতরাং রিযিকের ব্যাপারে ভরসা করাই প্রকৃত ভরসা করা। রিযিকের অর্থ বলতে এখানে সেই রিযিককেও বোঝানো হয়েছে, উলামায়ে কিরামগণ যেভাবে রিযিকের পরিচয় দান করেছেন। কিন্তু রিযিকের শ্রেণীসমূহ বর্ণনার পূর্বে বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তজ্জন্য তাও বাতলিয়ে দেয়া হচ্ছে। মনে রাখবে, রিযিক চার প্রকার।

রিযিকে মযমূন, রিযিকে মকসূম, রিযিকে মমলূক এবং রিযিকে মওউদ। রিযিকে মযমূনঃ এ রিযিক বলতে বোঝায় খাদ্য এবং সে সকল জিনিস, যার উপর মানুষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং যা না হলে মানুষের পক্ষে জীবন ধারণ সম্ভব নয়– এ সবগুলিই জরুরী। আল্লাহ্ তা'আলা যে রিযিকের যিম্মাদারী নিয়েছেন, এটাই সেই শ্রেণীর রিযিক। যুক্তি ও শরীয়তের প্রমাণাদি অনুযায়ী এ শ্রেণীর রিযিকের ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা ওয়াজিব এবং জরুরী। তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ পাক আমাদের শরীরকে তাঁর ইবাদত ও খিদমতের জন্য বানিয়েছেন। সুতরাং, সে শরীরের দুর্বলতা যাতে পূরণ হয়, এতটুকু রিযিকের যিম্মাদারীই তাঁর উপর। কারণ, তাহ্লেই আমাদের যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আদায় হওয়া সম্ভব।

কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি এর কারণ স্বরূপ তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেনঃ তিনটি কারণে বান্দার রিযকের যিম্মাদারী আল্লাহ্র উপর বর্তে। প্রথমত তিনি সরদার। আমরা তাঁর দাস। সরদারদের উপর তাদের গোলামদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো কর্তব্য বলে পরিগণিত– যেমন কর্তব্য গোলামদের তাদের সরদারের খিদমত করা।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে রিযিকের মুখাপেক্ষী করেই সৃষ্টি করেছেন। রিযিকের অনুসন্ধানের জন্যও তিনি কোন পন্থা নির্ধারণ করে দেননি। মানুষ জানেই না যে, কোন্ জিনিসে তাদের রিযিক আছে, তাদের রিযিক কি এবং কবে তা পাওয়া যাবে? যদি তা জানতে পারতো তাহলে নির্ধারিত স্থান থেকে তা অর্জন করে নিতে পারতো এবং যখন সেই নির্ধারিত স্থানে পৌঁছা দরকার, ঠিক সে সময় তথায় উপস্থিত হতো। সুতরাং বান্দার রিযিকের ন্যূনতম দাবি মেটানো ও তা সরবরাহ করা একটা কর্তব্য বিশেষ।

তৃতীয়ত, আল্লাহ্ পাক মানুষকে খিদমত ও ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ, রিযিকের অনুসন্ধান সে কাজে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং বান্দা যাতে ইবাদতের জন্য মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যেতে পারে তজ্জন্য তার রিযিকের ব্যবস্থা করা আল্লাহ্র জন্য জরুরী। এসব কথা সে-সব ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহ্ ভেদ জানেন না এবং বলে থাকেন যে, রিযিক দান আল্লাহ্র জন্য ওয়াজিব। তাদের এ দাবি আসলে ভুল। আমি অন্যত্র এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে অত আলোচনা সম্ভব নয়।

রিযিকে মকসূমঃ এটা সেই রিযিক, যে রিযিক আল্লাহ্ তা'আলা বণ্টন করে দিয়েছেন এবং 'লওহে মাহ্ফূজে' তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোন্ মানুষ কতটুকু খাবে, পান করবে এবং পরবে, তা সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর তার রিযিকের মেয়াদ কত হবে, তাও সেখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে কোনক্রমেই হ্রাস-বৃদ্ধি বা আগ-পাছ কিছুই সম্ভব নয়। সেখানে যা কিছু লেখা হয়েছে, তার কিছুতেই কোনক্রমেই সামান্য পরিবর্তন হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

اَلرِّزْقُ مَقْسُوْمٌ مَفْرُوْغٌ مِنْهُ لَيْسَ تَقْوٰى تَقِىٍّ بِزَائِدِهٖ وَلَا فُجُوْرُ فَاجِرٍ بِنَاقِصِهٖ -

রিযিক লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ ব্যাপারে (মাথা ঘামাবার কিছু নেই) ফারাগত হাসিল হয়েছে। কোন মুত্তাকীর তাকওয়া তাতে কিছু বেশী বা কোন ফাজেরের দুষ্কৃতি তাতে কিছু কম - কোনক্রমেই করতে সক্ষম হবে না।

রিযিকে মমলূকঃ দুনিয়ার সম্পদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া, প্রত্যেক মানুষই যার অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, (যার জন্য যে পরিমাণ নির্ধারিত) তারা তার অধিকারী। এটাও আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত রিযিক। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ -

আমি তোমাদের যে জিনিসের অধিকারী করেছি, তা থেকে খরচ করো।

রিযিকে মওউদঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের জন্য 'তাকওয়ার' শর্ত-সাপেক্ষে নিশ্চিতভাবে বিনা চেষ্টায়ই রিযিক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ভয় রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বিপদ থেকে মুক্তির একটা পথ করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক সরবরাহ

করেন, যে স্থান সম্পর্কে সেই ব্যক্তি ধারণা করতেও সক্ষম নয়।

(সূরা তালাকঃ ২-৩)

রিযিকের চার শ্রেণীর বিষয়ই বর্ণিত হলো। মনে রাখতে হবে যে, 'তাওয়াক্কুল' কেবলমাত্র রিযিকে মযমূনের ক্ষেত্রেই ওয়াজিব।

তাওয়াক্কুল-এর পরিচয়ঃ আমাদের কোন কোন বুযুর্গ বলেছেনঃ সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দিকে অন্তঃকরণ কেন্দ্রীভূত করাকে 'তাওয়াক্কুল' বলে। আবার কেউ কেউ বলেছেনঃ উপযুক্ত সময়ে অন্য কোন জিনিসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বা সংযোগ বিলুপ্ত করে দিয়ে অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক স্থাপন করা । শায়খ আবূ আমর (র) বলেছেনঃ 'তা'ল্লুক' পরিত্যাগের নামই 'তাওয়াক্কুল'। 'তা'ল্লুক' হলো আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন জিনিসে নিজের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করা।

আমার ওস্তাদ বলেছেনঃ 'তা'ল্লুক' এবং 'তাওয়াক্কুল' দুই প্রকারের যিকর। 'তাওয়াক্কুল' আল্লাহ্ তা'আলাকে ধ্যানে রেখে নিজের বাসস্থান সম্পর্কে চিন্তা করা। আর 'তা'ল্লুক' হলো আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন জিনিসকে ধ্যানে রেখে নিজের জীবন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা।

এ সম্পর্কে অবশিষ্ট সকল অভিমতের একই উৎস বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়। সেই উৎসটি হলোঃ নিজের অন্তঃকরণকে এ ব্যাপারে দৃঢ় করা যে, আমার জীবনে সুস্থতা বিধান ও পেরেশান অবস্থার দূরীকরণ এবং তার ন্যূনতম দাবি মেটানো কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকেই সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন কিছুতেই এ ক্ষমতা নেই— পার্থিব কোন বস্তুতেও যেমন তা নেই, তেমনি আখিরাতের কোন উপকরণেও নেই। অতঃপর রিয্ক দানের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার যেমন ইচ্ছা, তেমনিভাবে তা সরবরাহ করতে পারেন। তিনি যদি চান তবে মখলূককে তার কারণ বানিয়ে দিতে পারেন— এমনকি, লাকড়ীকেও সেই কারণ বানিয়ে দিতে পারেন (অর্থাৎ লাকড়ী কেটে তা বিক্রি করে রুযী-রোজগারের পথ করে দিতে পারেন) অথবা কোন কারণ ব্যতীত, কোন মাধ্যম ব্যতীত— এমনিতেই কেবল স্বীয় ক্ষমতায়ই তা পৌঁছিয়ে দিতে পারেন।

মোটকথা, তুমি যখন এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে এবং তাতে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নিজের অন্তরকে মখলূক ও

কারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হবে, তখনই হাসিল হবে পুরোপুরি নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল)। নির্ভরশীলতার প্রকৃত পরিচয় এটাই।

মনে রাখবে, নির্ভরশীলতার চাবিকাঠি হলো যে জিনিসটি তোমাকে আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভরশীল হওয়ার প্রেরণা যোগাবে। তা হলো আল্লাহ্‌র যিম্মাদারীর কথা স্মরণ করা আর এর মূল ভিত্তি হলোঃ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিপত্তি, ইল্‌ম ও কুদরত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং তিনি যে ভুল-ত্রুটি ও অপারগতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও উর্ধ্বে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা।

মোটকথা, যখন বান্দা এসব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন রিযিকের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবেই সে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করার জন্য মন স্থির করতে সক্ষম হবে।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—তা হলো মানুষের কি সকল অবস্থায়ই রিযিক তলব করা জরুরী? এ জন্য আমাদের জানা দরকার যে, রিযিকে মযমূন—যাকে মূল উপাদান বা খাদ্য বলা যায়, সেটাকে তলব করার ক্ষমতাই মানুষের নেই। কারণ, সেটা বান্দার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার করণীয় বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এই তালিকার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে হায়াত ও মউত প্রভৃতির নাম করা যায়। এগুলো হাসিল কর্‌ার ক্ষমতা যেমন বান্দার নেই, তেমনি এগুলো দূর করার ক্ষমতাও বান্দার নেই।

আর, যে রিযিক শর্তসাপেক্ষে বণ্টন করা হয়েছে, বান্দার পক্ষে সেটাও তলব করার প্রয়োজন নেই। কারণ, এটার দরকারই বান্দার হয় না। মানুষের তো কেবল প্রয়োজন রিযিকে মযমূনের। সেটার দায়িত্ব তো আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং সেটা তাঁরই যিম্মায় আছে। তাছাড়া আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

এখানে فضل الله -এর দ্বারা ইল্‌ম্ ও সওয়াবকে বোঝানো হয়েছে। এ থেকে অন্য রকমের অর্থ নিলেও বড়জোর তলব করা জায়েয এবং সংগত বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু জরুরী বা ওয়াজিব কিছুতেই হতে পারে না।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সেই রিযিক যে রিযিক আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মায় আছে, তারও তো কারণ আছে। তাহলে সেই কারণ বা মাধ্যম অনুসন্ধান করা জরুরী কি না?

এর জবাব এই যে, এজন্য কারণ বা মাধ্যম অনুসন্ধানও জরুরী নয়। কারণ, বান্দার তার প্রয়োজনই নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কারণে ও অকারণে সবভাবেই সকল বিষয় সফল ও সম্পন্ন করার ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং আমাদের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে কোথা থেকে? তাছাড়া আল্লাহ্ পাক বিনা তলব এবং বিনা চেষ্টার শর্তেই তার যিম্মাদারী নিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا -

যমীনে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের যিম্মা আল্লাহ্র উপরে নয়।

যে জিনিসের স্থান সম্পর্কে বান্দার জানা নেই, তার অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেয়া কি করে সিদ্ধ হতে পারে? সুতরাং, বান্দার রিযিক তলবের প্রশ্ন উঠে কোথায়? বান্দা তো এ কথা জানে না যে, রিযিক তার কতটুকু প্রয়োজন বা সেই রিযক হাসিলেরই বা মাধ্যম কি? কিংবা সে এও জানে না যে, কোন্ জিনিসে তার জন্য খাদ্যপ্রাণ অথবা প্রতিপালিত হওয়ার মূল উপাদান নিহিত আছে? আমাদের কারোরই নিশ্চিত এবং নির্দিষ্টভাবে এ বিষয় জানা নেই যে, এসব কোথা থেকে হাসিল করা যাবে। সুতরাং যে মানুষ এসব কিছুই জানে না, তাকে তো অনুসন্ধানে বাধ্য করাও সংগত নয়। তাছাড়া, একথাও ভেবে দেখা উচিত যে, নবী ও ওলীদের অধিকাংশই সাধারণভাবে রিযিকের অনুসন্ধান করেন নি। বরং তাঁরা সর্বদা ইবাদতের জন্য স্বাধীন এবং মুক্ত থাকতেন। অথচ, একথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, তাঁরা আল্লাহ্র নির্দেশ পরিত্যাগকারী কখনো ছিলেন না কিংবা তাঁদের থেকে গুনাহ কখনো প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সুতরাং, উপরিউক্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে বিচার-বিবেচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বান্দার জন্য রিযিক অনুসন্ধান জরুরীও নয়, অপরিহার্যও নয়।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে. অনুসন্ধান করলে রিযিক কি বৃদ্ধি পায় এবং অনুসন্ধান না করলে কি তা হ্রাস পায়?

আমি এর জবাবে বলবোঃ কিছুতেই এমন হতে পারে না। তার কারণ এই যে, এটা লওহে-মাহ্ফূজে লিপিবদ্ধ এবং নির্ধারিত রয়েছে— সেখানেই তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে কিছুতেই কোন প্রকারের পরিবর্তন নেই এবং সেই লিপিবদ্ধ ও নির্ধারিত বিষয়ের কোন বিষয়ই পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। আমাদের উলামায়ে কিরামদের অভিমতও এটিই। তবে হাতিম এবং শফীক (র) সহ কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেনঃ বান্দার কার্যকলাপে রিযিকে অবশ্য কোন কম- বেশী হয় না, কিন্তু সম্পদে কম-বেশী হয়। তাঁদের এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উভয় ব্যাপারে প্রমাণ একই—সে প্রমাণ হলোঃ লওহে-মাহফূজে লিপিবদ্ধ ও বর্ণিত আছে। আর তাছাড়া এদিকে ইংগিত করেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

لِكَيْلَا تَاسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ-

এ ব্যাপার এ জন্য হয় যে, তোমাদের নিকট থেকে যে জিনিস চলে যায়, তার জন্য যাতে তত দুঃখ না করো— এবং তোমাদের যে জিনিস দেয়া হয়, যাতে তোমরা তাতে খুশীতে অবতীর্ণ না হও। (সূরা হাদীদঃ ২৩)

যদি অনুসন্ধান করলে বেশী এবং অনুসন্ধান পরিত্যাগ করলে কম হতো, তাহলে তাতে দুঃখ ও সুখ প্রকাশেরও অবকাশ থাকতো। কারণ তা হলে নির্লিপ্ততা ও বিলম্বিতকরণে তা (রিযিক) পাওয়া যেতো না, যা দুঃখ করার কারণ হতো। অপর পক্ষে যেটা করলে তা হাসিল করা যেতো (যা আনন্দ বা খুশীর কারণ হতো)। রাসূলুল্লাহ্ (স) কোন সওয়ালকারীকে বলেছিলেনঃ

هَاكَ لَوْ لَمْ تَاتِهَا لَاَتَتْكَ -

রে বেওকুফ! তুই যদি এর জন্য চেষ্টা নাও করতিস, তথাপি তা তোর মিলতো।

এখন যদি প্রশ্ন করা যায় যে, সওয়াব এবং শাস্তিও তো লওহে-মাহ্ফূজে লিপিবদ্ধ আছে। তা সত্ত্বেও সওয়াব অর্জন এবং শাস্তিযোগ্য কাজ পরিত্যাগ করতে হয় কেন? তাছাড়া এ প্রশ্নও উঠতে পারে যে, সওয়াব এবং শাস্তি এগুলো—চেষ্টায় বৃদ্ধি এবং চেষ্টা না করলে হ্রাস পায় কি না?

সওয়াবের জন্য চেষ্টা করা ওয়াজিব এবং জরুরী। কারণ চেষ্টা করলে সওয়াব দানের বিষয়ে আল্লাহ্ পাক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সওয়াবের চেষ্টা না করলে আযাব এবং শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। অপর পক্ষে চেষ্টা ব্যতীত কিছুতেই আমাদের পক্ষে সওয়াব হাসিল করা সম্ভব নয়। সুতরাং সওয়াব এবং আযাবের কমবেশী সব কিছুই আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টার উপরই নির্ভরশীল।

রিযিক ও সওয়াব-শাস্তি—এ দু'টি বিষয় 'লওহে- মাহ্ফূজে' লিপিবদ্ধ থাকলেও উভয় বিষয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করলে পার্থক্যটা সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়বে।

উলামায়ে কিরামগণ লওহে-মাহ্ফূজে লিপিবদ্ধ বিষয়কে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক প্রকার বিষয় হলো, যেগুলো সম্পর্কে বিনা শর্তে এবং বান্দার সাথে সম্পর্কিত না করেই তা নির্ধারিত এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যথা, রুযী এবং হায়াত। তোমরা কি লক্ষ্য করে দেখো না যে, রুযী ও হায়াত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কি রকম বিনা শর্তে সরাসরি বর্ণনা করেছেন? তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -

আর, ধরণীতে বিচরণকারী এমন কোন (রিযিক গ্রহণকারী) প্রাণী নেই, যার রুযীর দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর নয়।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেনঃ

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَايَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَايَسْتَقْدِمُوْنَ -

যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হবে, তখন তা এক মুহূর্ত পরেও হবে না বা এক মুহূর্ত আগেও হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ চারটি ব্যাপারে মখলূকের কোন দায়িত্ব নেই (করবার কিছু নেই) জন্ম, রিযিক, হায়াত এবং মউত।

অপর এক প্রকার হলো, যেগুলো কোন শর্ত-সাপেক্ষে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো বান্দার কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট (নির্ভরশীল) যেমন, সওয়াব ও শাস্তি।

লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, আল্লাহ পাক এ দুইটি বিষয়কে কিভাবে বান্দার কর্মের সাথে সম্পর্কিত করে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ

وَلَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ -

যদি আহলে-কিতাবগণ ঈমান আনতো এবং তাকওয়া ইখতিয়ার করতো, তা হলে অবশ্যই আমি তাদের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিতাম এবং নিশ্চয়ই তাদের শান্তিপূর্ণ জান্নাতে স্থান করে দিতাম। (সূরা মায়িদাঃ ৬৫)

মোটকথা, বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নজর করলেই স্পষ্ট ধরা পড়ে।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আমরা তো দেখছি যে, চেষ্টা-তদবীর যারা করে, তাদের খুবই রিযিক ও সম্পদ লাভ হয়। অপর পক্ষে চেষ্টা-তদবীর পরিত্যাগকারীদের তো দেখা যায় যে, তারা ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং পরমুখাপেক্ষী। এ প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, বহু চেষ্টা-তদবীরকারী আছে, যারা ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং গরীব। তেমনি বহু ব্যক্তি আছে, যারা চেষ্টা-তদবীর ছাড়াই অসংখ্য, অগুণতি সম্পদের অধিকারী হয়েছে। তবে তোমাদের নজরে হয়তো তা পড়ছে না, এ-ই যা। কিন্তু এরূপ ঘটনা বিরল নয়, অসংখ্য। এটা এজন্য হয় যে, মানুষ যেন উত্তমভাবে আল্লাহ্র শক্তি সম্পর্কে বুঝতে পারে, যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, বিশ্বের সব কিছুই সেই মহাপ্রতিপালকের কুদরতেরই অধীন।

আবূ বকর ইব্ন সাবিক তাঁর এক কবিতায় বলেছেনঃ বহু মানুষ অন্তরের দিক থেকে খুবই শক্তিশালী এবং মতে দৃঢ়। কিন্তু রিযিক তাদের থেকে দূরে

অবস্থান করে। আবার এমন বহু দুর্বল লোক আছে, যারা সংকল্পেও দুর্বল, তারাই আবার রিযিকের সমুদ্রে নিমজ্জিত।

উপরিউক্ত বিষয় এ কথারই সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, সেই পরম প্রভুর এ মহাবিশ্বে বাহ্যত যা দৃশ্যমান তেমনি গুহ্যতও অনেক কিছু সক্রিয়।

এখন প্রশ্ন হলো, সংসার ত্যাগ ও সম্বলহীনভাবে জঙ্গলে যাওয়া উচিত কি না? যদি অন্তর আল্লাহ তা'আলার সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত হয় এবং আল্লাহ্র ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও পুরোপুরি ভরসা ও নির্ভরশীলতা থাকে, তা হলে যাওয়া উচিত–অন্যথায় সাধারণের পদ্ধতিতে তাদেরই সাথে জীবন যাপন করতে হবে।

আমি শুনেছি, ইমাম আবুল মুয়ালী বলতেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সাথে মানুষের স্বভাব অনুযায়ী ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলাও বিপদের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার ব্যাপারে মানুষের পন্থা অনুযায়ী ব্যবহার করে থাকেন।

তাঁর এ মন্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান। এ কথায় যথেষ্ট চিন্তার খোরাক আছে। কারণ এতে বহু উপকার লুক্কায়িত রয়েছে। তবে যদি প্রশ্ন তোলেন যে, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى -

আয়াতের তফসীর

এ আয়াতের অর্থ নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। একদল আলিম বলেন ঃ এ থেকে আখিরাতের পাথেয়ের কথা বলা হয়েছে। এ জন্যই বলা হয়েছে ঃ خير الزاد التقوى অর্থাৎ উত্তম পাথেয় হলো 'তাকওয়া' এবং পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ও পাথেয়ের কথা বলা হয় নাই।

অপর দল বলেন ঃ এক শ্রেণীর লোক অপর লোকের ভরসায় নিজেদের জন্য কোন পাথেয় না নিয়ে হজ্জে যাত্রা করতো। রাস্তায় রাস্তায় তারা মানুষের নিকট সওয়াল করতো, 'কিছু নেই', 'কিছুই নিয়ে আসি নি'— এ ধরনের অনুযোগ করতো, বারংবার সওয়াল করে মানুষকে কষ্ট দিতো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

পাথেয় নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের পাথেয় ও মানুষের উপর ভরসা করার চাইতে পরম প্রভুর তরফ থেকে প্রাপ্ত পাথেয় অধিক উত্তম।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'মুতাওয়াক্কিল' অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল বা পূর্ণ ভরসাকারী ব্যক্তির পক্ষে ভ্রমণে পাথেয় সঙ্গে নেয়া উচিত কি না? এ ধরনের লোকও অনেক সময় সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিস রাখেন। কিন্তু তাই বলে তাঁদের অন্তর সে পাথেয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে না। তাঁরা এ চিন্তা করেন না যে, তাঁদের রিযিক তাঁদের সাথেই আছে, তার দ্বারাই তাঁদের খাদ্য মিলবে। বরং এদের অন্তর থাকে আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্ট। এদের ভরসাও থাকে আল্লাহ্রই উপর। তাঁরা মনে মনে বলেন, রিযিক পূর্বেই বন্টিত হয়ে আছে। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা বা হা-হুতাশের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহর ইচ্ছার উপরই সব নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে সঙ্গের পাথেয় থেকে যেমন খাদ্য দান করতে পারেন, তেমনি অন্য উপায়েও তা সরবরাহ করতে পারেন।

অনেক সময় এ ধরনের মানুষ অন্য উদ্দেশ্যেও সাথে খাদ্য-সম্ভার নিয়ে নেয়। সে উদ্দেশ্য হলো অপর মুসলমানকে সাহায্য করার সুযোগ গ্রহণ করা। মোটকথা, খাদ্য-সম্ভার সাথে থাক বা না থাক, তাতে কিছু যায় আসে না। অন্তরের অবস্থার উপরই এ ব্যাপারটি নির্ভরশীল। সঙ্গের খাদ্য-সম্ভারের উপরই ভরসা করা উচিত নয়। বরং সর্বদাই (খাদ্য-সম্ভার সাথে থাক বা না থাক) সব সময় আল্লাহর ওয়াদা ও যিম্মাদারীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস, ভরসা এবং তাঁর দয়া-করুণার উপর নির্ভর করাই প্রকৃত আল্লাহ্-নির্ভরশীলের পরিচয়।

এ জন্য দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি হয়তো সফরে সঙ্গে খাদ্য-সম্ভার নিয়েছে ঠিক, কিন্তু তার উপর সে ভরসা করছে না— ভরসা করছে আল্লাহ্র উপর। অপরপক্ষে, খাদ্য-সম্ভার সঙ্গে না নিয়েও আবার অনেকে আল্লাহ্র উপর ভরসা করছে না, করতে পারছে না, সর্বদাই মনে একটা অস্বস্তি অনুভব করছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অন্তরই হলো আল্লাহ্-নির্ভরশীলের মূল কেন্দ্র।

এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য খুব ভালভাবে বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তা হলে এটি অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।

তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স), সমস্ত সাহাবী, তাবেঈনগণ এবং তৎপরবর্তী বুযুর্গ ব্যক্তিগণ তাঁদের সফরের সময় সঙ্গে খাদ্য-সম্ভার এবং

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যেতেন বলে প্রমাণ তো পাওয়া যায়। এ প্রশ্নের জবাব এই যে, তাতে ক্ষতি কি ? সঙ্গে খাদ্য-সম্ভার নেয়া তো ক্ষতিকর নয়। এটা তো জায়েয, হারাম তো নয়। হারাম হলো খাদ্য-সম্ভার বা সাজ-সরঞ্জামের সাথে মন সংশ্লিষ্ট রাখা এবং তার উপরই নির্ভর করা-- আর আল্লাহ্র উপর ভরসা পরিত্যাগ করা।

তাছাড়া, রাসূলুল্লাহ্ (স) সম্পর্কে কি ধারণাই বা তোমরা করছো। আল্লাহ পাক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ -

ভরসা করো সেই চিরন্তনের উপর, মৃত্যু যাকে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না। (সূরা ফুরকান ঃ ৫৮)

তিনি কি এ নির্দেশের খেলাফ করে খাদ্য-সম্ভার, সাজ-সরঞ্জাম এবং অন্যান্য জিনিসের উপর ভরসা করে চলেছেন? এমন কখনো হতে পারে না। বরং তাঁর অন্তঃকরণ থাকতো আল্লাহ পাকের সাথে সংশ্লিষ্ট-- তাঁর উপরই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পার্থিব জিনিসের প্রতি আদৌ আগ্রহ দেখান নি, তিনি তাঁর হাত পার্থিব সম্পদের প্রতি প্রসারিত করেন নি। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং বুযুর্গ ব্যক্তিরা তাঁদের সফরে খাদ্য-সম্ভার ও অন্যান্য পাথেয় নিয়ে নিতেন বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্র উপর ভরসা না করে তাঁর সেই পাথেয়ের উপরই ভরসা করতেন (নাউযু বিল্লাহ্)। প্রকৃতপক্ষে, আমি যে কথা আগে বর্ণনা করেছি, সেটাই গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ অন্তরের অবস্থার উপরই সব কিছু নির্ভরশীল)। বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

তবুও আর একটি প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশ্নটি এই যে, সফরে খাদ্য-সম্ভার ও অন্যান্য পাথেয় নেয়া উত্তম, না না নেয়াই উত্তম? এটা অবস্থা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। যদি কোন ব্যক্তি অপর যে লোককে সাহায্য করা এবং খাদ্য-সম্ভার ও পাথেয় নেয়া যে জায়েয, তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তা সঙ্গে নেয়, তবে তা নেয়া উত্তম বলেই গণ্য হবে। কিন্তু যদি একা কেউ সফরে বের হন এবং আল্লাহর প্রতি ভরসায় তিনি অবিচল ও দৃঢ় হন এবং আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে সফরের

পাথেয় অর্জন করার সাহসী হন, তবে তাঁর পক্ষে সফরে কিছু না নেয়াই উত্তম।

এটিও একটি সূক্ষ্ম বিষয়। সুতরাং গভীরভাবে বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ বিপদাপদ

নিজের সকল ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ন্যস্ত করার মাধ্যমেই কেবল এ ব্যাপারে পূর্ণতা হাসিল সম্ভব। সুতরাং সকল ব্যাপার আল্লাহ্র প্রতি ন্যস্ত করা ওয়াজিব। দু'টি কারণে এমন করার প্রয়োজন হয়। প্রথমত, যে কোন ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন করা। কারণ, যখন কোন বিরাট ও জটিল কাজ সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং সে কাজটি যথার্থভাবে সম্পাদিত হবে, না তা ভণ্ডুল হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান না থাকে তখন স্বভাবতই অন্তর বিচলিত ও আতংকিত হয়ে পড়ে। মনে মনে বারবার শঙ্কা জাগে যে, কাজটি সঠিক হবে, না বিগড়ে যাবে। কিন্তু যদি তুমি সকল ব্যাপার আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দাও, তা হলে তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে যে, অবশ্যই তোমার কাজটি সঠিক ও যথার্থভাবেই সম্পন্ন হবে। সকল বাধা-বিঘ্ন এবং বিপদাপদ সম্পর্কে তখন তুমি হতে পারবে নিরাপদ। ফলে সাথে সাথেই তোমার অন্তরে নেমে আসবে গভীর প্রশান্তি। অন্তরের এ প্রশান্তি একটি মস্ত বড় নিয়ামত। এ নিয়ামতের কোন তুলনা নেই।

আমাদের ওস্তাদ সব সময়ই বলতেনঃ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপরই তোমার সবকিছু– এমনকি চেষ্টাকেও ছেড়ে দাও। ইনশাআল্লাহ্, শান্তি ও স্বস্তি পাবে।

তিনি এ সম্পর্কে তাঁর এক কবিতায় বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির জানা নেই যে, ভালো অথবা মন্দ জিনিসে তার জন্য লাভ ও উপকার আছে, তার পক্ষে এটাই সঙ্গত যে, সে যেসব বিষয় সম্পর্কে বুঝতে অক্ষম, সে সম্পর্কে তার ব্যাপারটি সেই পরম প্রভুর উপর ন্যস্ত করো – সকল ব্যাপারেই যিনি যথেষ্ট। তিনি অত্যন্ত মেহেরবান, অতি করুণাময়।

দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে কল্যাণ ও নিরাপত্তা অর্জন করার জন্য। তার কারণ এই যে, যে কোন কর্মেরই ফলাফল সব সময়ই অনিশ্চিত। অনেক মন্দ বিষয়

পরিণামে ভালো হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তেমনি অনেক ক্ষতিকারক বিষয় পরিণামে লাভজনক প্রমাণিত হয়। বহু বিষ-মিশ্রিত জিনিসই পরিণতিতে মধুস্বাদ বহন করে আনে। মানুষ বহু কর্মের পরিণাম সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সে কর্মের মধ্যে কি লুক্কায়িত, তাও সে জানে না। সুতরাং এ ধরনের অনিশ্চিত পরিণাম-সম্ভাবনাপূর্ণ কর্মের ব্যাপারে তুমি যদি সরাসরি সংকল্প গ্রহণ করো এবং নিশ্চিতভাবে তাতে অগ্রসর হও, তা হলে শীঘ্রই ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এমতাবস্থায় তুমি হয়তো এমনভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে যে, তা টেরই পাবে না।

বর্ণিত আছে, কোন এক ইবাদত-গোযার ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দাবি করলেন যে, তাকে শয়তান দেখাতে হবে। তাঁর দাবি অনুযায়ী শয়তানকে তাঁর সম্মুখে হাযির করা হলো। তিনি শয়তানকে দেখামাত্র তাকে মারবার সংকল্প করলেন। শয়তান তা টের পেয়ে বললো ঃ আপনি যদি এক শ' বছর জীবিত থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে ও আপনার সকল কর্মকে ধ্বংস করে দেবো। শয়তানের এ কথায় ইবাদত-গোযার ব্যক্তি ধোঁকায় নিপতিত হলেন। তিনি ভাবলেন ঃ আরে আমার জীবনের তো তা হলে এখনও বহু সময় অবশিষ্ট আছে। সুতরাং এখন যা খুশি তাই তো আমি করতে পারি, পরে এক শ' বছর পূর্ণ হওয়ার আগে আগে তওবা করে নিলেই চলবে। এরূপ চিন্তার ফল এই হলো যে, সেই দীর্ঘদিনের ইবাদত-গোযার ব্যক্তি এবার পাপাচার ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। আল্লাহ্র ইবাদত গেলেন ভুলে। ফলে অচিরেই তিনি ধ্বংসে পতিত হলেন।

এ কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারছি যে, উদ্দেশ্যের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও দীর্ঘ জীবনের আশা মানুষের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। এ জন্য কোন এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ

'আকাঙ্ক্ষা এবং আশার ছলনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। কারণ এমন অনেক আশাই আছে, যা মৃত্যু ডেকে আনে।'

অপরপক্ষে, তুমি তোমার সকল বিষয়কে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করো এবং তোমার কল্যাণ ও মঙ্গলের করুণা ভিক্ষা করো। তাহলে মঙ্গল, কল্যাণ ও উন্নতি ব্যতীত আর কিছুই তোমার পথে এসে ভিড় জমাবে না।

আল্লাহ্ পাক নেক-বান্দাদের কথা উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ

وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ ۞ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ - فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ -

আমি আমার বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অর্পণ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সকল বান্দারই রক্ষক। অতঃপর আল্লাহ্ পাক সেই মুমিনকে সেই সকল লোকদের ক্ষতিকারক চেষ্টা থেকে নিরাপদ রাখেন। আর দলবলসহ ফিরাউনকে নিপতিত করেন কঠোর শাস্তিতে। (সূরা মুমিন ঃ ৪৪-৪৫)

এবার এ আয়াতের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'অর্পণ' করার পর আল্লাহ্ পাক তাঁকে সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন, নিরাপদ রেখেছেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য এবং উদ্দেশ্যে সাফল্য দান করেছেন

'অর্পণ' -এর অর্থ ও তার নির্দেশ

এ ব্যাপারটিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য দু'টি বিষয় আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, 'অর্পণ'-এর (আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করা) স্থান—অর্থাৎ কখন এবং কোন্ অবস্থায় আল্লাহ্র উপর নিজের ব্যাপারকে অর্পণ করতে হয়। আর দ্বিতীয়ত, 'অর্পণ'-এর অর্থ, পরিচয় এবং উহার বিপরীত বিষয়সমূহ।

অর্পণ-এর স্থানসমূহ

প্রথমে মনে রাখা দরকার যে, নিয়্যত তিন প্রকার। প্রথমত, যেসব নিয়্যতের মন্দ হওয়া সম্পর্কে পরিষ্কার জানা আছে, তেমনি নিয়্যত এটা সরাসরি মন্দ এবং খারাপ; এতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন, দোযখ ও শাস্তি আর কর্মের দিক দিয়ে কুফরী, বিদ'আত ও অন্যান্য গুনাহ্র কাজ। এ ধরনের বিষয়ের সংকল্প করার আদৌ অনুমতি নেই।

দ্বিতীয়ত, সেই সব সংকল্প, যেগুলোর ভাল ও উত্তম হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত জানা আছে। যেমন, জান্নাত, ঈমান এবং অন্যান্য নেক আমল। এসব ব্যাপারে নিশ্চিত সংকল্প করা অতি জরুরী। এসব ব্যাপারে 'অর্পণ'-এর কোন অবকাশ নেই। কারণ এগুলো বিপদের আশংকা থেকে মুক্ত। তাছাড়া এগুলো যে উত্তম ও ভালো, তাতে সন্দেহেরও কোন অবকাশ নেই।

তৃতীয় শ্রেণীর সংকল্প হলো সেগুলো, যেগুলোর ভালো ও উত্তম হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা নেই। এর সম অর্থবোধক নফলসমূহ এবং মুবাহ্ বিষয়সমূহ! এটাই হলো 'অর্পণে'র স্থান। সুতরাং এসব ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে সংকল্প করা ঠিক নয়। বরং এসব ব্যাপারে সংকল্প করার সময় অনুরূপভাবে কল্যাণ ও আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে সংকল্প করা দরকার। এভাবে শর্তসহ নিয়্যত করলে তাকে 'অর্পণ' বলা হবে। যদি আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর ছেড়ে না দিয়ে সংকল্প করা হয়, তাহলে এ সংকল্প জঘন্য লোভ বলে বিবেচিত হবে। এ ধরনের সংকল্প করা নিষিদ্ধ।

মোটকথা, যেখানে বিপদাপদ থাকবে, সেখানেই তোমার বিষয়কে আল্লাহ্র নিকট অর্পণ করতে হবে; যে বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত কোন জ্ঞান নেই, সেই বিষয়কেই আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করতে হবে।

'অর্পণ'-এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের বহু বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন ঃ যে ব্যাপার বা বিষয়ে বিপদের আশঙ্কা আছে, সেই বিষয় বা ব্যাপার ইখ্তিয়ার করার বিষয়টিকে সেই পরম প্রভুর উপর ছেড়ে দেওয়ার যিনি অমুখাপেক্ষী এবং সমগ্র সৃষ্টির সকল বিষয় ও সকল ব্যাপারে? সকল দিক সম্পর্কে যিনি সবিশেষ ওয়াকিফহাল। যাঁর মহিমা প্রকাশ পায় মাত্র একটি বাক্যে— তা হলো ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

শায়খ আবি মুহাম্মদ 'অর্পণ'-এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তোমার কোন সংকল্প বা আকাঙক্ষা যদি বিপদ সম্ভাবনাপূর্ণ হয়, তাহলে তার পরিণতি যেন উত্তম এবং কল্যাণই বহন করে আনে তজ্জন্য পরম প্রভুর উপরই তা অর্পণ করো।

অপরপক্ষে, শায়খ আবূ উমর বলেছেন ঃ অর্পণের অর্থ হলো লোভ পরিত্যাগ করা। এখানে লোভ বলতে বিপদ-আশঙ্কাপূর্ণ কোন বিষয়ে বা ব্যাপারে সংকল্প করা এবং তাতে দৃঢ় মত প্রতিষ্ঠিত করা।

সারকথা এই যে, 'অর্পণ' এমন ধরনের সংকল্পকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বিপদ-আশঙ্কাপূর্ণ বিষয় থেকে এমনভাবে নিরাপদ করবেন, যার ক্ষমতা তোমার নেই।

মনে রাখবে, এ অর্পণের বিপরীত হলো লোভ। এ লোভ আবার দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হলো, আশা ও সন্তুষ্টির ন্যায় অর্থাৎ এমন সব ব্যাপারে

সংকল্প ও আকাঙক্ষা করা, যাতে বিপদই নেই অথবা বিপদ আছে, কিন্তু তাকে বিপদমুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের লোভ পছন্দনীয়। এতে মন্দ কিছু নেই। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ -

সে পরম প্রভু, যাঁর প্রতি আমার আশা আছে যে, তিনি কিয়ামতের দিন আমার গুনাহ্-খাতা মাফ করে দিবেন।

(সূরা শুআরাঃ ৮২)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا-

আমরা আশা রাখি যে, আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদের গুনাহ্খাতা মাফ করে দেবেন। (সূরা শুআরা ঃ ৫১)

মোটকথা, উপরিউক্ত শ্রেণীর 'লোভ' সম্পর্কে আপত্তির কিছু নেই আর এখানে এ শ্রেণীর লোভ আমাদের আলোচ্য বিষয়ও নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোভ অত্যন্ত ঘৃণার্হ। এ শ্রেণীর লোভ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالطَّمْعِ فَانَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ-

লোভ থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। কারণ লোভ উপস্থিত দৈন্য এবং দারিদ্র্য।

এ ধরনের লোভের ফলে ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। মোটকথা, লোভের মধ্যে ধর্মের বিপর্যয় আর তাকওয়ায় ধর্মের জীবন এবং সমৃদ্ধি।

আমাদের শায়খ (র) বলেছেন ঃ লোভ ঘৃণিত হওয়ার দুইটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, সেসব লোভের ব্যাপারে অন্তরে সন্তুষ্টি আসে, যেগুলোতে সন্দেহ এবং বিপদাশঙ্কা আছে।

দ্বিতীয়ত, যেসব বিষয়ে বিপদের আশঙ্কা বিদ্যমান, সেসব বিষয়ে স্থির সংকল্প করা। এ ধরনের সংকল্প পূর্বে বর্ণিত 'অর্পণ' (আল্লাহ্‌র উপর নিজের বিষয় ন্যস্ত করা)-এর ঠিক বিপরীত। শেষোক্ত শ্রেণীর সংকল্প ব্যতীত আর কোন সংকল্পই 'অর্পণ'-এর বিপরীত নয়।

অর্পণ-এর বৈশিষ্ট্য অর্জন এবং তা রক্ষার উপায় হলো ঃ যেসব বিষয়ে ও ব্যাপারে বিপদাশঙ্কা আছে, সেসব বিপদ ও তার পরিণাম স্মরণ করা। অতঃপর নিজের দুর্বলতা, অজ্ঞতা এবং অসাবধানতার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে নিজের অসামর্থ্যের বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করা।

এ দু'টি বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, এ বিষয়টিই সর্বদা আল্লাহ্‌র উপর নিজের সকল ব্যাপার ন্যস্ত করার প্রেরণা যোগাবে। আর কল্যাণ ও উত্তম সংকল্প ব্যতীত অন্যান্য সকল সংকল্প ও ইচ্ছা থেকে তোমাকে রাখবে দূরে।

বিষয়টি জটিল হলেও অত্যন্ত দরকারী। এ জন্য বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে উপলব্ধি করতে হবে।

বিপদের আশঙ্কায় আল্লাহ্‌-নির্ভরতা

সামগ্রিকভাবে বিপদাপদ দুই প্রকার, প্রথমত, সন্দেহের ভিত্তিতে আশঙ্কা সৃষ্টি। এ বিষয়টি হয় কি না অথবা এ ব্যাপারে সে পর্যন্ত পৌঁছা যাবে কি না। এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নিজের কর্মকে সোপর্দ করা জরুরী। এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয় নিয়্যত এবং আকাঙক্ষার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, বিষয়টি বিপর্যস্ত হয়ে নিজের অস্তিত্বই তাতে ঠিক থাকবে বলে নিশ্চিত জ্ঞান না থাকা। মোটকথা, এ অবস্থায় সব বিষয়ে আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়া দরকারী এবং অপরিহার্য।

এ বিপদাপদের বর্ণনায় আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন ঃ এ বিপদ কর্মের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এ বিপদের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই মুক্তি অর্জন হয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গুনাহ্‌ আত্মপ্রকাশের আশঙ্কা বিদ্যমান।

ঈমান, সুন্নতে দৃঢ়তা ও স্থিতি; এতে কোন প্রকারের বিপদ নেই। কারণ, ঈমান ব্যতীত কিছুতেই নাজাত সম্ভব নয়। আর সুন্নতে দৃঢ়তা ও স্থিতি লাভের

দ্বারা গুনাহ্ থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব। সুতরাং এমতাবস্থায় ঈমান ও সুন্নতে দৃঢ়তা ও স্থিতি অর্জনের জন্য সরাসরি সংকল্প করা সঙ্গত।

আমার ওস্তাদ (র) বলেছেন ঃ কর্মে বিপদাপদ বলতে এই বোঝায় যে, সে বিপদগুলি দেখা দেয়ার আশঙ্কা থাকে। এ অবস্থায় সে কর্মের চাইতে উদ্ভূত কার্যে লিপ্ত হওয়াই উত্তম। এ ধরনের ব্যাপার নফল, সুন্নত, এমন কি ফরযের ক্ষেত্রেও উদ্ভূত হতে পারে।

যেমন ঃ কোন এক ব্যক্তির নামাযের সময় সংকীর্ণ হয়ে গেছে, তবুও তিনি তা আদায়ের সংকল্প করছেন। কিন্তু অকস্মাৎ অগ্নিকান্ড ঘটে গেলে অথবা নৌকাডুবি হয়ে নিমজ্জিত হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, যদি চেষ্টা করলে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নামায পড়ার চাইতে অগ্নিকাণ্ড অথবা ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচবার চেষ্টা তুলনামূলকভাবে উত্তম। সুতরাং এমতাবস্থায় জায়েয, নফল, এমনকি, বহু ফরয সম্পর্কেও সরাসরি সংকল্প করা সঙ্গত নয়।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা কি সম্ভব যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দার উপর কোন একটা জিনিস ফরয করবেন এবং তা আদায় না করলে শাস্তি আছে বলে ভয় দেখাবেন, অথচ সেসব ফরযগুলোতে কল্যাণ ও মঙ্গল থাকবে না ?

এ সম্পর্কে আমাদের ওস্তাদ সাহেব (র) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন না, বিপত্তিসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে যাতে আর কোন প্রকারের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত থাকবে না আর এমন কোন ফরযের দ্বারা বিপদগ্রস্তও করেন না, যা থেকে নিষ্কৃতির কোনই পথ থাকবে না। বরং আল্লাহ্ তেমন বিষয়েই নির্দেশ দান করেন, যাতে কল্যাণ ও মঙ্গলই নির্দিষ্ট থাকে এবং তেমন বিষয়সমূহকেই ফরয করে দিয়েছেন, যাতে ওজর দেখা দিলে তার একটা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হয়তো অপরটি সানন্দে প্রতিপালন করে যাওয়া সম্ভব হয়। এমতাবস্থায় বান্দাকে মা'জুর বা অপারগ বলে গণ্য করা হবে। শুধু তাই নয়, বরং তাকে পুণ্য পাওয়ার যোগ্যও বিবেচনা করা হয়। অবশ্য তা একটি ফরয পরিত্যাগের জন্য নয়, বরং অপর ফরযটি অতি উত্তমরূপে আদায়ের জন্য।

আমার ওস্তাদের নিকট শুনেছি, আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দার জন্য নামায, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি আকারে যেসব বিষয়কে ফরয করে দিয়েছেন, তার মধ্যে

বান্দার জন্য নিশ্চিতই কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত আছে। সুতরাং এসব ব্যাপারে সরাসরি সংকল্প করা সঙ্গত।

এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দুনিয়া ফিতনার জায়গা। সুতরাং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল বা ভরসাকামী হলেই কি সে ধ্বংস, বিপর্যয় প্রভৃতি থেকে নিরাপদ হয়ে যেতে পারবে?

মনে রাখবে, এ ধরনের মানুষের ক্ষেত্রে সাধরণত কল্যাণ ও মঙ্গল ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকাশ পায় না। তবে কখনো কখনো এর বিপরীত ঘটতে দেখা যায়। ফলে এ ধরনের মানুষ অনেক সময় লজ্জায় পতিত হয় এবং 'অর্পণ'-এর মকাম থেকে নিচে নেমে যায়। কিন্তু বান্দার পক্ষে লজ্জা করা এবং অর্পণ-এর মকাম থেকে দূরে সরে পড়ায় কিছুতেই কোন কল্যাণ ও মঙ্গল নেই

শায়খ আবূ উমর বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ব্যাপারসমূহকে আল্লাহ্ পাকের উপর ন্যস্ত করেছে, তার কোন ব্যাপারেই (আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত ব্যাপার) কল্যাণ ব্যতীত অপর কিছু প্রকাশ পায় না। আর অর্পণের ক্ষেত্রে লজ্জা এবং সংকীর্ণতা সে বিষয়ের ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয়, যে বিষয়ের ব্যাপারে 'অর্পণ' প্রকৃত 'অর্পণ' হয়নি। কারণ অর্পণ-এর ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সামান্যতম অবকাশও নেই আর অর্পণও কেবল সে সকল বিষয়েই হতে পারে, যেসব বিষয়ের সঠিকত্ব ও বিপর্যয় সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

আমাদের ওস্তাদ সাহেবের মতে, এ মতটিই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। কারণ, এছাড়া অন্য কোন জিনিস 'অর্পণ-এর প্রতি আগ্রহী করে তোলে না।

যা হোক, পুনরায় প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র উপর নিজের বিষয়কে অর্পণকারী মানুষের সাথে কেবল ফযীলত ওয়ালা ব্যবহার করাই কর্তব্য হবে নাকি? এর জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র জন্য কোন জিনিস ওয়াজিব হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, বান্দার ব্যাপারেও তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হতে পারে না। তবে বান্দার কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তম এবং নেক ও সঠিক ব্যবহার নিঃসন্দেহেই আশা করা যায়।

তোমরা কি এ কথা চিন্তা করে দেখছ না যে, নবী আকরাম (সা) এবং তাঁর সাহাবিগণের জন্য কতিপয় সফরে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা সূর্যোদয় পর্যন্ত নিদ্রা যাবেন। এমন কি তাঁদের তাহাজ্জুদ ও ফযরের নামায পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অথচ এ কথা তো প্রকৃত সত্য যে, নামায নিদ্রা থেকে উত্তম।

তেমনি আল্লাহ্ পাক কোন বান্দার জন্য পার্থিব ধন-দওলত ও ঐশ্বর্য নির্দিষ্ট করে দেন, কিন্তু তার জন্য নিঃস্বতাই উত্তম ও কল্যাণকর হয়ে থাকে। অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে মশগুল করে দেন, কিন্তু যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, ইবাদতে ইলাহীর জন্য একাকিত্ব ও সংসার-ত্যাগই তার পক্ষে কল্যাণের প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা, আল্লাহ্ পাক বান্দার সকল অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল এবং তিনি সবকিছুই অবলোকন করে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যিনি দক্ষ ও অভিজ্ঞ হেকিম, তিনি রোগীর জন্য বার্লির পানির ব্যবস্থা দেন, অথচ তার নিকট হয়তো উত্তম বোধ হয় ইক্ষুর রস। কিন্তু হেকিম জানেন, তার রোগের প্রতিকারের জন্য কি করা দরকার। তাই তিনি বার্লির পানির ব্যবস্থা করেন। সুতরাং উদ্দেশ্য হলো বান্দাকে ধ্বংস এবং বিপর্যয় থেকে নাজাত দেয়া। ধ্বংস ও বিপর্যয় রোধের সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদা বিধান উদ্দেশ্য নয়।

এখন আলোচনা করা দরকার যে, যে ব্যক্তি তার নিজের ব্যাপার আল্লাহ্ পাকের উপর ন্যস্ত করবেন, তাঁকে মুক্ত বা স্বাধীন বলা হবে কি না ? আমাদের উলামায়ে কিরামের অভিমত যে, তাঁকে স্বাধীন বলা যাবে। তাতে তাঁর অর্পণেও কোন প্রকারের সন্দেহ উপস্থিত হবার মতো কিছু নেই। কারণ যদি কোন উত্তম জিনিসে তাঁর নিকট সঠিকত্ব প্রতীয়মান হয়, তাহলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ কথার ইচ্ছা প্রকাশ করার অধিকার তাঁর আছে যে, তাঁর জন্য যেন উত্তম জিনিসই নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন রোগী চিকিৎসককে বলতে পারে যে, আমার পথ্য বার্লির পানির পরিবর্তে ইক্ষুর আরক দেয়া হোক, যাতে করে সুস্থতা ও ফযীলত— উভয়টিই এক সাথে লাভ করা যায়। অবশ্য যদি উভয় জিনিসেই বিশুদ্ধতা বিদ্যমান থাকে।

ঠিক এই একই অবস্থা সে ক্ষেত্রেও যখন কোন বান্দা আল্লাহ্র নিকট সওয়াল করে যে, তার নিরাপত্তা যেন উত্তম জিনিসের মাধ্যমে দান করা হয় এবং তার জন্য সে জিনিসই নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক, যাতে করে মর্যাদা ও নিরাপত্তা উভয় জিনিসই একত্র হয়। তবে এ শর্তসাপেক্ষে যে, আল্লাহ্ পাক যদি তার জন্য কোন উত্তম জিনিসের মাধ্যমে নিরাপত্তা নির্দিষ্ট করে দেন, তবে তাতে সে সন্তুষ্ট থাকবে।

এখন অবশ্য একটা সন্দেহের উদয় হতে পারে যে, বান্দার জন্য সঙ্গত বিষয় পরিত্যাগ করে উত্তম জিনিস মনোনীত করার ইখ্‌তিয়ার কি জন্য থাকবে ? এ জন্য যে, এ দুটোর মধ্যে বেশ খানিকটা পার্থক্য রয়েছে। কারণ, মানুষ উত্তম বিষয়কে তার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চিনতে পারে, কিন্তু নেক ও খাঁটি বিষয়কে তার ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে আলাদা করতে সক্ষম নয়। এ জন্য এসব ব্যাপারে সরাসরি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণও করতে পারে না।

তাছাড়া, উত্তম বিষয় অবলম্বনের মাধ্যমে যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রকারান্তরে এ সওয়ালই করে যে, আল্লাহ্ পাক তার নির্দেশনা, নিরাপত্তা এবং উপযোগিতা যেন উত্তম বিষয়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট করেন। এ উত্তমই যেন হয় তার জন্য সতত মনোনীত বিষয়। বান্দা নিজের তরফ থেকে কোন বিষয়ে নির্দেশ জারি করতে পারে না।

মোটকথা, এ বিষয়টি জ্ঞানের এক সূক্ষ্ম পর্যায়, গোপন ভেদের ছিঁটে-ফোঁটাও এতে আছে। বিষয়টি এখানে জরুরী না হলে এর আলোচনা করা হতো না। কারণ এটা 'ইল্‌মে কাশ্‌ফের' এক মহাসমুদ্র। এতে ঊর্মিমালা সর্বদাই ঢেউ খেলছে। তথাপি আমি সংক্ষিপ্তভাবে এ সূক্ষ্ম বিষয়টিকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এ গ্রন্থের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

তৃতীয় বিষয় ঃ ভাগ্য ও তার শ্রেণীবিভাগ

ভাগ্য তকদীরের প্রশ্নটির সমাধান সন্তুষ্টির দ্বারা সম্ভবপর। এ জন্যই আল্লাহ্ পাকের প্রতি সন্তুষ্টি রাখা ওয়াজিব এবং জরুরী। দু'টি কারণে এ সন্তুষ্টি অর্জন অপরিহার্য।

প্রথমত, ইবাদতে ইলাহীর জন্য মুক্ত হয়ে যাওয়া। কারণ তুমি যদি আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত ভাগ্যে সন্তুষ্ট না হতে পারো, তাহলে তোমার মন সর্বদাই বেদানতুর থাকবে। বিভিন্ন প্রশ্ন মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকবে। প্রশ্ন উঠবে, 'এটা কেন হলো', 'এমন কেন হলো না ?' এসব চিন্তায় যখন তোমার অন্তঃকরণ মশগুল হয়ে পড়বে, তখন ইবাদতে ইলাহীর জন্য কিছুতেই মনকে এককেন্দ্রিক করতে সক্ষম হবে না। অথচ মনকে কেন্দ্রীভূত করতে না পারলে, আল্লাহ্র যিকির, ইবাদতে ইলাহী এবং আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা ও তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়ার কাজ কি করে সম্ভব হবে?

হযরত শফীক (র) ঠিকই বলেছেন ঃ অতীত কর্মের অনুশোচনা আর ভবিষ্যতের চিন্তা-ভাবনা বর্তমান সময়ের বরকত বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ, আল্লাহ্র আযাবের আশঙ্কা দূরীকরণ। বর্ণিত আছে, কোন নবী আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাঁর যে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে অনুযোগ উত্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক 'ওহী' মারফত তাঁকে বললেন ঃ 'তুমি আমার নিকট অভিযোগ করছ, (আল্লাহ্ না করুন) আমি অনুযোগ-অভিযোগের ঊর্ধ্বে। তোমার সম্পর্কে ইল্‌মে গায়েব এ জিনিসই প্রকাশ পেয়েছিল। সুতরাং, আমি যে ভাগ্য তোমার জন্য নির্ধারিত করেছি, তাতে অসন্তুষ্ট হয়ো না। তোমার ধারণা কি এই যে, তোমার দরুনই দুনিয়ার পরিবর্তন ঘটাব অথবা 'লওহে মাহফূজ'-এ পরিবর্তন করবো ? আর তুমি কি চাও যে, আমার সংকল্প পরিত্যাগ করে এবং আমার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তোমার ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত করবো ? আমি আমার ইয্যত ও মর্যাদার কসম করে বলছি, তোমার অন্তরে যদি দ্বিতীয়বার এ ধরনের চিন্তার উদয় হয়, তাহলে নবুওতের মর্যাদা তোমা থেকে কেড়ে নেবো। আর নিশ্চয়ই এ জন্য শাস্তি দেবো। মনে রাখবে, এ ব্যাপারে আমার সামান্যতম দ্বিধাও হবে না।'

সুতরাং বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তির জন্য এ মহা-পরীক্ষার বিষয়টির ও আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট শাস্তিদানের ঘোষণা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তার খোরাক রয়েছে। কারণ নবী ও সূফীদেরই যখন এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক এমন কথা বলেছেন, তখন সাধারণ মানুষের জন্য এরূপ ক্ষেত্রে কি অবস্থা দাঁড়াতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া আল্লাহ্ পাকের সে বাক্যটির প্রতি একবার লক্ষ্য করুন, যেভাবে তিনি বলেছেন, 'দ্বিতীয়বার যদি তোমার অন্তরে এ ধরনের চিন্তার উদয় হয় .....।' আল্লাহ্ পাকের এ বাক্যটি ধোঁকা ও অন্তঃকরণের বিপদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আভাস এবং ফরমান। সুতরাং একবার চিন্তা করে দেখুন যারা বুক চাপড়ায়, চীৎকার করে, অভিযোগ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে আহাজারি করে, তাদের অবস্থা কি হতে পারে?

আরও একটি বিষয় চিন্তা করে দেখুন, বর্ণিত ঘটনাটিতে একবার মাত্র অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দেয়া হয়েছে, তথাপি আল্লাহর তরফ থেকে কি কঠোর সতর্কবাণী! তাহলে যারা সারা জীবন আল্লাহ্র তকদীর নির্ধারণের প্রতি

অসন্তুষ্ট থাকে এবং সারাজীবন ধরে আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করতে থাকে, তাদের অবস্থা কি হতে পারে?

যা হোক, আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের নফসের কারসাজি ও মন্দ কাজ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং দরখাস্ত করছি যে, তিনি যেন আমাদের গুনাহ্-খাতা মাফ করে দেন এবং আমাদের ভবিষ্যতকে মন্ডিত করেন নিরাপত্তা ও বিশুদ্ধতার দ্বারা। নিশ্চয়ই তিনি রহমানুর রহীম।

'রিযা বিল কাযা'

ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ কি?

আমাদের উলামায়ে কিরাম বলেছেন ঃ সন্তুষ্টি (রিযা) 'শাখাত' পরিত্যাগের নাম। আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা ব্যতীত অন্য বিষয়ে লোভ করা এবং বলা যে, এ বিষয়টি অত্যন্ত ভাল এবং উত্তম— এ ধরনের মনোবৃত্তিকে 'শাখাত' বলা হয়।

এখন যদি বলা হয় যে, মন্দ ও পাপ আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত ভাগ্যের আওতাধনী নয় ? আর যদি বলা হয়, তাহলে বান্দার পক্ষে সন্তুষ্ট হওয়া কি করে সম্ভব ? তাছাড়া, এ বিষয় বান্দার জন্য অপরিহার্যই বা হয় কি করে ?

শোন ! ভাগ্যে সম্মত বা সন্তুষ্ট থাকা জরুরী। তাছাড়া মন্দ ভাগ্য মন্দও নয়। বরং মন্দ হলো সেসব জিনিস, যেগুলো সম্পর্কে মন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং, এতে করে মন্দে সম্মত বা সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হয় না।

আমাদের ওস্তাদ (র) বলেছেন ঃ জীবনে যা অবশ্যম্ভাবী, তা চার প্রকার। নিয়ামত, মুসীবত, উত্তম এবং মন্দ।

নিয়ামতের ক্ষেত্রে তো ভাগ্য নির্ধারণকারী, ভাগ্য এবং ভাগ্য হিসেবে যা নেমে এসেছে, সবটির প্রতিই সন্তুষ্টি জরুরী। অধিকন্তু, তা 'নিয়ামত' হওয়ার জন্য উপরি শোকর আদায় করাও ওয়াজিব।

বিপদ-মুসীবতের ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত তিন বিষয়—ভাগ্য নির্ধারণকারী, ভাগ্য এবং ভাগ্য হিসেবে আপতিত বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্টি জরুরী। তদুপরি ভাগ্য হিসেবে মুসীবত নেমে আসায় সবর করা ওয়াজিব।

উত্তম বিষয়েও ভাগ্য-নিয়ন্তা, ভাগ্য ও ভাগ্য হিসেবে আগত বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা জরুরী। আর যেহেতু তা একটি নিয়ামত এবং আল্লাহ্ পাক এ

ব্যাপারে তওফীক দান করেছেন, সুতরাং তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা ওয়াজিব এবং জরুরী।

মন্দ বিষয়ে ভাগ্য-নিয়ন্তা, ভাগ্য এবং ভাগ্যে বিতরিত— এ তিনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা জরুরী এ হিসেবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এটি মন্দ হওয়ার দরুন এর উপর সন্তুষ্টি জরুরী নয়। বরং এ জিনিস প্রকৃতপক্ষে ভাগ্য এবং ভাগ্য নির্ধারণকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। তুমি পরিপন্থী মযহাবের প্রতি যেমন, এটির অবস্থাও তাই। এ জন্য তোমার জানা বিষয়ও ইল্‌মের অন্তর্ভুক্ত বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, তাই বলে তা মযহাব নয়।

তাছাড়া জানা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তা ইল্‌মের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা— এ দু'টি প্রকৃতপক্ষে পরিপন্থী মযহাব জানার ফলেই হয়ে থাকে, তা মযহাব হওয়ার জন্য নয়।

ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশকারীদের পক্ষে অতিরিক্ত চাওয়া জায়েয কি না? হুকুম ব্যতীত কল্যাণ ও শুদ্ধতার শর্তসহ অতিরিক্ত চাওয়া জায়েয। কিন্তু তাই বলে এ চাওয়া সন্তুষ্টির বহির্ভূত কিছু নয়। বরং এটা সন্তুষ্টিরই চিহ্ন বলে গণ্য হবে। এটি উত্তম। কারণ, কোন ব্যক্তি যখন কোন জিনিস পছন্দ করে এবং তাতে সন্তুষ্ট হয়, তখন অবশ্যই সে তা আরও চায়। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সামনে যখন দুধ উপস্থিত করা হতো, তখন তিনি বলতেন ঃ 'আয় আল্লাহ্ ! এতে তুমি বরকত দাও, এতে বৃদ্ধি দান করো।' অনেক সময় এর চাইতে আরও সুন্দর বাক্যের মাধ্যমে দোয়া করতেন।

এতে করে কিছুতেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত জিনিসে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

তবে এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তো অতিরিক্ত চাওয়ার সময় উত্তম বিশুদ্ধতার শর্ত উল্লেখ করেন নি? মনে রাখবে, ব্যাপারটি অন্তঃকরণের। মুখ হলো অন্তঃকরণের ব্যাখ্যাকারী। সুতরাং অন্তঃকরণে বিষয়টি থাকা সত্ত্বেও যদি মুখের বাক্যে তা উল্লেখ না করা হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই।

চতুর্থ বিষয় ঃ বিপদাপদ

সবরের দ্বারাই কেবল এ ঘাঁটি অতিক্রম করা সম্ভব। এ জন্য সকল ক্ষেত্রেই সবর করা ওয়াজিব। দু'টি কারণে সবর একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত, আল্লাহ্‌র

ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং নিজের উদ্দেশ্য ইবাদতের মাধ্যমেই হাসিল করা। কারণ, সকল ইবাদতের উৎস হলো সবর এবং দুঃখ-কষ্টকে সহ্য ও বরদাশ্‌ত করা। সুতরাং, যে ব্যক্তি ধৈর্যশীল হতে পারবে না, তার পক্ষে ইবাদতের কোন পর্যায়েই প্রকৃত সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। কারণ, যে ব্যক্তি ইবাদতে ইলাহীর সংকল্প এবং সিদ্ধান্ত করবে এবং তজ্জন্য নিশ্চিতভাবে প্রস্তুত হবে, কয়েকটি দিক থেকেই তার সামনে বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট অবশ্যই দেখা দেবে।

প্রথমত, প্রত্যেক ইবাদতে অবশ্যই ব্যক্তিগত দিক থেকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়; এমন কোনো ইবাদত নেই, যাতে ব্যক্তিগত দিক থেকে কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। এ জন্যই ইবাদতের জন্য পূর্ণ উৎসাহ এবং পুরোপুরি সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। তাছাড়া, কামনার বিলুপ্তি ও নফসকে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত কিছুতেই ইবাদত হতে পারে না। কারণ কামনা ও নফস, এ দুটোই নেক কাজে বাধা দান করে। অপরপক্ষে, কামনার বিরোধিতা এবং নফসকে পর্যুদস্ত করা, এ দুটো কাজই মানুষের জন্য বিরাট মর্যাদার কাজ।

দ্বিতীয়ত, কষ্ট স্বীকার করে মানুষ যে ইবাদত করে, তা যাতে বিনষ্ট হয়ে না যায়, তজ্জন্য সেই নেক কাজের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা এবং তাকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী এবং অপিরহার্য। অথচ, আমল এবং নেক কাজের হিফাজত এবং তার উপর 'তাকওয়া' অর্জন করা একটি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন কাজ।

তৃতীয়ত, দুনিয়া ফিতনার স্থান। এখানে অবস্থানকারীদের সকল প্রকারে পরীক্ষা, বিপদাপদ এবং দুঃখ-ক্লেশে পতিত হওয়া স্বাভাবিক এবং অবধারিত। এ বিপদাপদ, পরীক্ষা এবং দুঃখ-ক্লেশও বিভিন্ন রূপে দেখা দিতে পারে। পরিবার-পরিজনের মৃত্যু, পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া এবং হারিয়ে যাওয়া—এ সবই তীব্র বেদনা বহন করে আনে। তেমনি, নিজের ব্যক্তিগত শারীরিক অসুখ-বিসুখও দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, আরও এক প্রকারের বাহ্যিক রোগ আছে, যেমন মানুষের ইযযত হানির কাজে লিপ্ত হওয়া এবং অহঙ্কার ও প্রদর্শনীমূলক মনোবৃত্তির জন্য, পরিণামে লোভ-লালসার শিকারে পরিণত হওয়া। তেমনি গীবত ও মিথ্যা বলার মারাত্মক রোগ। এমনি অসংখ্য রোগ ও বিপদাপদে ভরা এ পার্থিব জীবন। এর প্রতিটির সাথেই সংশ্লিষ্ট রয়েছে বিভিন্ন রকমের বেদনা, ক্লেশ ও অবাঞ্ছিত পরিণতি। সুতরাং, সমস্ত মুসীবতে

ধৈর্য ধারণই একমাত্র পন্থা। অন্যথায়, এসবে জড়িত হয়ে পড়লে ইবাদতে ইলাহীর জন্য মুক্ত হওয়া এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না।

চতুর্থত, আখিরাতকামীদের জন্য অসংখ্য বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়া এবং চিরন্তনের প্রতি ভালোবাসা অত্যন্ত জরুরী ও প্রয়োজনীয়। মনে রাখবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার যত অধিক নিকটবর্তী, দুনিয়ায় তার জন্য তত বেশি বিপদ ও কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করে। তোমরা কি শোননি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই মহাবাণী, যেখানে তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন ঃ

اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ –

মানুষের মধ্যে সবচাইতে অধিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় নবীদের। তারপর আলিমদের। এভাবে মর্যাদার দিক দিয়ে নিম্নগামী হয়।

সুতরাং, যে ব্যক্তি উত্তম ও নেক কাজের সংকল্প ও সিদ্ধান্ত করবে এবং আখিরাতের পথে চলার জন্য প্রস্তুত হয়, সকল প্রকারের বাধা-বিঘ্ন ও বিপদাপদই এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি সবর না করতে পারে এবং তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম না হয়— তাহলে সে পথভ্রষ্ট এবং ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফল হবে এই যে, তার উদ্দেশ্য কোনটাই সাফল্যমণ্ডিত হবে না।

আল্লাহ্ পাক বিপদাপদ ও দুঃখ-ক্লেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য আমাদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং এসবের মাধ্যমে যে পরীক্ষা হয়, তাও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْ تُوا

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا –

অবশ্যই সম্মুখে সম্পদ ও প্রাণের ব্যাপারে তোমাদের পরীক্ষায় নিপতিত করা হবে, নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে শুনতে পাবে বহু কথা তাদের নিকট, তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং তাদের নিকট— যারা মুশরিক, বহু কষ্টের। (সূরা আল ইমরান ঃ ১৮৬)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

আর তোমরা যদি সবর কর এবং তাকওয়া ইখতিয়ার কর, তাহলে অবশ্য তা খুব হিম্মতের কার্য বলে পরিগণিত হবে। (সূরা আল ইমরান ঃ ১৮৬)

মোটকথা, আল্লাহ্ পাক যেন ইরশাদ করছেন ঃ নিজেদের সম্পর্কে এ ধারণাই পোষণ করো যে, নিশ্চিতই তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। যে ব্যক্তি তাতে সবর করবে, সে প্রতিপন্ন হবে প্রকৃত মানুষ বলে। বুঝতে হবে, মানবীয় দৃঢ়তা ও সংকল্পে স্থিরতা তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার যে সংকল্প করে, তাকে তো প্রথমেই অতি মহাধৈর্য ধারণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এটা তার একটি প্রাথমিক কর্তব্য। শুধু তাই নয়, তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে আমৃত্যু পর্যায়ক্রমে আগত সকল প্রকার বিপদ-মুসীবত ও দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করার জন্য। নতুবা তার সংকল্প সংকল্পেই আঁতুড় হবে—— কোন আমল করা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব হবে না। হযবত ফোযায়েল (র) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আখিরাতের পথ অবলম্বন করতে চায়, তাকে অবশ্যই নিজের মধ্যে চার প্রকারের মৃত্যুর উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে। সাদা মৃত্যু, লাল মৃত্যু, কালো মৃত্যু এবং পাণ্ডুর মৃত্যু। সাদা মৃত্যু হলো ক্ষুধার যাতনায়, কালো মৃত্যু হলো মানুষের নিকট থেকে পাওয়া লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ক্লেশ ও বিপদাপদ থেকে, লাল মৃত্যু হলো শয়তানের বিরোধিতা উদ্ভূত আর পাণ্ডুর মৃত্যু হলো একটির পর একটি বিপদ এবং দুর্ঘটনা ও ঘটনার ভিড় থেকে উদ্ভূত।

সবরের উপকারিতা ও পরিচয়

সবরের দ্বিতীয় কারণটি হলো এই যে, সবরে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ, সকল মঙ্গল এবং সকল প্রকারের সাফল্য ও মুক্তি নিহিত আছে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

যে ব্যক্তি সবরের দরুন আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভয় রাখবে, তার জন্য তিনি বিপদাপদ ও মুসীবত থেকে মুক্তির একটা ব্যবস্থা করে দেন (এবং সবরের

দরুনই তাকে তার দুশমনদের উপর জয়ী করেন)। তার জন্য এমন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেন, যে স্থানের কথা সে নিজে ধারণাও করতে পারবে না। (সূরা তালাক ঃ ২-৩)

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

সবর করো; কারণ, তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্যই রয়েছে অতি উত্তম পুরস্কার।

সবরের ভিত্তিতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করছেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا -

তোমার পরওয়ারদিগারের নেকীর ওয়াদা বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে পুরো হয়েছিল, কারণ তারা সবর করেছিল। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৩৭)

বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পত্রের জবাবে লিখেছিলেন ঃ আপনার পূর্বপুরুষগণ সবর করেছিলেন। তাই, তাঁরা সফলকাম হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের ন্যায় আপনিও সবর করুন, তাহলে তাঁদের ন্যায়ই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবেন।

তোমরাও এ পন্থায়ই সাফল্য লাভ করো। কোন এক ব্যক্তি তাঁর কবিতায় বলেছেন ঃ

'সওয়াল এবং দাবি পূরণে যত বিলম্বই হোক না কেন, হতাশ হওয়া উচিত নয়। যখনই তুমি ধৈর্য অবলম্বন করবে, তখনই তোমার সাফল্যের পথ হবে প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ধৈর্যের জন্য তাঁরা প্রয়োজনাতিরিক্তই পাবেন। আর বার বার আবদারকারীর নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তার স্বার্থ সংরক্ষিত হবে।'

সবরের ভিত্তিতেই মানুষের উপর মানুষ প্রাধান্য লাভ করে আর লাভ করে শাসন কর্তৃত্ব। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا-

আমি তাদের সবরের বদলায় তাদের নেতা বানিয়েছি, যারা আমাদের নির্দেশ মুতাবিক হিদায়ত করে। (সূরা সাজদা ঃ ২৪)

সবরের জন্যই বান্দা প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا - نِعْمَ الْعَبْدُ - اِنَّهٗ اَوَّابٌ-

আমি তাকে ধৈর্যশীল পেলাম। কত উত্তম বান্দা সে ! সে ছিল আমার অভিমুখী। (সূরা সাদ ঃ ৪৪)

এ সবরের জন্যই বান্দার জন্য খোশখবরী এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে রহমত ও বরকত নাযিল হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّ لِلّٰهِ

وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ -

ধৈর্যশীলদের শুভ সংবাদ দাও, যারা বিপদের সম্মুখীন হলে বলে যে, আল্লাহ্র জন্য সবকিছু, তাঁরই নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তনকারী, তাদের উপরই তাদের পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হয়।

(সূরা বাকারা ঃ ১৫৫-১৫৬)

সবর অবলম্বনকারীদেরই আল্লাহ্ পাক ভালবাসেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ -

আল্লাহ্ পাক সবরকারীদের ভালবাসেন। (সূরা আল ইমরান ১৪৬)

জান্নাতেও সবরকারীরা লাভ করবেন উঁচু মর্যাদা।

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا -

তারাই সেই ব্যক্তি, সবরের জন্য যাদের দেয়া হবে বালাখানা।

(সূরা ফুরকান ঃ ৭৫)

তাছাড়া, সবর করার পরেই লাভ হয় মহান মর্যাদা ও সম্মান। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَابَرْتُمْ -

(ফেরেশতাগণ বলবেন) তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক— এ জন্য যে, তোমরা সবর করেছিলে।

মোটকথা, সবরের এত সওয়াব যে, তার কোন শুরু বা শেষ নেই। সবরের পরিমাপ করা এবং তা ধারণা করা সৃষ্টির পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সীমাও ততদূর পৌঁছতে অসমর্থ। আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

ধৈর্যশীলদের বেহিসাব সওয়াব দান করা হবে।

সুবহানাল্লাহ্ ! সেই পরম প্রভু কত মহান, কত উদার আর মর্যাদাশীল— যিনি একটুক্ষণ ধৈর্য ধারণের জন্য তাঁর বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কত মর্যাদা ও সৌভাগ্য বরাদ্দ করেছেন।

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ ও সৌন্দর্য সবরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

হুযুর আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا اَعْطٰى اَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ اَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ -

সবর অপেক্ষা উত্তম কোন সম্পদ কারো জন্য দান করা হয়নি।

হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেছেনঃ সমস্ত মুসলমানের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত আছে এক মুহূর্তের ধৈর্যের মধ্যে।

কোন এক ব্যক্তি কি সুন্দরই না বলেছেন ঃ 'সবর হলো আশার চাবিকাঠি। এর মাধ্যমেই সকল কল্যাণ ও মঙ্গল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সবর করা উচিত, যদিও

বিপদের রাত দীর্ঘ হয়ে যায়। কারণ অনেক সময় সবরের মাধ্যমে অনেক লাভের সম্ভাবনা। সবর দ্বারাই অধিকাংশ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

অন্য এক ব্যক্তি বলেছেন ঃ আমি সবর করি। এটা আমার একটি অতি উত্তম অভ্যাস। তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ পাক সবরের জন্য প্রশংসা করেছেন। আমি সর্বদাই সবর করতে থাকবো — যতক্ষণ আল্লাহ্ পাক আমার ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করবেন। সে যাই আসুক না কেন, সবরই হবে আমার ব্রত, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসুক আর অস্বাচ্ছন্দ্য আসুক, তাতে যায় আসে না।

সুতরাং, সফল মানুষেরই এমন একটি মহামূল্যবান অভ্যাসকে গড়ে তোলায় যত্নবান হওয়া উচিত। সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা উচিত এ মহারত্ন হাসিলের জন্য। তাহলে তুমিও হতে পারবে সফলকামীদের দলভুক্ত।

এখন প্রশ্ন হলো, সবরের হাকীকত কি? এবং তার হুকুম কি?

সবরের আভিধানিক অর্থ হলো আটক এবং বাধা দান। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ -

নিজেকে সেই সকল ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট রাখো, যারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং ডাকে। (সূরা কাহফ ঃ ২৮)

পাপীদের উপর যে আযাবের ব্যাপারে দ্রুততা করা হয়নি, আল্লাহ্ পাক তাকেই সবর বলে অভিহিত করেন। কিন্তু উদ্দেশ্য এখানে অন্য জিনিস। সবর আদতে অন্তরের একটি সাধনার নাম। এ জন্য উলামায়ে কিরামদের বক্তব্য অনুযায়ী সবর হলো— দুঃখ-বেদনা ও বিপদাপদে অন্তরকে বিচলিত করা থেকে বিরত রাখা।

বলা হয়েছে যে, বিপদ-মুসীবত থেকে নিশ্চিতভাবে উদ্ধারের সংকল্প করা এবং বিপদ-মুসীবতকে উপেক্ষা করার নাম সবর।

সবরের চাবিকাঠি হলো বিপদাপদের সংখ্যা গণনা ও তার সময়ের খতিয়ান করা। কারণ, বিপদাপদ অতিরিক্তও হয় না, হ্রাসও পায় না। আগেও আসে না, বিলম্বেও আসে না। তাছাড়া, হাহাকারে কোন লাভ তো নেই-ই বরং ক্ষতি অনেক।

তদুপরি, স্মরণ করবে সবরের পুরস্কার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক বিভিন্ন নিয়ামত ও মর্যাদা দানের কথা।

এই ঘাঁটিও অতিক্রম করতে হবে

এই মহা জটিল ও কঠিন ঘাঁটিও তোমাকে অতিক্রম করতে হবে। এ পথে যত বাধা-বিঘ্ন আছে, তার সব দূর করে তোমাকে অবশ্যই এ ঘাঁটি পার হয়ে যেতে হবে। এ জন্য এ পথের সকল কাঁটাই সরাতে হবে। কারণ তা না হলে, তুমি কেবল সর্বদাই তোমার উদ্দেশ্য— ইবাদতের কথা স্মরণ করবে— আলোচনা করবে, কিন্তু তাতে অগ্রসর হতে পারবে না বা অর্জন করতেও সক্ষম হবে না। চিন্তা-ভাবনাই কেবল সার হয়ে দাঁড়াবে। সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে না কখনো। এ পথের যত বাধা আছে, তার সবই দূর করতে হবে। অন্যথায় একটাকে যদি দূর করো অন্যটি এসে তাতে তোমাকে লিপ্ত করবে। ফলে লক্ষ্য থেকে তুমি সরে পড়বে বহু দূরে।

এরপর আছে সবচাইতে মুশকিল, সবচাইতে জটিল পর্যায়। তা হলো রিযিক এবং রুযী। এ ব্যাপারে তোমাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। কারণ, এটি সকল মানুষের জন্যই এমন একটি মহামুসীবত, যা মানুষকে করছে বিব্রত এবং তাদের অন্তরকে রেখেছে সদা ব্যস্ত। শুধু তাই নয়, এ সমস্যা মানুষের দুঃখ-বেদনা বাড়িয়েছে, স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়েছে, এমন কি ধ্বংস করে দিয়েছে। এ সমস্যাই মানুষকে করে তুলেছে মন্দ ও পাপী। আর এ সমস্যাই মানুষকে আল্লাহ্র সেবা এবং আল্লাহ্র দরজা থেকে সরিয়ে নিয়ে মগ্ন করেছে মখলূকের খিদমতে। ফলে মানুষ দুনিয়ায় যেমন গাফলতি, পথভ্রষ্ট, ক্লান্ত, শ্রান্ত, জীর্ণ, অপমানকর ও হীন জীবন যাপন করে; তেমনি আখিরাতেও তাকে যেতে হবে খালি হাতে— নিঃস্ব এবং সম্বলহীন অবস্থায়।

যদি সেদিন আল্লাহ্ পাক রহমত না করেন, তবে তাদের হিসেব-নিকেশ যেমন হবে কঠোর— তেমনি তারা পতিত হবে কঠিন আযাবে।

একবার চিন্তা করে দেখো! রিযিক সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, কিভাবে তিনি এ ব্যাপারে তাঁর ওয়াদা, যিম্মাদার এবং কিভাবে তা দান করা হবে— তা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া নবীগণ, আলিমগণ সর্বদাই এ ব্যাপারে ওয়াজ-নসীহত করে আসছেন— সত্য বাতলিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে

নসীহত করার জন্য কত কিতাব, কত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। শিক্ষণীয় কত উদাহরণ ও প্রমাণাদি মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র আযাবের ব্যাপারে সতর্কও করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ সঠিক পথে ফিরে আসতে পারেনি। মানুষ পারেনি আল্লাহ্ তা'আলার 'তাকওয়া' কায়েম করতে, পারেনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকতে। বরং সেই একই ভয়, একই আশঙ্কায় সর্বদাই দোদুল্যমান যে, কাল সকালের আহার্য পাব কি-না— সন্ধ্যার আহার্যের ব্যবস্থা বুঝি আর হলো না!

এ রোগের মূল কারণ হলো আল্লাহ্ পাকের আয়াতসমূহকে গভীরভাবে অনুধাবন না করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও তার মখলূকাত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা না করা। তাছাড়া আরও কারণ আছে। সে কারণ হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ভুলে যাওয়া — সলফে সালেহীনদের নসীহত ও মূল্যবান কথাকে শয়তানের ধোঁকায় এবং অজ্ঞদের কথায় উপেক্ষা করা এবং গাফিলদের অভ্যাসকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরা যে, তা ধোঁকা ও অজ্ঞতার গহবরে নিমজ্জিত করে দেয়ায় শয়তান সহজেই মানুষের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবেই এ মন্দ স্বভাব ও অভ্যাস একেবারে অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মানসিক দুর্বলতা, ঈমানে ও প্রত্যয়ে দুর্বলতা-- এমনি মারাত্মক কতিপয় রোগ।

কিন্তু যাঁরা সৌভাগ্যবান, যাঁরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, তাঁরা আখিরাতের পন্থা সম্পর্কে অতিশয় আগ্রহী। সে জন্য তাঁরা ও-পথের ঠাঁয়-ঠিকানাও জেনে নিয়েছে। ফলে, দুনিয়ার সাজ-সামানায় তাঁরা বিভ্রান্ত হন না। তারা আল্লাহ্র দীনের প্রতি অটল ও অবিচল। সুতরাং, মখলূকের কোন কিছুর বৃদ্ধি তাঁদের কামনায় স্থান পায় না। তাঁরা পূর্ণ বিশ্বাসী আল্লাহ্ প্রদত্ত ওয়াদায় (যা তিনি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন) তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তাও ঠিক মতোই চিনে নিয়েছেন। তাই তাঁরা কখনো শয়তান, মখলূক এবং নফসের ধোঁকায় ও প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হন না।

মোটকথা, যখনই শয়তান মানুষ এবং নফসের তরফ থেকে তাঁদের উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে, তখনই তার বিরুদ্ধে লেগে যান এবং শুরু করেন সংগ্রাম। ফলে, মখলূক তাঁদের থেকে দূরে সরে যায়, শয়তান পলাতক

হয় আর নফস হয় অনুগত ও বাধ্য। এ সৌভাগ্যবানদের জন্য সুসজ্জিত করা হয় 'সিরাতুল মুস্তাকীম'।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন একবার বিরাট এক জঙ্গল অতিক্রম করার সংকল্প করেছিলেন, তখন শয়তান এসে তাঁকে বলল ঃ এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা। তাছাড়া, আপনার কাছে কোন পাথেয়, সহায়-সম্বল কিছুই নেই। সুতরাং, এ সংকল্প পরিত্যাগ করুন। কিন্তু ইবরাহীম বিন আদহাম (র) আরও দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করলেন যে, এ জঙ্গল তো অতিক্রম করবোই, তদুপরি শয়তানকেও আমার পিছু ছাড়াবো। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, প্রতি মাইলে এক হাজার রাকআত নামায আদায় করে অগ্রসর হবেন। অতঃপর তিনি তাঁর সংকল্প অনুযায়ী অগ্রসর হতে লাগলেন। এভাবে বারো বছর তিনি কাটালেন সে জঙ্গলেই। ইতিমধ্যে একবার খলীফা হারুন-উর-রশীদ হজ্জে গমন করেন। রাস্তায় তাঁকে এভাবে নামায পড়তে দেখলেন। তাঁকে জানানো হলো যে, ইনি ইবরাহীম বিন আদহাম (র)। তখন হারুন-উর-রশীদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আয় আবূ ইসহাক (ইবরাহীম বিন আদহাম)! কেমন আছেন ? ইবরাহীম বিন আদহাম (র) একটি কবিতা পাঠ করে জবাব দিলেন। তিনি বললেন, আমরা দীনের মারফত দুনিয়ার উঁচু মর্যাদা অর্জন করে থাকি। ফলে না দীন অবশিষ্ট থাকে, না এ মর্যাদা। সে বান্দার জন্য খুশি এবং আনন্দের সংবাদ, যে তাঁর পরম প্রভুকে অগ্রাধিকার দান করেছে এবং নিজের দুনিয়ার মাধ্যমে নিজের আশাকে পদানত করেছে।

কোন এক বুযুর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি যখন একটি গ্রামে ছিলেন, তখনই শয়তান এসে তাঁর নিকট বললো ঃ আপনি একা চলেছেন, সামনে যে জঙ্গল দেখছেন তা ভয়াবহ রকমের। এ জঙ্গলে মানুষের কোন নাম-গন্ধও পাবেন না। কিন্তু উক্ত বুযুর্গ ব্যক্তি তখন আরও দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, বেশ তো, নিঃসঙ্গই তো ভালো। তাহলে বরং আমি এমনভাবে রাস্তা অতিক্রম করবো, যাতে কোন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ না হয়। কিছুতেই কোন মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবো না। কারো নিকট কোন কিছু খাবারও চাইবো না। এই বলে তিনি নিজের মুখে ঘি এবং মধু লাগিয়ে নিলেন। অতঃপর মানুষের চলাচলের পথ ছেড়ে দিয়ে এমনিতেই চলতে শুরু করলেন।

তিনি বর্ণনা করছেন ঃ আমি একইভাবে চলছিলাম। হঠাৎ একটি কাফেলা আমার নজরে পড়লো। এরাও রাস্তা ভুলে এদিক-সেদিক রাস্তা তালাশ করছিল। আমি কাফেলা দেখামাত্রই তারা যাতে আমাকে দেখতে না পায়, তজ্জন্য মাটিতে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আল্লাহর কি ইচ্ছা ! কাফেলার লোকগুলি আমার দিকেই এগোতে লাগলো। একেবারে নিকটবর্তী হলো দেখে আমি চোখ বন্ধ করলাম। ওরা আমার নিকটে এসে বলাবলি করতে লাগলো ঃ এ লোকটিও সম্ভবত রাস্তা ভুলে এখানে এসে পড়েছে এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এমনভাবে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। ঘি এবং মধু আনো। একে খাওয়াও। তাহলে সম্ভবত চেতন হতে পারে। বস্তুত, তারা ঘি ও মধু নিয়ে এলো। আমি আমার দাঁতের পাটি ও মুখ খুব শক্ত করে বন্ধ করলাম। এ অবস্থা দেখে তারা ছুরি নিয়ে এলো। উদ্দেশ্য ছুরি দিয়ে দাঁতের খিল ছাড়াবে। তাদের এ ব্যবহার দেখে আমার হাসি পেতে লাগলো। তখন আমি আমার মুখ খুললাম। আমার এ কাণ্ড-কারখানা দেখে কাফেলার লোকেরা বললো ঃ এটা একটা বদ্ধ পাগল। আমি বললাম ঃ 'না, আমি পাগল নই।' অতঃপর তাদের নিকট আমার সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললাম। তারা এ কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেল্লো।

আমাদের জনৈক শায়খ (র) বর্ণনা করেন ঃ শিক্ষা লাভের সময় তিনি কোন সফরে শহর থেকে দূরে এক মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বুযুর্গ ব্যক্তিদের নীতি অনুযায়ী তিনিও নিঃসঙ্গই ছিলেন।

তিনি বললেন ঃ শয়তান আমাকে ধোঁকায় ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো। সে বললো ঃ এই মসজিদটি লোকালয় থেকে বহু দূরে। বরং আপনি মানুষের বসতিপূর্ণ এলাকায় যেসব মসজিদ আছে, তারই একটায় অবস্থান করুন। তাহলে মানুষের সংশ্রব পাবেন। এমনকি, নিজের পরিবার-পরিজনও আপনার খোঁজ নিতে আসবে, আপনিও তাদের দেখতে পাবেন। কিন্তু আমি সে মসজিদ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে রাযী হলাম না। বরং বললাম যে, আমি আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি হালুয়া ব্যতীত অন্য কিছুই মুখে নেবো না। তাও ততক্ষণ পর্যন্ত খাব না— যতক্ষণ না সেই হালুয়া কেউ আমার মুখে তুলে দেয়।

বস্তুতঃ অতঃপর আমি এশা'র নামায আদায় করে মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিলাম। রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হলে অকস্মাৎ এক লোক এসে দরজার

কড়া নাড়া শুরু করলো। তার হাতে একটি প্রদীপও ছিল। বহুক্ষণ নাড়ার পর বাধ্য হয়েই আমি দরজা খুলে দিলাম। দেখি যে, এক বৃদ্ধা ও তার সাথে এক যুবক ছেলে। এরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলো। অতঃপর আমার সামনে হালুয়ার একটি পাত্র রাখলো। বুড়ি বললো ঃ এই যুবক আমার ছেলে। এর জন্য আমি হালুয়া প্রস্তুত করেছিলাম। ছেলে হঠাৎ শপথ করে বসলো যে, অতিথি ছাড়া কিছুতেই আমি এ হালুয়া মুখে তুলবো না। সে অতিথি এমন হতে হবে, যিনি মসজিদে অবস্থান করছেন। আল্লাহ্ তোমার উপর সদয় হোন। খাও। এই বলে বৃদ্ধা নিজ হাতে হালুয়া তুলে আমার মুখে একবার— আবার তার ছেলের মুখে দিতে লাগলো। এভাবে আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে খেলাম। অতঃপর তারা মা-ছেলে চলে গেলো।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে দরজা পুনরায় বন্ধ করে দিলাম।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলি এবং সালেহীনদের বর্ণিত আরও এ ধরনের বহু ঘটনা, যেসব ঘটনায় তাঁদের সাধনা এবং শয়তানের কারসাজির বিরোধিতার কথা রয়েছে, তা থেকে আমরা তিনটি মোদ্দকথা লাভ করতে পারি।

প্রথমত, রিযিক এবং রুযী যতটুকু নির্ধারিত আছে, তা কোন অবস্থায়ই বিনষ্ট হবার নয়।

দ্বিতীয়ত, মনে রাখতে হবে যে, রিযিকের ব্যাপার ও আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা স্থাপনের ব্যাপারটি খুবই কঠিন ব্যাপার। শয়তান এ পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এখানে তার চেষ্টার কোন অন্ত নেই। লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে, এমন সব বড় বড় সাধককেও শয়তান পরিত্যাগ করেনি— তাদেরও সে ধোঁকায় পতিত করার চেষ্টা করেছে। এত সাধনা, এত ক্লেশকর পরিশ্রমের পরেও শয়তান হতাশ হয়ে পড়েনি— তাদের ধোঁকায় ফেলার জন্য কত না ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে ! এতদূর অগ্রসর হওয়ার পরও শয়তানকে পাছ-ছাড়া করবার জন্য এসব সাধককে যথেষ্ট চেষ্টা-তদবির এবং সাধনা করতে হয়েছে। সুতরাং আমি শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি যদি সত্তর বছর ধরে শয়তান এবং নিজের নফসের সাথে সংগ্রাম করে, তথাপিও শয়তান ও নফসের ব্যাপারে তার নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়। কারণ, শয়তান এ ধরনের ব্যক্তিকেও এমন ধোঁকায় পতিত করতে সক্ষম, যে ধরনের

ধোঁকায় নিপতিত করতে সক্ষম সে প্রথম প্রথম ইবাদত শুরুকারীকে। এমনকি, সাধারণ একজন গাফিল এবং যে কখনো এ ধরনের সাধনার কথা ধারণাও করেনি, তাকে যেমন শয়তান ধোঁকায় নিপতিত করতে পারে, তেমনি পারে সে সত্তর বছর ধরে সাধনাকারীকে। এমনকি, এভাবে সে সব কিছু ধ্বংস এবং বরবাদ করে দিতেও সক্ষম। সুতরাং, শয়তান এবং নফসের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া কারো পক্ষেই উচিত নয়।

তৃতীয়ত কেবল চেষ্টা ও সাধনার দ্বারাই এ ব্যাপারে পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়। কারণ, এসব সাধক ব্যক্তি রক্ত, গোশত ও শরীরের দিক দিয়ে তোমাদেরই মতো— বরং তোমাদের চাইতেও পাতলা, হালকা এবং দুর্বল শরীর সম্পন্ন হলেও তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের শক্তি, বিশ্বাসের আলো এবং ধর্মের প্রেরণা অনেক বেশি। সাধনা ও সংগ্রামের জন্য তারা সর্বদা প্রস্তুত।

সাধনার পথে যে কোন ত্যাগ, যে কোন পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্য তাঁরা দৃঢ়সংকল্প।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন— অন্তরের প্রতি দৃষ্টি রেখে গভীর চিন্তা-ভাবনাসহ আমরা যেন এ মুশকিলের ঘাঁটিটি অতিক্রম এবং রোগের প্রতিকারে সক্ষম হই।

বিশেষ আলোচনা

উপরিউক্ত আলোচনাগুলোকে একত্রে গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পর আমার নিকট যে সূক্ষ্ম বিষয়টি ধরা পড়েছে, এখন আমি সে বিষয়টি এখানে প্রকাশ করতে চাই। কারণ, উপরিউক্ত আলোচনাসমূহকে অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়ার জন্য এ সূক্ষ্ম আলোচনাটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। তাছাড়া এ মহাঘাঁটি অতিক্রম এবং এতে যে বিপদ-আপদ রয়েছে, এ বিষয়টি জানা থাকার ফলে তাও বরদাশত করা সহজ হবে।

তুমি যদি গভীরভাবে চিন্তা কর এবং এ ব্যাপারে আমল করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, তাহলে মখলূকাতের মধ্যে একটি উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার পন্থা সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। প্রথমে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বান্দার রিযিকের ভার নেয়ার ওয়াদা দিয়েছেন। এখন তুমি একবার ভেবে দেখ, দুনিয়ার কোন বাদশাহ যদি এ ওয়াদা করেন যে, তিনি তোমাকে আহার করাবেন আর তুমি জান যে, এ বাদশাহ ওয়াদা পালনকারী এবং তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না কিংবা কখনো ওয়াদা খেলাফ করবেন না, তাহলে কি তুমি নিশ্চিন্ত হবে না ? নিশ্চয়ই হবে। এমনকি কোন দোকানদার, ইয়াহুদী বা কোন খৃস্টান বা অগ্নিপূজক— যার মনোবৃত্তি তোমার জানা নেই, সেও যদি তোমাকে রাতের জন্য খাবার দেবে বলে ওয়াদা করে, তাহলেও তা তুমি তার উপর আস্থা স্থাপন করবে এবং তার কথা অনুযায়ী রাতের জন্য নিজের খাবার প্রস্তুত করবে না। তাহলে বল, এটা কেমন কথা যে, আল্লাহ্ পাক তোমাকে ওয়াদা দিয়েছেন, তোমার রিযিকের যিম্মাদারী ও দায়িত্ব তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন— বরং এ জন্যে তিনি বারবার শপথ করেছেন, তবুও তুমি তাঁর ওয়াদায় আস্থা স্থাপন করতে পারছ না এবং তাঁর যিম্মাদারীতে নিজের রিযিকের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারছ না। তাঁর শপথের কোন গুরুত্ব না দিয়ে তুমি অনাবশ্যক পেরেশান, রিযিক ও রুযীর জন্য তুমি সদা ব্যস্ত !

চিন্তা করে দেখ, এটা কত ন্যাক্কারজনক ব্যাপার। কত বড় বিপজ্জনক এ বিষয়টি! হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ

'তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার রিযিক ও রুযী অন্যের কাছে অনুসন্ধান এবং বিপদাপদের কথা ভুলে গিয়ে নির্ভাবনায় রাত যাপন করছো? একজন সাধারণ মহাজন কর্তৃক তোমার যিম্মাদারী গ্রহণের ফলে তুমি আনন্দিত হয়ে যাও, সে মহাজন মুশরিক হোক আর যেই হোক। অথচ আল্লাহ্ পাক তোমার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তুমি সন্তুষ্ট হতে পারছ না ? মনে হয়, তুমি আল্লাহ্র পবিত্র গ্রন্থে যা কিছু লেখা আছে, তা আদৌ পড়নি। আর, তুমি এমনি অবিশ্বাসীরূপেই রাত যাপন করছ !'

এ জন্যই এ বিষয়টি সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের মানুষের কাছ থেকে মারিফাত এবং দীন কেড়ে নেয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

মুমিনদের কেবল আল্লাহ্র ওপরই ভরসা করা উচিত।

আরও বলা হয়েছে ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

আল্লাহ্র ওপরই ভরসা কর, যদি তুমি মুমিন হয়ে থাক।

সুতরাং যে মুমিন ব্যক্তি ধর্মীয় কাজে চেষ্টা-তদবির ও সাধনা করার ব্যাপারে আগ্রহী, তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় সূক্ষ্ম বিষয়ঃ একটি কথা প্রথমেই উপলব্ধি করা দরকার যে, রিযিক পূর্বেই বন্টন করা হয়েছে। এ কথার প্রমাণ কিতাবুল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ(সা)-এর হাদীসে সুস্পষ্টভাবেই বিদ্যমান। তাছাড়া, সে বন্টনে কোন প্রকার পরিবর্তনও সম্ভব নয়। সুতরাং তুমি যদি তাতে কোন রকম পরিবর্তন এবং সে বন্টনের বিরুদ্ধে কিছু হওয়াকে জায়েয মনে কর (আল্লাহ্ এমন না করুন), তাহলে মনে রাখবে যে, তুমি কুফরীর দরজায় উপনীত হয়েছ। আর যদি তুমি মনে কর যে, উপরিউক্ত বিষয়ই সত্য (অর্থাৎ রিযিক পূর্বেই বণ্টিত হয়েছে), তাহলে এর

অনুসন্ধান এবং ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত থাকা পার্থিব জীবনে অপমান, হীনতা ও বিপদাপদের ঝুঁকি নেয়া এবং আখিরাতের জীবনের জন্যও লাঞ্ছনা, অপমানের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোনই উপকার তাতে নেই। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ গরু এবং মাছের পিঠে অমুকের ছেলে অমুকের রিযিক লিপিবদ্ধ আছে। লোভী ও অতৃপ্ত মানুষের জন্য অসম্মান ও দুঃখ-ক্লেশ ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান থাকে না।

আমাদের ওস্তাদ (র) সাহেবও বলতেনঃ যে জিনিস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, তুমিই তা খাবে— সে জিনিস তুমি ব্যতীত অন্য কেউই খেতে পারবে না। সুতরাং, রুযীর ব্যাপারে আস্থাবান হও এবং সম্মানিত পথে তা উপার্জন করো। অসম্মান ও হেয় পথে কখনো তা অনুসন্ধান করো না।

এ বিষয়টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করত সক্ষম হলে যে-কোন মানুষই 'অল্পে তুষ্টির' ন্যায় মহানিয়ামত অর্জন করতে সমর্থ হবে।

তৃতীয় সূক্ষ্ম বিষয়ঃ আমার ওস্তাদ (র) তাঁর ওস্তাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ রিযিকের ব্যাপার আমার যে জন্য আস্থা অর্জন হয়েছিল, তা এই ঃ 'আমি ভাবলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম ঃ রিযিক কি জীবনের জন্য নয় ? রিযিকই তো জীবন ও মৃত্যু, এর যে কোন একটা অবলম্বন করতে পারে (অর্থাৎ রিযিক থাকলে জীবন, অন্যথায় মৃত্যু)। সুতরাং, বান্দার জীবন যখন আল্লাহ্র কুদরতের অধীন, তখন রিযিকের ব্যাপারটিও স্বাভাবিকভাবেই একই সাথে তাঁরই হাতে থাকবে, এতে অন্যথা হওয়ার কোন পথ নেই। তিনি যদি চান আমাকে রিযিক দেবেন, আর যদি চান, তবে বন্ধ করবেন। এটা আমার আয়ত্তে কিছুতেই নয়। বরং তা আল্লাহ্র হাতেই রয়েছে। তিনি যেভাবে চান, কারণ সৃষ্টি করে যান।

এ ভাবনাই আমাকে নিশ্চিত করে দেয়। এ বিষয়টিই জ্ঞানী ও বিবেকবান অনুসন্ধিৎসু শ্রেণীর লোকের জন্য যথেষ্ট।

চতুর্থ সূক্ষ্ম বিষয়ঃ আমি আগেই এ বিষয়টি আলোচনা করেছি। তার মোদ্দাকথা এই যে, রিযিকের যিম্মদারী আল্লাহ্ পাক নিয়ে নিয়েছেন।

কারণ ও মাধ্যম

এখন প্রশ্ন হলো খাওয়া-দাওয়ার একটা উপায় (কারণ) ও মাধ্যমের প্রয়োজন আছে কি না? তাহলে জেনে রাখ, বান্দা যখন ইবাদতে ইলাহীর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এ আল্লাহ্ তা'আলার উপরেই ভরসা করে, তখন অনেক সময় তার রিযিকের উপায়-উপকরণ বা কারণ ও মাধ্যম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তার জন্য সে ক্লান্ত এবং এর গূঢ় রহস্য জানা থাকার ফলে সে উদ্বিগ্নও হয় না। কারণ, রিযিকের যিনি যিম্মাদার, তিনি বান্দার শরীর রক্ষা করে থাকেন (তাওয়াক্কুলও এ ব্যাপারেই)। এর বেশি কিছু নয়। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকেও এ তাওয়াক্কুলের প্রতীক্ষা করা যায়। সুতরাং, বান্দা যাতে আমৃত্যু ইবাদতের হকসমূহ পুরোপুরি এবং যতক্ষণ (শরীয়ত অনুযায়ী যোগ্যতা) সে 'মুকাল্লিফ' থাকে, ততক্ষণ যাতে সে তা আদায় করতে পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ পাক অবশ্যই প্রয়োজনীয় শক্তি ও ক্ষমতা দান করতেই থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এ প্রয়োজনীয় শক্তি ও ক্ষমতাই তো কাম্য।

তবে কথা হলো যে, আল্লাহ্ পাক সর্ববিষয়েই সর্বশক্তিমান। সুতরাং, তিনি যদি চান যে, বান্দাকে খানাপিনা অথবা মাটি বা কংকরের মাধ্যমে জীবিত রাখবেন, তাও তিনি পারেন। আর যদি চান, কেবল তসবীহ-তাহলীল পাঠের দ্বারাই (যেমন ফেরেশতাদের বেলায় হয়) জীবিত রাখবেন, তবে তাও তাঁর পক্ষে সম্ভব। অথবা যদি তাঁর মর্জি হয়, সবকিছু ব্যতীত এমনিতেও জীবিত রাখতে পারেন।

যা হোক, প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বান্দাকে ইবাদত করার শক্তি ও সামর্থ্যবান রাখা। এ ব্যতীত আর কিছু নয়। খানাপিনা, কামনার তৃপ্তি কিংবা স্বাদ-সম্ভোগ এসব উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং কারণ, উপায়-উপকরণ এসব ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

এ জন্যই দেখা যায় যে, আবেদীন ও জাহিদগণ (সংসার-ত্যাগী সাধক) রাত অথবা দিন, পাহাড় অথবা সমুদ্র — সর্বত্র সমভাবে চলতে পারেন, তাতে তাঁদের কখনো শক্তি বা সামর্থ্যের অভাব হয় না। অনেকে দশদিন, অনেকে এক মাস, আবার কেউ কেউ দু'মাস পর্যন্ত না খেয়েই কাটিয়ে দেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের শক্তিতেই তবুও জীবিত থাকেন। অনেকে হয়তোবা বালুই মুষ্টিবদ্ধ করে করে মুখে তোলেন। আল্লাহ্ পাক তার মধ্যে তাঁদের রিযিক নির্ধারিত করেন।

সুফিয়ান সওরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একবার মক্কা মুয়াজ্জমায় তাঁর খরচ ফুরিয়ে গেল। তিনি পনেরো দিন পর্যন্ত কেবল বালু খেয়েই কাটিয়ে দিলেন।

আবূ মাবিয়া আসওয়াদ বর্ণনা করেন ঃ আমি ইবরাহীম বিন আদহাম (র)-কে বিশ দিন পর্যন্ত কেবল মাটি খেয়েই থাকতে দেখেছি।

আ'মাল বর্ণনা করেন— আমাকে ইবরাহীম তায়মী বলেছেন ঃ আমি এক মাস ধরে কিছুই খাইনি। আমি বললাম ঃ এক মাস ধরে ? তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে দু'মাস থেকে। কিন্তু এর মধ্যে একদিন এক ব্যক্তি আমাকে আঙুরের একটি খোসা খাওয়ার জন্য দিয়েছিল। সে আঙুরের খোসা দেয়ার সময় আমাকে তা খাওয়ার জন্য শপথ নিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে তা আমি খেয়েছিলাম। এ জন্য আমার পাকস্থলীতে গোলযোগ দেখা দিয়েছে।

আমি বলছি, এতে তাজ্জব হবার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ্ যা করতে চান, তিনি তা-ই করতে পারেন। লক্ষ্য করে দেখুন, এমন বহু রোগী আছে, যে এক মাস ধরে হয়তো কিছুই খেতে পায় না, এমনকি এক ফোটা পানিও না। তবুও সে বেঁচে থাকে। অথচ রোগী আর সুস্থ মানুষের মধ্যে পার্থক্য অনেক। রোগের চাপে রোগী সবদিক থেকেই থাকে দুর্বল, মানসিক শক্তিও যায় কমে, সুস্থ মানুষের তা হয় না।

ক্ষুধার্ত অবস্থায় যে মানুষ মারা যায়, সে ক্ষুধাতেই মারা যায় না— মৃত্যুর আগমনের ফলেই মারা যায়। যেমন মারা যায় ভরা পেটওয়ালা মানুষ।

আবি সাঈদ খারাজ (র) বলেন ঃ আমার সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে এই ছিল যে, তিনি আমাকে প্রতি তৃতীয় দিবসে আহার করাতেন। একবার আমি জঙ্গলে চলে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর তিনদিন অতিক্রান্ত হলো। এর মধ্যে আমি কোন জিনিস মুখে তুললাম না। চতুর্থ দিন আমি খুব দুর্বলতা অনুভব করলাম। আমি নিজের জায়গায়ই বসে পড়লাম। অকস্মাৎ গায়েবী আওয়াজে বলা হলো ঃ

'উপায়-উপকরণ এবং শক্তি-সামর্থ্য— এ দুটোর মধ্যে তোমার কোন্টা পছন্দ ?

আমি বললামঃ শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীত আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নেই।

অতঃপর আমি শক্তি অনুভব করতে লাগলাম। আমি তখুনি দাঁড়িয়ে গেলাম (ইবাদতে)। এভাবেই বারো দিন কেটে গেল। এর মধ্যে কোন কিছু মুখে দিলাম না। কিন্তু তাতে সামান্যতমও কষ্ট বা অসুবিধা কোন কিছুই আমার হলো না।

সুতরাং বান্দা যখন দেখবে যে, রিযিকের উপায়-উপকরণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং নিজের মধ্যে আল্লাহ্র উপর ভরসা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, তখন তার নিশ্চিত বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহ্ পাক তাকে শক্তি-সামর্থ্য অবশ্যই দান করবেন। এ ব্যাপারে ঘাবড়াবার কিছুই নেই। বরং এজন্য ওয়াজিব ও জরুরী হবে আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করা। কারণ, এটা তাঁর একটি ইহ্সান এবং মস্ত বড় নিয়ামত যে, তাকে রিযিকের দুশ্চিন্তা এবং ক্লেশে পতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। উদ্দেশ্য ও কাম্য জিনিস হাসিল হয়েছে এবং তার অবস্থা ফেরেশ্তাদের অনুরূপ হয়ে গেছে। একটি অলৌকিক ক্রিয়া তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তদুপরি তার হাসিল হয়েছে পশু ও জীব-জানোয়ারের উপরের শ্রেণীর এক স্বভাবের মর্যাদা। সুতরাং আল্লাহ্র শোকরিয়া তার জন্য এ পর্যায়ে অবশ্যই কর্তব্য।

অতি উত্তম ও অতি মহান এ ফল লাভের বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

সম্ভবত, পাঠকের মনে সন্দেহ জাগছে যে, এ গ্রন্থের নীতির পরিপন্থী এ বিষয়টির আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! বিষয়টি এমন যে, এর যতটুকু আলোচনা দরকার, সে তুলনায় এতটুকু আলোচনা অতি সামান্যই। কারণ, আল্লাহ্র ইবাদতের ক্ষেত্রে এটি একটি মস্ত বড় জিনিস। বরং দুনিয়া এবং বন্দেগী— উভয়টিই এ জিনিসের উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং, যার সাহস আছে, তার কর্তব্য হবে এ বিষয়টিকে ধরার এবং এ ব্যাপারে সকল করণীয় পালন করে এ থেকে ফায়দা গ্রহণের। অন্যথায় উদ্দেশ্য হবে পণ্ড, আর লক্ষ্য হবে ভ্রষ্ট।

তাছাড়া, একথা তো সত্য যে, তোমাকে পন্থা বাত্লাতে পারে যে জিনিসটি, তা হলো পরকালপন্থী উলামা এবং আল্লাহ্র আরিফদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সঞ্জাত জ্ঞান। অথচ তাঁরা সকলেই সমস্ত বিষয়কে ন্যস্ত করেছেন আল্লাহ্র প্রতি আস্থা (ভরসা) রাখার উপর। তাঁরা আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য প্রথমেই নিঃসঙ্গ ও একক জীবন অবলম্বন করেছেন। তারপর সমস্ত প্রকারের

উপায়-উপকরণের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। শুধু তাই নয়, এ সম্পর্কে তাঁরা বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, বহু নসিহত করে গেছেন। তাঁদেরই সৌভাগ্য হয়েছে আল্লাহ্র ফযলে নেতাদের মধ্য থেকে তাঁদের সঙ্গী সাহায্যকারী এবং সেবক হিসাবে পাবার। যাঁরা কল্যাণ এবং মঙ্গলের এমন মকাম হাসিল করেছেন, মাননীয় ইমামদের কোন দলই সে মকাম কখনো হাসিল করতে পারেন নি। তাঁরা কারা? তাঁরাও সেই সংসার-বিরাগী, সংসার-ত্যাগী বুযুর্গেরই দল। বরং এঁরা যতদিন পর্যন্ত মাদ্রাসা ও ইবাদতখানায় আমাদের ইমাম সাহেবদের নীতি অনুযায়ী অবস্থান করেছেন, তখন তাঁরা ছিলেন সব সময় প্রিয় ও সম্মানিত। এঁদের কারো বা জ্ঞানের দিক দিয়ে ইমামের মর্যাদা ছিল। যেমন ওস্তাদ আবি ইসহাক, আবি হামিদ, আবিত্ তাইয়্যেব, ইবনে মুবারক এবং আমাদের ওস্তাদ শায়খ (র) প্রমুখ।

অথবা ইবাদতের দিক দিয়ে তাঁরা অর্জন করেছিলেন প্রকৃত মকাম। উদাহরণস্বরূপ আবি ইসহাক সিরাজী, আবি সাঈদ সূফী এবং নসরুল মুকাদ্দসী প্রমুখের নাম করা যায়। এঁরা তাঁরাই, যাঁরা সংসার বর্জন ও জ্ঞানের দিক দিয়ে সর্বযুগের বিশিষ্ট শ্রেণীর পর্যায়ে নিজেদের উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন।

অবশ্য শেষের দিকে এসে আমাদের অনেকেরই অন্তর দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাঁরা এমন সব বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন, যেগুলোর ক্ষতি লাভের তুলনায় অনেক বেশী। ফল এই হয়েছে যে, ব্যাপার উল্টো হয়ে গেছে। বরকত খতম হয়ে গেছে। সাধনার মাধুর্য ও স্বাদ হয়ে গেছে বিলুপ্ত। এখন কারো ইবাদত এমন নয় যে, তার গুণকীর্তন করা যায় অথবা কারো নিকট এমন জ্ঞান ও গূঢ় তত্ত্বও নেই যে, তা অর্জন করা যায়।

তাছাড়া, আজও আমাদের মধ্যে দু'একটি জায়গায় যে আলোর রেশ পাওয়া যায়, তাও সেই বুযুর্গদেরই বরকতের জের। তাঁদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে যাঁরা এগিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই মধ্যে সেই নূর প্রজ্বলিত। এ প্রসঙ্গে হারিসুল মোসাহিবী, মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশ্ শাফেয়ী (র) এবং মযনী ও হরমলা (র)-র নাম করা যায়। মাননীয় ইমামদের মধ্যে এঁদের গুণ-বৈশিষ্ট্য কোন এক ব্যক্তির মন্তব্যের মতোই, যিনি বলেছেনঃ সেই সব ব্যক্তি, তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতি পবিত্র ও অতি নির্মল অবস্থার মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে কেবল সেই পরম-প্রভু, পরম প্রিয় ব্যতীত অন্য কেউ বা অন্য কিছুই পড়েনি।

ফযীলত ওয়ালাই (মর্যাদাবান) খাঁটি এবং প্রতিনিধিত্বের যোগ্য। সকল নেতার নেতাকে পাওয়াই তাঁর ব্রত। প্রত্যেক ধৈর্যশীলেরই ধৈর্যের বাঁধন খুলে গেছে। কিন্তু দীন তার বাঁধনের একটি বাঁধনও খুলেনি।

মোটকথা, প্রথম যুগে আমরা ছিলাম বাদশাহ্ (নেক আমলের বাদশাহ্)। কিন্তু আমলের কমতির দরুন আমরা নীচে নেমে গেছি। প্রথমে আমরা ছিলাম অশ্বারোহী (আমল করার গতি ছিল অমন), কিন্তু এখন আমরা পদাতিক। আহা! যদি আমরা নিজেদের পথ থেকে একটু বিচ্যুত না হতাম! সকল বিপদে তো আল্লাহ্ পাক সাহায্যকারী আছেনই। এখন আল্লাহ্র দরবারেই একটি ভিক্ষা মাগি, তিনি যেন আমাদের সে সুবাস থেকে বঞ্চিত না করেন। আয় আল্লাহ্! তুমি অতি মেহেরবান, অতি দয়াময়।

আল্লাহ্র উপর সবকিছু ন্যস্ত করার কারণসমূহ

এ ব্যাপারে সম্যক উপলব্ধির জন্য দু'টি বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। প্রথমত, সকল ইখতিয়ার সে মহিমময়ের, সকল কাজের সকল দিক, বাহ্যিক অথবা অভ্যন্তরীণ, সকল অবস্থা এবং তার পরিণাম সম্পর্কে যিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং, এরপর কোন কিছুর ইখতিয়ার আর কারো জন্য প্রতিপন্ন হয় না। যদি তা-ই হয় তাহলে যে সব বিষয় বা ব্যাপারে কল্যাণ ও শুদ্ধি আছে, ধ্বংসকারী ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে তা কিছুতেই বেছে নেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ, তুমি যদি কোন অজ্ঞ রাখালকে কিছু জাল ও খাঁটি স্বর্ণ মুদ্রা একত্র করে দেখে নিতে বলো কিংবা ভাল-মন্দ নির্দেশ করতে বলো, তা সে কিছুতেই পারবে না। যদি স্বর্ণকারকে না বলে অন্য কোন দোকানদারকে বলো, তবে তার পক্ষেও মোটামুটি এ-কাজটি কঠিনই হবে। তাছাড়া, তাতে তুমি নিজেও নিশ্চিত হতে পারবে না। মোটকথা, যতক্ষণ তুমি স্বর্ণকারকে না দেখাবে, (যার স্বর্ণের ব্যাপারে সকল দিক থেকেই পূর্ণ জ্ঞান আছে, কোন্টা খাঁটি ও কোন্টা নকল, তা যে চিনতে পারবে ঠিকমত) ততক্ষণ তুমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে না।

তেমনি, সকল কর্মের সকল দিক, সকল বিষয়ের সকল অবস্থা ও পরিণতি যার সম্পূর্ণ জানা আছে, তিনি আর কেউ নন; তিনি স্বয়ং আল্লাহ্। সুতরাং, সেই

পরম জ্ঞানী, পরম হিকমতওয়ালা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারই বা ইখতিয়ার হাসিল হতে পারে? আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ইরশাদ করেছেনঃ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ -

তোমার প্রভু যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন এবং যে বিষয় ইচ্ছা পছন্দ করেন: তাদের বেছে নেয়ার কোন অধিকার নেই। (সূরা কাসাসঃ ৬৮)

অন্যত্র বলেনঃ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ -

তোমার রব সেই জিনিসেরও খবর রাখেন, যা তাদের অন্তরে লুক্কায়িত আর যা তারা প্রকাশ করে। (সূরা কাসাসঃ ৬৯)

কোন এক সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক তাঁকে ইংগিতে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি যা পাবে তা-ই দেয়া হবে। কিন্তু তিনি মনে মনে বললেনঃ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যিনি সবচাইতে বেশী অবগত তিনি আমার ন্যায় অজ্ঞকে বলছেন কোন জিনিস বেছে নিতে। তাই আরয করলেনঃ আমার জন্য কোন্‌টা ভাল হবে, তার আমি কি জানি? সুতরাং আমি কোন্‌টা সম্পর্কে সওয়াল করবো? বরং আমার জন্য তুমি যা ভাল মনে করো, তা-ই আমার জন্য নির্ধারিত করো।

দ্বিতীয় কারণ— কোন ব্যক্তি যদি তোমাকে বলে যে, আমি তোমার সমস্ত কাজ করে দেবো— যেখানে তোমার যা প্রয়োজন, সেখানে প্রয়োজনানুযায়ী আমি সরবরাহ করবো। সুতরাং তোমার সবকিছুর দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও। আর তুমি তোমারই যোগ্যতা অনুযায়ী যে-কোন একটা কাজে লিপ্ত থাকো। তুমি জান যে, এই ব্যক্তি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী (তোমার মতে), সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। তেমনি এ ব্যক্তি সবচাইতে অধিক দয়াশীল, অধিক মুত্তাকী এবং সৎ। লোকটি ওয়াদা পালনের ব্যাপারেও সবচাইতে দৃঢ়। তাহলে কি এ ব্যক্তি তোমার নিকট দুর্লভ বলে মনে হবে— তুমি কি তাহলে সেই ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত, তাঁর প্রশংসায় মুখরিত হবে না? তুমি তার এ অনুদানকে কি গভীর আনন্দের সাথে গ্রহণ করবে না? নিশ্চয়ই তা করবে।

এরপর সে যদি তোমার জন্য এমন একটি বিষয় মনোনীত করে, যার কল্যাণকারিতা ও বিশুদ্ধতার শক্তি সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞানই নেই, তথাপি তুমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হবে না। বরং তার উপর ভরসা ও আস্থাই স্থাপন করবে, তার মনোনীত বিষয় সম্পর্কে তুমি থাকবে নিশ্চিত। কারণ তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, সে ব্যক্তি কিছুতেই তোমার জন্য কল্যাণকর উত্তম বিষয় ব্যতীত অন্য কোন কিছু নির্বাচন করতেই পারে না— বরং সকল অবস্থায়ই সে তোমার জন্য উত্তম এবং কল্যাণকর জিনিসই নির্বাচিত করবে। তাহলে চিন্তা করে দেখো, সেই ব্যক্তির উপর তোমার বিষয় ও ব্যাপারকে ন্যস্ত করার ফলে তোমার মনে কিরূপ একাগ্রতা জন্ম লাভ করছে, তুমি কি সুন্দর নিশ্চয়তা অনুভব করছো?

এবার চিন্তা করে দেখো, একজন সাধারণ মানুষের উপর নিজের সকল বিষয় ও ব্যাপারকে ন্যস্ত করার ফলে তুমি যখন এমন নিশ্চিত হতে পারছো, তখন আসমান ও যমীনের মাঝে যা-কিছু আছে, সব কিছুর যিনি মালিক, সব কিছু সম্পর্কে যাঁর জ্ঞানের সীমা নেই, সেই রাব্বুল আলামীনের উপর তোমার বিষয় বা ব্যাপারকে অর্পণ না করার এমন কি কারণ থাকতে পারে? অথচ তিনিই সকল জ্ঞানী, সকল শক্তিমানের শক্তির উৎসও তিনিই। সকল করুণার আধারও তিনিই, তাঁর চাইতে অধিক দয়াবান আর কেউ নেই। সমস্ত বিত্তবান ও সম্পদশালীও তাঁর কাছে তুচ্ছ। সেই পরম প্রভু যদি তাঁর অসীম জ্ঞান অপরূপ করুণা এবং স্বীয় মহান কৌশলে তোমার বিষয় মনোনীত করেন, যে বিষয় সম্পর্কে তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধি পৌঁছতেও সমর্থ নয়—আর তুমি যদি তোমার আখিরাতের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে লিপ্ত হয়ে যেতে পারো, তাহলে তোমার তাতে অসম্মতি বা অসন্তুষ্টির কি আছে? সেই পরম প্রভু তোমার জন্য যা নির্দিষ্ট করেন, সে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান থাক বা না থাক, তাতেও তোমার আস্থা স্থাপনই হবে অবশ্য কর্তব্য। কারণ, সকল অবস্থায় কেবল তাঁরই মধ্যে তোমার কল্যাণ ও মঙ্গল অবধারিত।

ভাগ্যে সন্তুষ্টি কি কারণে জরুরী?

এ ব্যাপারেও দু'টি কারণের প্রতি দৃষ্টি যথেষ্ট হয়। প্রথমত, ভাগ্যে সন্তুষ্টির মধ্যে উপস্থিত এবং সুদূরপ্রসারী—উভয় রকমের উপকারই নিহিত থাকে।

উপস্থিত উপকার তো এই হয় যে, এতে করে অন্তর মুক্ত হয় এবং তা থেকে অনাবশ্যক চিন্তা ও অবাঞ্ছিত ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে যায়। এ জন্যই কোন কোন সাধক ব্যক্তি বলেছিলেনঃ তকদীর যখন অবশ্যম্ভাবী এবং অবধারিত, তখন এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা এবং দুঃখ তাপ সত্যিই অনাবশ্যক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবনে মসউদ (রা)-কে বলেছিলেনঃ

لِيَقِلَّ هَمُّكَ - وَ مَا قُدِّرَ يَكُنْ وَ مَا لَمْ يُقَدَّرْ لَمْ يَأْتِكَ -

নিজের দুশ্চিন্তাকে হ্রাস করো। কারণ, তকদীরে যা লেখা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে। আর তকদীরে যা লেখা হয়নি তা কখনো আসবে না।

রসূলুল্লাহ (সা)-এর এ মন্তব্যটুকু এমন ব্যাপক অর্থবহ যে, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এর সুদূরপ্রসারী ফল হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং সওয়াব লাভ। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ -

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।
(সূরা বায়্যিনা ঃ ৮)

তাছাড়া, উপস্থিত দুঃখ-বেদনা ও ব্যথা-ক্লেশের জন্য দুশ্চিন্তা, ভয় এবং হা-হুতাশে কোন ফায়দাও নেই। কারণ, এর ফলে বরং পরেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। কারণ, ভাগ্যে যা আছে, তা তো অবশ্যই ঘটবে। তোমার দুঃখ বা রাগ-বিরক্তির জন্য তাতে কোন কারণেই কোন প্রকার পরিবর্তনও হবে না। যেমন বলা হয়েছে কোন এক ব্যক্তির কবিতায়ঃ

'হে নফ্স! যা কিছু নির্ধারিত করা হয়েছে, তার উপরই সবর করো এবং সন্তুষ্ট থাকো। তোমার জন্য নিরাপত্তা তো কেবল অনির্ধারিত বিষয়ের মধ্যেই। এ কথায় তোমার পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, ভাগ্যে যা আছে, তা ঘটবেই। কারণ তা ঘটতে বাধ্য— তাতে তুমি সবর করো আর না করো।

সুতরাং, কোন জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তিই অনাবশ্যক মনের শান্তি নষ্ট করে আবার পরকালের জন্য শাস্তি ও আযাব কিনে নিতে পারেন না। বরং তিনি মনের শান্তি বজায় রেখে আখিরাতের জান্নাত লাভের জন্য ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকাকেই অগ্রাধিকার দান করেন।

দ্বিতীয়ত, ভাগ্যে সন্তুষ্ট না থাকার ফলে অসংখ্য বিপদাপদ, অকল্পনীয় ক্ষতি এবং মুনাফিক ও কুফরের দরজায় পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান, যদি আল্লাহ্ পাক তোমাকে রক্ষা না করেন।

আল্লাহ্ পাকের এই ফরমানটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করুনঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

তোমার পরওয়ারদিগারের শপথ! এই লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের মধ্যে যে ঝগড়া ঘটেছে, আপনার দ্বারা তা দূরীকরণ না করে এবং আপনার ফয়সালায় তাদের নিজেদের অন্তরে দ্বিধা না থাকে এবং পুরোপুরি তা মেনে নেবে। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

উপরিউক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফয়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ অথবা অন্তরে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করার জন্য ঈমানকে অস্বীকৃতি দান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ্ পাক ঈমান না থাকা এবং বিলুপ্তি সম্পর্কে শপথও করেছেন। তাহলে সেই ব্যক্তির কি অবস্থা হবে, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র ফয়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে? পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি—আল্লাহ্ পাক বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার নির্ধারিত ভাগ্য এবং তকদীরে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, সে আমার পরীক্ষায় সবর এবং আমার নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় না করে, সে যেন আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে তার মা'বুদ বানিয়ে নেয়।

অপর কথায় বলা হয়েছে যে, যখন মানুষ তার ভাগ্যে সন্তুষ্ট না হয়, তখন সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতেই থাকলো না। সুতরাং তার অন্য কোন মা'বুদ বানিয়ে নেয়া উচিত, যার সন্তুষ্টিতে সে সন্তুষ্ট থাকবে।

জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র এই সতর্কবাণী সত্যিই মহা কঠোর। কোন কোন সালেহীনকে 'রবুবিয়াত' এবং 'উবুদিয়াত'-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেছেনঃ রবের পক্ষে আহ্কাম জারী করা আর বান্দার পক্ষে তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা জরুরী। সুতরাং যখন রব কোন হুকুম জারী করেন, আর বান্দা তাতে সন্তুষ্ট না হয়, তখন রবুবিয়াত যেমন বিলুপ্ত হয়, তেমনি বিলুপ্ত হয়

উবুদিয়াত (দাসত্ব)। অর্থাৎ তখন আল্লাহ্কে রব স্বীকার করার কোন অর্থই থাকে না, তেমনি তার বান্দা হওয়ার অধিকারও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এই নীতিকে গভীরভাবে অনুধাবন করে নিজের মধ্যে তা কার্যকর করার চেষ্টা করলে আল্লাহ্‌র মরজি এই রোগের (ভাগ্যে অসন্তুষ্টি) প্রতিকার হবে।

সবর ও তার শ্রেণীবিভাগ

এটা অত্যন্ত কড়া এবং তেতো পানির মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-টি অত্যন্ত বরকতওয়ালা। এটিই সেই বস্তু, যা সব সময় কল্যাণ ডেকে আনে আর ক্ষতিকর বিষয়কে করে দেয় দূর। কিন্তু ঔষধ যদি এ ধরনেরও (তিক্ত ও কড়া) হয়, তথাপি জ্ঞানবান ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ তা পান করার জন্য নফ্‌সকে বাধ্য করে। তারা নফ্‌সকে বলেঃ ওহে নফ্‌স! এ সামান্য সময়ের কষ্ট দীর্ঘদিনের জন্য আরাম ও স্বস্তি বহন করে আনবে। এভাবেই মানুষ সবর করতে সমর্থ হয়। সুতরাং এ বিষয়টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত।

সবর চার প্রকারঃ সবর আলাত্‌তায়াত্‌, অর্থাৎ নেক কাজে ধৈর্য; সবর অনিল্‌ মা সিয়াত, অর্থাৎ পাপ থেকে ধৈর্য, সবর আনলি ফযুলিদ-দুনিয়া অর্থাৎ দুনিয়ার অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত জিনিস থেকে ধৈর্য এবং বিপদাপদ ও দুঃখ-ক্লেশে ধৈর্য।

ধৈর্যের বিস্বাদ যখন বরদাশ্‌ত করতে সক্ষম হবে এবং উপরিউক্ত চার প্রকারের ধৈর্য যখন আয়ত্ত করতে পারবে, তখন আল্লাহ্‌র পথে নেকী এবং তাঁর পথে স্থিতিশীলতা অর্জনের মর্যাদা লাভ করা সম্ভব হবে। ফলে, আখিরাতের জন্যও লাভ হবে অসংখ্য সওয়াব; সাংসারিক ও সামাজিক জীবনেও কোন পরীক্ষায় নিপতিত হবে না এবং আখিরাতের কোন মর্যাদার ব্যাপারেই তোমার স্থান পিছে থাকবে না। তদুপরি দুনিয়া অর্জন তোমাকে হাতছানি দেবে না, উপস্থিতভাবে তুমি লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে যাবে — এমনকি, শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার সকল আকর্ষণকে উপেক্ষা করার ক্ষমতায়ও তুমি হবে ক্ষমতাবান। যদি পরে কখনো কেউ দুনিয়ায় লিপ্ত হয়েও পড়ে, তথাপি তার অর্জিত সবরের সওয়াব বিনষ্ট হবে না — তা পুঁজি হিসেবেই বিদ্যমান থাকবে।

মোটকথা, ধৈর্যের দ্বারা এখন যেমন নেকী ও উচ্চ মকাম হাসিল করা সম্ভব, তেমনি পরেও এর জন্য যে সওয়াব সংরক্ষিত হবে, তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

এ পরিমাণ কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। তাছাড়া এ সবরের মাধ্যমেই তাকওয়া এবং যুহদ (সংসার বর্জন)-এর ন্যায় উচ্চ মকামও হাসিল করা সম্ভব, যার পুরস্কার অসংখ্য, অগণ্য। আর তাছাড়া, সবরের মাধ্যমে প্রথমত দুনিয়ায় হা-হুতাশ ও দুশ্চিন্তা থেকে যেমন স্বস্তি ও আরাম লাভ করা যায়, তেমনি পরকালেও সবর না করার শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

অপরপক্ষে, যদি ধৈর্যের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন করো এবং হা-হুতাশের পথ অবলম্বন করো, তাহলে উপরিউক্ত সকল লাভই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে নেমে আসবে ক্ষতি আর ক্ষতি। কারণ, যে ব্যক্তি নেক কাজের ক্লেশ ও কষ্ট সহ্য করতে পারে না, তার পক্ষে নেক কাজ করা কিছুতেই সম্ভব নয় আর নেকীকে সংরক্ষণ করার শক্তিও তার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না। এভাবে সকল সওয়াব বরবাদ হয়ে যায়। তেমনি সে আল্লাহ্র ইবাদতে ধৈর্য অবলম্বন করতেও সক্ষম হয় না। ফলে, অনেক উচ্চ মকাম লাভ থেকেও সে হয় বঞ্চিত। অথবা সে ব্যক্তি কোন গুনাহ্ থেকেই বিরত থাকতে পারে না, ফলে যে গুনাহ্র বিষয় তাঁর সামনে আসে, সে তাতেই লিপ্ত হয়ে যায়। কিংবা সে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বিষয় থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। ফলে, তাতেই লিপ্ত থেকে জীবন কাটিয়ে দেয়। এ ধরনের ব্যক্তি বিপদাপদ ও দুঃখ-ক্লেশেও ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। ফলে, ধৈর্যের মহান সওয়াব থেকেও হয় সে বঞ্চিত।

অনেক সময় অধৈর্য ব্যক্তিগণ এমন হা-হুতাশ শুরু করে দেয় যে, তার ফলে বিপদাপদ এবং দুঃখ-ক্লেশের পুরস্কারই হাতছাড়া হয়ে যায়। এ অবস্থায় দু'টি ক্ষতি সাধিত হয়। প্রথমত, যে কাজ ও বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করার প্রয়োজন ছিল, অধৈর্যের ফলে তা হাতছাড়া হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, বদলা বা পুরস্কার হিসেবে যা সে পেতো, তাও পাওয়ার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত হওয়ার যেমন আশঙ্কা থাকে তেমনি ধৈর্য থেকেও হয় বঞ্চিত। অথচ বিপদের সময় ধৈর্য থেকে বঞ্চিত হলে, তা মূল বিপদের চাইতেও বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দেয়। তাহলে এমন হা-হুতাশের কি প্রয়োজন, যার ফলে উপস্থিত ফলের বিলুপ্তি সাধিত হয়, আর যা হাতছাড়া হয়ে যায়, তা আর কখনো ফিরে আসে না?

সুতরাং, অন্তত এতটুকু প্রচেষ্টা অবশ্যই করা দরকার যে, একটি যদি হাতছাড়া হয়, তবে অপরটি যেন পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-র একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি একবার কোন এক রোগীকে দেখতে গেলেন। রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ 'যদি তুমি ধৈর্য ধারণ করো তবুও ভাগ্যে যা আছে, তা ঘটবেই— তবে তুমি ধৈর্যের সওয়াব লাভ করবে। আর যদি হা-হুতাশ শুরু করো, তবুও ভাগ্যে যা আছে, তা ঘটবেই— তবে হা-হুতাশের জন্য তোমার শাস্তি হবে।'

মোটকথা, অন্তরকে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। আর নফ্‌সকেও ধৈর্যের ন্যায় শক্তিশালী অভ্যাসের মাধ্যমে কেবল আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার উপরই ভরসা করে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। সাথে সাথে সমস্ত কাজের ব্যাপারে পরিত্যাগ করতে হবে তদবীর এবং ভেদ না জানা অবস্থায় নিজের সকল বিষয়কে ন্যস্ত করতে হবে আল্লাহ্‌র উপর।

অতঃপর অন্তরে যদি হা-হুতাশ এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হতে দেখো, তবে তাকে সংযত করবে এবং তাতে 'ভাগ্যে সন্তুষ্টি'র লাগাম পরিয়ে ধৈর্যের সুধা পান করাবে। এটি অপরিহার্য কর্তব্য।

ব্যাপারটি সত্যিই কঠিন, বাধা-বিঘ্নও এতে অনেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রতিকারও সহজ এবং পন্থায় অতি সরল। অথচ এ ধৈর্যের মাধ্যমেই লাভ হয় আখিরাতে প্রশংসিত ও সৌভাগ্যশালী মকাম।

ধরুন, কোন স্নেহশীল পিতা তার পুত্রের চোখের অসুখের জন্য তাকে কোন ফল খেতে দেয় না। তার অর্থ তো এই নয় যে, ছেলেকে না খাইয়ে পিতা কৃপণতা করছেন। তা কিছুতেই নয়, বরং তিনি ছেলের কল্যাণের জন্যই এমন করে থাকেন। তেমনি কোন সম্পদশালী পিতা যদি তার স্নেহের দুলালকে অতি কঠোর প্রকৃতির এবং সতর্ক কোন শিক্ষকের নিকট পড়াশোনা করতে দেন, সে শিক্ষক যদি তাকে সারাদিন সতর্কতার সাথে শিক্ষাদান করে, তবে এর অর্থ কি এই হবে যে, এ পিতা তাঁর ছেলেকে কষ্ট দিতে চান? কখনোই নয়। বরং ছেলের সামান্য কষ্টেও তো পিতা বিচলিত হয়ে পড়েন। ছেলেই তো তাঁর নয়নমণি। কিন্তু সামান্য কয়েক দিনের ক্লেশ তার দীর্ঘ ভবিষ্যতের কল্যাণের কারণ হবে।

এজন্যই পিতা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কারণ, প্রথমোক্ত পিতা জানেন, ছেলেকে তার ইচ্ছামতো ফল খেতে দিলে অসুখ বৃদ্ধি পাবে। তেমনি শেষোক্ত পিতা জানেন, ছেলেকে ইচ্ছামতো চলতে দিলে তার ভবিষ্যতই বরবাদ হবে।

তেমনি অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীকে পানি খাওয়া থেকে বিরত রাখেন। অথচ রোগী তৃষ্ণায় কাতরাতে থাকে। তদুপরি, রোগীকে পানির পরিবর্তে পান করতে দেয় বিস্বাদ ও তেতো ঔষধ, যে ঔষধ দেখে রোগী ভয় পায়, পান করতে চায় না।

তাহলে কি চিকিৎসক রোগীর শত্রু যে, রোগীকে কষ্ট দেয়াই তার উদ্দেশ্য? এমন কিছুতেই হতে পারে না। বরং চিকিৎসকের ব্যবস্থায়ই রোগীর জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত আছে— নিহিত আছে তার আরোগ্য লাভের নিশ্চয়তা এবং স্বস্তি। কারণ, চিকিৎসক নিশ্চিত জানেন যে, রোগীর পছন্দ অনুযায়ী জিনিস খেতে দিলে বা ব্যবহার করতে দিলে তাতে তার ধ্বংস ও বরবাদী অনিবার্য। আর এভাবে তাকে বিরত রাখার মধ্যেই রোগীর কল্যাণ ও সুস্থতা নির্ভর করছে।

এ থেকে মানুষের একটি বিষয় সম্যক উপলব্ধি করা উচিত যে, আল্লাহ্ পাক যখন তোমাকে রিযিক বা অর্থ সংকটে নিপতিত করেন তখনও একথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহ্ পাক তোমার আকাঙক্ষা অনুযায়ী সবকিছু দেয়ার ক্ষমতাধিকারী, তিনি তোমার ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন জিনিস তোমার নিকট সরবরাহও করতে সক্ষম, তিনি তোমার সবকিছুই জানেন, তোমার সকল অবস্থা সম্পর্কেই তিনি পূর্ণ ওয়াকিবহাল; অসামর্থ্য, অক্ষমতা— এসব থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি ধনীরও ধনী, তিনিই সকল বিত্ত ও ঐশ্বর্যের উৎস ও মূলাধার এবং তিনিই রাজার রাজা। তা সত্ত্বেও যখন তিনি কোন কিছুতে সংকটে ফেলেছেন, তখন অবশ্যই এর মধ্যে তোমার জন্যে কল্যাণ এবং ভালো উদ্দেশ্যই রয়েছে। তাছাড়া, এতে আর কোন উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না। এর বিপরীত (অর্থাৎ অকল্যাণ ও অমঙ্গল) কখনো হতে পারে না। কারণ, সেই মহাপ্রভু স্বয়ং ঘোষণা করেছেনঃ

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا -

যমীনে যা কিছু বিদ্যমান, তার সবকিছুই তোমার উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন তিনি। (সূরা বাকারাঃ ২৯)

সেই পরম প্রভুই তোমার সামনে খুলে ধরেছেন মারিফাতের অথৈ সমুদ্র। তাঁর নিকটে এবং তাঁরই মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে সমগ্র দুনিয়া বিশ্বসংসার। হাদীসে কুদসীতে আছে—আল্লাহ্ পাক বলেনঃ 'আমি আমার আওলিয়াদের এমনভাবে দুনিয়ার নিয়ামত দান করি, যেমন একজন দয়ালু ও দয়ার্দ্রচিত্ত রাখাল তার উটগুলিকে উত্তম এবং সবুজ ঘাস পল্লবিত চারণক্ষেত্রে নিয়ে ছেড়ে দেয়।'

এখানে আরও একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, সে পরম প্রভু তোমার পরীক্ষারও উর্ধ্বে, তোমার সকল অবস্থা তাঁর চোখের সামনে সব সময় সমুজ্জ্বল, তোমার দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। তাছাড়া, সেই পরম প্রভুই তোমার প্রতি সবচাইতে স্নেহার্দ্র এবং সবচাইতে মেহেরবান। তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সে ফরমান কি শোন নাই, যখন তিনি বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَرْحَمُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْوَالِدَةِ الشَّفِيْقَةِ بِوَلَدِهَا

আল্লাহ্ পাক তাঁর মু'মিন বান্দার প্রতি স্নেহশীল মাতার চাইতেও অধিক দয়া প্রদর্শনকারী।

যখন তুমি উপরিউক্ত বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হবে তখন তুমি এ-ও জানতে পারবে, তোমার নিকট যা অসহ্য বিবেচিত তা তোমার কল্যাণ ও শুভ-ইংগিতবাহী ব্যতীত আর কিছু নয়। তবে তুমি হয়তো এর ভেদ জান না কিন্তু সেই পরম প্রভু সবকিছুই জানেন-- তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী। এ জন্যই আওলিয়া ও বিশিষ্ট বুযুর্গ ব্যক্তিদের অধিক পরীক্ষা ও বিপদ-মুসীবতের সম্মুখীন হতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছেনঃ

اِذَا اَحَبَّ اللّٰهَ قَوْمًا اِبْتَلاَ هُمْ -

যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাদের নিপতিত করেন পরীক্ষায় (বিপদাপদ দিয়ে)।

তিনি আরও বলেছেনঃ

اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ بَلاَءً الاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ ثُمَّ الاَمْثَلُ فَالاَمْثَلُ-

মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশী বিপদের সম্মুখীন হন নবীগণ, তারপর

শহীদগণ; অতপরঃ এভাবে মর্যাদার দিক দিয়ে যারা যত কম, বিপদ-মুসীবতও তাদের তত কম।

মোটকথা যখন আল্লাহ্ পাক তোমার জন্য দুনিয়ার সাজ-সামান বন্ধ করে দেন এবং তোমার বিপদ-মুসীবত ও সংকট বৃদ্ধি করেন তখন মনে করবে যে, তুমি তাঁর নিকট প্রিয় এবং সম্মানিত হয়ে গেছ। বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সাথে আউলিয়াদের ব্যবহার শুরু করেছেন (অর্থাৎ তিনি আউলিয়াদের সাথে যেরূপ ব্যবহার করেন তোমার সাথে সেই ব্যবহার করার মাধ্যমে তোমাকে তাঁদের মর্যাদায়ই উন্নীত করছেন।) কারণ তিনিই তোমার অবস্থা ভাল জানেন। তোমার যে কষ্ট হয় তাও তিনি জানেন। সুতরাং যদি তোমার মর্যাদাই উন্নীত না করবেন তবে তোমাকে কষ্ট দেয়ার তাঁর কি প্রয়োজন আছে? তাছাড়া তিনি তো ঘোষণাও করে দিয়েছেনঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا -

তোমার পরওয়ারদিগারের সেই সিদ্ধান্তের উপরই ধৈর্য ধারণ করো, তিনি আমাদের হিফাযত করবেন। (সূরা তুরঃ ৪৮)

বরং তিনি যে তোমাদের হিফাযত করবেন এটা তো তাঁর অসীম অনুগ্রহ বৈ আর কিছু নয়। অথচ সেই হিফাযতে বিশ্বাসের জন্যই আবার সওয়াব দান করেন এবং এজন্য উচ্চ (মনোনীত) ব্যক্তিদের মর্যাদায় উন্নীত করেন—এর চাইতে আর বড় নিয়ামত কি হতে পারে! শুধু কি তাই? এর পরও লাভ হয় উত্তম ফল বিভিন্ন রকমের নিয়ামতের মুশাহিদা।

পর্যালোচনা

একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য তোমার শরীরকে সুস্থ এবং উহার শক্তি অব্যাহত রাখার জন্য যতটুকু রিযিকের প্রয়োজন তোমার সেই রিযিকের জামিন আল্লাহ্ স্বয়ং। আর তিনি যে এ দায়িত্ব পালনেও সক্ষম তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তিনি তোমার অবস্থা সম্পর্কে সর্বক্ষণ প্রতিটি মুহূর্তেই খবর রাখছেন। তাঁরই সঠিক যিম্মাদারী এবং অকৃত্রিম ওয়াদার উপর তুমি ভরসা করেছো। এভাবেই তোমার অন্তর সন্তুষ্ট, রিযিকের মাধ্যম, কারণ ও উপায়-উপকরণ সম্পর্কে ভাবনা রহিত হয়ে এক তাঁরই দিকে মন

করেছো একীভূত। কারণ. উপায়- উপকরণ থাকলেও আল্লাহ্ ব্যতীত তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, তিনিই এ সমস্ত উপায়-উপকরণ ও কারণ-মাধ্যমের দ্বারা আহার-পানের ব্যাপারটিকে সহজসাধ্য করার অধিকারী। তিনিই খাদ্য গ্রহণের পর তাতে সুস্থতা ও শক্তি দান করেন এবং সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। সুতরাং তিনি যদি চান বিনা কারণ ও বিনা উপায়-উপকরণেই তিনি তোমার জন্য যথেষ্ট। মোটকথা, সকল বিষয় তাঁরই কুদরতের অধীন। তিনিই ওয়াহাদাহু লা শারীকালাহু। সুতরাং তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো উপর ভরসা করবে না। তেমনি নিজের সকল বিষয় ও ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও তদবীর পরিত্যাগ করে তাঁরই উপর সবকিছু অর্পণ করবে, যিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এ পথেই তোমার ভবিষ্যৎ সবকিছু সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়তা দান করে থাকেন।

আর তুমি যদি কাল কি হবে, কেমন করে এ কাজটা হবে — এসব ভাবনায় লিপ্ত হয়ে যাও, তাতে তোমার সময়ের অপচয় এবং অন্তরকে অনাবশ্যক বিষয়ে লিপ্ত রাখা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। অনেক সময় এমন হয় যে, তোমার ধারণার বিপরীত কাজ হয়ে যায় — অথচ তুমি তখন হয়তো মশগুল থাকবে তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তায়।

সুতরাং এভাবে অনাবশ্যক বিষয়ে জীবনের অমূল্য সময়কে বৃথা ব্যয় করা আহম্মকী ব্যতীত আর কিছুই নয়। বরং এটা এমন ক্ষতিকর যে. পরে এজন্য অনুশোচনা করতে হবে। কারণ, এ ক্ষতির কোন তুলনা নেই। এতে. কেবল জীবনের অমূল্য সময়েরই শুধু অপচয় — মহাক্ষতি।

কোন এক সাধক বলেছেনঃ আল্লাহ্র ফয়সালা ও নির্দেশ জারী হয়ে গেছে। সুতরাং কি হবে কি করব — এসব থেকে নিজেকে রক্ষা করো। যা কিছু র্নিধারিত আছে তা নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই ঘটবে। কেবল অজ্ঞ লোকেরাই চিন্তান্বিত এবং বেদনাতুর।

অন্য একজন বলেছেনঃ 'মানুষ এমন বহু আশঙ্কা ও ভয় করে যা কখনো দেখা দেয় না — তেমনি এমন আশাও করা হয়, যা কখনো কার্যকরী হতে দেখা যায় না।

যা হোক, নিজের নফ্‌সকে এই বলে বোঝাবে যে, যা-কিছু নির্ধারিত হয়েছে, তার বাইরে কিছু হবে না। সেই পরম প্রভুই আমার মালিক এবং তিনি আমার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট। তিনি এমন ক্ষমতাবান যে, তাঁর ক্ষমতার কোন শেষ নেই। তিনি এমন হিকমতওয়ালা যে, তাঁর হিকমতের কথা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তিনি দয়াবান, করুণাময় ও দয়ালু। তিনি এত করুণাময় যে, তাঁর কোন পরিমাপ করা যায় না। সুতরাং যিনি এতসব বৈশিষ্ট্যের ও গুণের অধিকারী, তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত, তাঁর উপর সকল বিষয় ন্যস্ত করা কর্তব্য।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্তরকে এ কথা মেনে নেয়ার জন্যও প্রস্তুত করতে হবে যে, তিনি যে বিষয়ে বা যে কাজে যে ফয়সালা করেন, তা-ই সবচাইতে উত্তম ও সঠিক, যদিও তাঁর ভেদ জানার ক্ষমতা আমার নেই।

নফ্‌সকে বলবে, ওহে নফ্‌স! যে জিনিস তোমার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তা অবশ্যই তুমি পাবে। হা-হুতাশ ও উদ্বিগ্ন হওয়ায় কোন ফায়দা নেই। কল্যাণ একমাত্র সেই বিষয়েই নিহিত আছে, যেটা আল্লাহ পাক তোমার জন্য ভালো মনে করেন। সুতরাং তাঁর নির্ধারিত বিষয়ে বিরক্তির কোন কারণ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? বরং ভাগ্য নির্ধারণই তো তাঁর মহিমার পরিচয়। সুতরাং ভাগ্যে সন্তুষ্টি ওয়াজিব এবং জরুরী।

এমনিভাবে যখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় কিংবা বরদাশত করা যায় না, এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হয়ে পড়, তখন নিজের নফ্‌সের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। নফ্‌সকে সংযত করবে। দেখবে সে যেন কিছুতেই হা-হুতাশ বা অভিযোগ-অনুযোগ না করতে পারে। বিশেষ করে প্রথম প্রথম এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এ সময়টাই প্রকৃত সাধনার সময়। অপরপক্ষে নফ্‌সও ভয়ের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়। নফ্‌সকে এই বলে বোঝাবেঃ যা কিছু হবার ছিল, হয়ে গেছে। এখন এর পরিবর্তনের কোন অবকাশ নেই। বরং এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো বিরাট ও কঠিন বিপদের পরীক্ষা থেকে রক্ষা করেছেন। কারণ, আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে বিপদাপদ ও সংকট বহু বিদ্যমান। এর সবগুলিই প্রকাশ পাবে—একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। আমার উপর তার যে

ছিটোফোঁটা এসেছে তা অতি সামান্যই। সুতরাং হে নফ্‌স, সহ্য করো। ইনশাআল্লাহ্ বহু আনন্দ ও বহু সওয়াব লাভ হবে।

আরও বলবে, হে নফ্‌স! তুমি যদি সহ্য নাও করো, তবুও যা আসবার তা আসবেই। সুতরাং ভয় করে কোন ফায়দা নেই।

মোটকথা, প্রকৃতই যদি সহ্যগুণ সৃষ্টি হয় এবং ধৈর্য অবলম্বন করা যায়, তাহলে দুঃখ-বেদনা ও বিপদাপদ বলে কোন [illegible]ই নেই, থাকবে না।

যা হোক, এরপর মুখে 'ইন্নালিল্লাহি', অন্তরে সওয়াবের আশা, নবী[illegible]ণ ও আউলিয়াগণ যেভাবে বিপদ-মুসীবতে পড়েছেন, তাঁরা যেভাবে কষ্ট সহ্য করেছেন, সে-সব কথা স্মরণ করে নিজের বিপদ অতিক্রম করে যাবে।

আর যদি কখনো দুনিয়ার অন্য বিষয়ে সংকট দেখা দেয় তাহলে নফ্‌সকে এভাবে বোঝাবেঃ সেই পরম প্রভু সকল অবস্থার খবরই রাখেন, তিনি অতি দয়াবান ও দয়ালু। কুকুরের ন্যায় নিকৃষ্ট জীব এবং কাফির ও মুনাফিকের ন্যায় জঘন্য পাপীদেরও তিনি খেতে দেন। আমি তো তাঁর মুসলমান বান্দা। সুতরাং আমাকে খাবার দেয়া তাঁর পক্ষে অসুবিধারও কিছু নয়, অসম্ভব কাজও নয়। বিশেষভাবে নফ্‌সকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, কোন উপকার এবং ফায়দার পটভূমি হিসেবেই তিনি এ সংকটে নিপতিত করেছেন। অচিরেই এ সংকট দূর হয়ে যাবে। কঠোরতার পরই নেমে আসে সহৃদয়তা। কিছুটা ধৈর্য অবলম্বন করো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অভাবনীয় করুণায় হয়তো তোমাকে সিক্ত করবেন।

কোন কবি বলেছেনঃ 'আপন পরওয়ারদিগারের কুদরতের উপর আশা এবং তাঁর শক্তির উপর আস্থা রাখো। তুমি যে স্বাচ্ছন্দ্য তালাশ করছো, অচিরেই তা এসে যাবে। আর যখন কোন দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দেয়, তখন হতাশ হয়ো না। কারণ তোমার অজানা যে বিষয় তাতে কত অভাবনীয় বিষয়ই না প্রকাশিত হচ্ছে।'

অপর এক কবি বলেছেনঃ 'ওহে বেদনায় নিমজ্জিত বন্ধু! সংকট যখন তীব্র আকার ধারণ করে, তখন সূরায়ে 'আলাম নাশরাহ'-কে গভীরভাবে অনুধাবন করতে থাকবে। মনে রাখবে, দু'টি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যখানে থাকে একটি সংকট। বারবার সূরাটি পাঠ করো, অনুধাবন করো, সংকট দূর হয়ে যাবে।

মোটকথা, উপরিউক্ত বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে চেষ্টা করো এবং বারবার তা মনে মনে চিন্তা করো। এভাবে কিছুদিন বিষয়গুলি চিন্তা করলেই সমস্ত বিষয় তোমার নিকট সহজ হয়ে যাবে। এমনিভাবে তুমি উপরিউক্ত চারটি বাধাই (রিযিকের চিন্তা, সম্ভাব্য বাধার চিন্তা, ভাগ্যের চিন্তা এবং বিপদ-মুসীবত) অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। এগুলোর সমাধান তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসে যাবে। অপরপক্ষে এ বাধাগুলো থেকে উদ্ভূত দুঃখ-বেদনা ও বিপদাপদ থেকেও তুমি হবে নিরাপদ। এখন তুমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী, আল্লাহ্‌র উপর তোমার সকল বিষয় অর্পণকারী, তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যে সন্তুষ্ট এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারী বলে পরিগণিত হবে। দুনিয়ায় তোমার লাভ হবে শারীরিক ও মানসিক শান্তি ও স্বস্তি আর আখিরাতে তোমার জন্য প্রস্তুত থাকবে অভাবনীয় মর্যাদা ও সৌভাগ্যের মকাম। সেখানে তুমি লাভ করবে আল্লাহর ভালোবাসা ও সম্মান। এভাবে তোমার মধ্যে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের হবে সমন্বয়। ফলে আল্লাহ্‌র ইবাদতের পথ তোমার জন্য এমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তাতে সামান্যতমও বাধা, সামান্যতমও অসুবিধা আর অবশিষ্ট থাকবে না।

এভাবেই তুমি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে এ মহাসংকটময় ঘাঁটিটি।

আল্লাহ্‌র নিকট কামনা, তিনি যেন আমাদের সকলকে অনুরূপ তওফীক দান করেন। তিনিই আরহামুর রাহিমীন।

অষ্টম সোপান

ইবাদতে প্রেরণাদানকারী বিষয়

হিদায়তের পথ যখন ঠিক এবং সহজ হয়ে যাবে এবং দুশ্চিন্তা ও বাধা-বিঘ্ন যখন হবে দূর, তারপরই ইবাদতে ইলাহীর জন্য প্রস্তুত এবং তাতে আরও অগ্রসর হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এজন্য প্রথমেই 'ভীতি' ও 'আশা' (খওফ ও রিযা) সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ, এগুলো পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম ও তা সুষ্ঠু প্রয়োগের পরই সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

খওফ ও রিযার গুরুত্ব

ভীতিকে দু'টি কারণে অবলম্বন করা দরকার। প্রথমত গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার জন্য। নফ্স মন্দ কাজে খুবই উৎসাহী; বার বার সব সময় সে খারাপ কাজে প্ররোচিত করে। এ নফ্সই সর্বদা ফিতনা-ফাসাদ এবং ঝামেলায় লিপ্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। মন্দ কারসাজির দিক দিয়ে নফ্সের তুলনা মেলা ভার। ভীতি ও ধমকী ব্যতীত একে বাগে অনা সম্ভব হয় না। তাছাড়া, নফ্সের মধ্যে গুণগত এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, যা তাকে মন্দ থেকে বিরত রাখবে, তার মধ্যে লজ্জাও নেই; যে লজ্জা তাকে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্যপনা থেকে বিরত রাখতে পারে। নফ্সের তুলনা তো কেউ কেউ দাস এবং নীচাশয় মানুষের সাথে করেছেন, যে কেবল ধমক ও ভয়ের জন্যই কোন কু-কাজ থেকে বিরত হয়। নতুবা, স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত লোককে তো একটু গঞ্জনা দিলেই কু-কাজ থেকে বিরত হয়ে যায়।

মোটকথা, নফ্সের সংশোধনের একটি মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হলো, কথায়, কাজে ও চিন্তায়, সব দিক দিয়ে সব সময় কেবল তাকে ভয় দেখানো।

কোন কোন সালেহীন সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাদের নফ্স কোন গুনাহ্তে লিপ্ত হওয়ার আকাঙক্ষা করতো, তখন তাঁরা সোজা জংগলের দিকে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে শরীরের বস্ত্র খুলে ফেলতেন এবং উত্তপ্ত বালুকা অথবা কংকরের মধ্যে শুয়ে যেতেন। আর, নফ্সকে বলতেনঃ 'একটু মজা দেখে

নাও? দোযখের উত্তাপ ও ভয়াবহতা এর চাইতে অনেক গুণ বেশী। রাতে তুই মুর্দা আর দিনে বিদ্রোহী ও কু-কর্মে আগুয়ান!'

দ্বিতীয় কারণ, নেকীর জন্য অহংকার এবং আত্মগরিমা প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ এতে নেকীর সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বরং সব সময় নিজের মন্দ দিক, ভুল-ত্রুটি ও ক্ষতির দিক স্মরণ রাখা কর্তব্য। তাছাড়া, সব সময় সে-সব ভুল ও অপরাধের কথা স্মরণ করতে হয়, যেগুলোর জন্য বিভিন্ন রকমের বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

لَوْ اَنِّىْ وَعِيْسٰى اُوْخِذْنَا بِمَا اكْتَسَبَتْ هَاتَانِ لَعَذَّبَنَا عَذَابًا لَمْ يُعَذِّبْهُ

اَحَدٌ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ وَاَشَارَ بِاَصْبِعَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমার ও ঈসা (আ)-এর যদি আমলের ব্যাপারে ধরপাকড় হয়, তাহলে আমাদের এমন আযাব দেয়া হবে যে, সৃষ্টির আর কাউকেই তেমন আযাব দেয়া হয় নাই। অতঃপর তিনি [রাসূলুল্লাহ (স)] হাত দিয়ে ইশারা করে নিজেকে দেখালেন।

হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি গুনাহ্ করে, তা থেকে তওবা করার আগেই তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়—আর সে আমল করতেই থাকে।

ইবনে মুবারক (র) নিজের নফ্সকে উদ্দেশ্য করে বলতেনঃ বর্ণনা করিস সাধকের কথা, আর কাজ করিস মুনাফিকের। তারপরও জান্নাত লাভের আকাঙ্ক্ষা! ধ্বংস, ধ্বংস, ধ্বংস তোর অনিবার্য। জান্নাতের উপযুক্ত বহু লোক রয়েছে, যাদের আমল তোর আমলের চাইতে অনেক উঁচু মর্যাদার।

মোটকথা, এ ধরনের কথা ও আলোচনা সব সময়ই করা জরুরী, যাতে নফ্স কোন সময়ই নেকীর জন্য বড়াই বা গরিমা না করে।

আশার সঞ্চারও দুইটি কারণে দরকার। প্রথমত ইবাদতে ইলাহীর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। কারণ নেক কাজ সত্যিই কঠিন। শয়তান সর্বদাই তাতে বাধা দেয়। প্রবৃত্তি-কামনা নেক কাজের বিপরীত দিকে টানে। তাছাড়া নফ্স সম্পর্কে অসতর্ক ব্যক্তিদের অবস্থা তো প্রকাশ্যভাবেই বিদ্যমান। যে সব নেক

কাজের জন্য সওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে তা কখনো পড়ে না। সুতরাং সে সওয়াব লাভও তাদের পক্ষে অল্পই সম্ভব হয়। নফ্সের অবস্থা যখন এরূপই, তখন কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রেরণা সে আর কি করে দেবে? সে কখনো দায়িত্ব পালনেও আগ্রহী নয়, না সেজন্য কখনও প্রস্তুত হতে চায়। বরং একটি কাজ তার দ্বারা হয়। তা হলো প্রতি নেক কাজে বিরোধিতা করা এবং মন্দ কাজে উৎসাহ প্রদান। কেবলমাত্র একটি জিনিস রয়েছে, যা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। তা হলো আল্লাহ্র রহমতের দৃঢ় আশা। সওয়াবের ধারণা ও নেক কাজে উৎসাহ সৃষ্টিতে এটি খুবই সক্রিয়।

আমাদের শায়খ (র) বলেনঃ 'দুশ্চিন্তা আহারে বিরত করে, ভয় গুনাহ্ থেকে বিরত রাখে আর রহমতের আশা আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য প্রেরণা যোগায়। আর মৃত্যুর স্মরণ করে মানুষকে সংসার বিরাগী।'

দ্বিতীয় কারণ—আশা সঞ্চারের দ্বিতীয় কারণ হলোঃ এর দ্বারা বিপদাপদ ও দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে বুঝতে পারে যে, তার কি অর্জন করতে হবে, সে ব্যক্তির পক্ষে সে বিষয় অর্জনে তার সকল চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা সহজ হয়। যে ব্যক্তি কোন জিনিস অনুসন্ধান করে এবং সে বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে পুরা আগ্রহ ও আকাঙক্ষা থাকে সে পথে যত বিপদাপদ এবং দুঃখ-ক্লেশই আসুক না কেন, তা সে বরদাশত করতে সক্ষম হবে। এজন্য সে সামান্যই পরোয়া করে থাকে। যে ব্যক্তি কাউকে মনে প্রাণে ভালবাসে, সে তার জন্য যে-কোন বিপদ, যে-কোন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে। শুধু কি তাই, বরং এ বিপদ, দুঃখ-কষ্ট এবং ক্লেশ সহ্য করতে তার এক ধরনের মজা ও স্বাদ অনুভূত হয়।

মধু সংগ্রহকারীদের কথা একবার ভেবে দেখো! মৌমাছির কামড়ের প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপই করে না। কারণ, তারা থাকে মধুর আস্বাদে বিভোর। চেয়ে দেখো সেই শ্রমিকের প্রতি, যে শ্রমিক প্রখর রৌদ্রের মধ্যেও সিঁড়ি ভেংগে ভেংগে মস্তবড় বোঝা উপরে টেনে নিচ্ছে। কিন্তু কেন? সন্ধ্যায় দু'টি টাকা পারিশ্রমিক পাবে, এ আশায়।

তেমনি চাষী রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে জমে এবং গরমে ঘর্মাক্ত হয়ে এত পরিশ্রম ও মেহনত কেন করে? বছর শেষে নতুন ফসলের আশায়।

ইবাদতের জন্য চেষ্টায় রত হে আমার ভাই সকল! জান্নাতের মধুরতা, তার

উত্তম ও উৎকৃষ্ট নিয়ামতসমূহ, হুর-গিলমান, উত্তম খানাপিনা, স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা, উঁচু ও শানদার বালাখানা—আল্লাহ্ পাক যেসব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছেন, তার কথা স্মরণ করলে ইবাদতের পথে যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসে, তা দূর হয়ে যায়। ইবাদত করতে গিয়ে দুনিয়ার যেসব নিয়ামত ভোগ করা সম্ভব হয় না, যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, সে মধুর জান্নাতের আশায় তা বরদাশ্ত করা সহজ হয়।

বর্ণিত আছে, সুফিয়ান সওরী (র)-কে তাঁর শাগরিদগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি এত ভীত এবং শোকার্তের ন্যায় জীর্ণ ও মলিন থাকেন কেন? তারা আরও বললোঃ ওস্তাদ! আপনি যদি কঠোর পরিশ্রম কিছুটা হ্রাস করেও দেন, তবুও ইনশাল্লাহ্ আপনি লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবেন। একথা শুনে সুফিয়ান সওরী (র) জবাব দিলেনঃ কেন করবো না? আমি যখন জানতে পেরেছি যে, জান্নাতে যখন জান্নাতবাসিগণ নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করবেন, তখন হঠাৎ একটি নূর চমকে যাবে। সে নূরে আটটি জান্নাতই অলোকিত হয়ে যাবে। সকলেই ধারণা করবে যে, এ নূর বুঝি স্বয়ং আল্লাহ্র। তাই সকলেই সেই নূরের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হবে। তখন হঠাৎ একটি গায়েবী আওয়াযে বলা হবে যে, সবাই মাথা তোল। তোমরা যা ধারণা করছো, এ নূর তা নয়। এক দাসী তার মনিবের সামনে মুচকি হাসি দিয়েছে, এ নূর তারই ঝলক। অতঃপর সুফিয়ান সওরী (র) একটি কবিতা পড়তে লাগলেনঃ

যে ব্যক্তির গন্তব্যস্থল ফিরদৌস, তার পক্ষে অতি বৃহৎ বিপদ ও অতি নিদারুণ কষ্ট সহ্য করাও ক্ষতির কিছু নয়। সে ফিরদৌস যাত্রীকে তোমরা দেখতে পাবে বেদনাতুর, ভীত এবং জীর্ণ মলিন অবস্থায় মসজিদে গমন করছে।

হে নফ্স! বিপদে ধৈর্য ধারণে কি বাধা আছে? যখন সময় আসবে, তখন বহু দূরে থাকতেই তোমার জন্য সম্বর্ধনার নহবত বেজে উঠবে।

ইবাদতের কাজ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, একটি নেক কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, অর অপরটি গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং এ কাজ কিছুতেই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারে না, যতক্ষণ নফস্কে 'খওফ ও রিযা" অর্থাৎ ভীতি ও আশা-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব না হয়। অবাধ্য জানোয়ারকে যেমন একজন সামনে থেকে টেনে, অপরজন পিছে থেকে ডাণ্ডা মেরে এগিয়ে নিতে হয় এবং যখন সে জানোয়ার কোথাও হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে যায়, তখন একদিকে যেমন

ডাণ্ডা মারতে হয়, অপরদিকে তেমনি সামনে সবুজ ঘাষ ধরতে হয়, তবেই সে অবাধ্য জানোয়ারকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়। ঠিক তেমনি এ অবাধ্য নফ্‌সকে ভীতির ডাণ্ডা মেরে আবার তার সামনে আশার হাতছানি তুলে ধরে ইবাদতের মনজিলে এগিয়ে নেয়া সম্ভব—অন্যথা এ অবাধ্য সব সময় মন্দ কাজের প্রতি ধাবমান।

কোন অবাধ্য বালককে পুস্তক হাতে নেয়াতে যেমন একদিকে মায়ের মিষ্টি দানের লোভ, অপরদিকে তেমনি শিক্ষকের ভয় দেখানোর প্রয়োজন, ঠিক তেমনি নফ্‌সকে ইবাদতে মশগুল করার জন্য একদিকে জান্নাতের সুখ-সম্ভোগের লোভ, অপরদিকে আবার দোযখের ভীতি সৃষ্টির প্রয়োজন। একদিকে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা, অপরদিকে আল্লাহর শাস্তির ভয়—এ দুটোই এই অবাধ্য, উদ্ধত জানোয়ার সদৃশ নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। মোটকথা, খওফ বা ভীতি হলো নফ্‌সের কোড়া, আর বিজয় বা আশা হলো নফ্‌সের সামনে আনন্দের লোভসদৃশ। এ দুটো জিনিস এজন্যই অপরিহার্য।

সুতরাং যে বান্দা ইবাদত ও সাধনার পথে আগুয়ান, তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে উপরিউক্ত দু'টি বিষয়—'খওফ ও রিযা'র দ্বারা নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রিত করার। নতুবা এ শয়তান নফ্‌স কিছুতেই অনুগত হয়ে ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হবে না।

এজন্যই পবিত্র কুরআনে এ দুটো বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই দেখা যায়, পবিত্র কুরআন ওয়াদা ও সতর্কবাণীতে ভরপুর। সওয়াবের বিবরণ যেখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এমনভাবেই বলা হয়েছে যে, লোভ সামলানো মুশকিল। তেমনি আযাব ও শাস্তির বিষয় যেখানে বর্ণিত হয়েছে, তা শুনতেও ভীতির সঞ্চার হয়। সত্যিই তা বরদাশত করা মতো নয়।

সুতরাং এ দু'টি বিষয়কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করতে হবে। তাহলে তোমার উদ্দেশ্য যে ইবাদত, তার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে এবং বিপদ ও দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করার ক্ষমতাও হবে আয়ত্তাধীন।

খওফ ও রিযার হাকীকত

আমাদের উলামায়ে কিরামের মতে, খওফ ও রিযার সম্পর্ক সম্ভাব্য বিপদের সাথে। এজন্য এ দুটো বিষয় বান্দার কার্য-কৌশলে এক মিশ্র প্রভাব বিস্তার করে।

খওফ বা ভীতি বলতে বোঝায় সে ভয়কে, যা বান্দা কর্তৃক কৃত কোন মন্দ থেকে ধারণার সৃষ্টি হয়। 'খাশিয়াত'-এর অর্থও প্রায় অনুরূপই। তবে খাশিয়াতে এক ধরনের আধিক্য ও ব্যাপকতা রয়েছে।

'খওফ'-এর বিপরীত শব্দ হলো 'জুরআত', মানে সাহস। অবশ্য কখনো কখনো 'আমান' বা নিরাপত্তাবোধও বিপরীত হিসেবে ব্যবহৃত।

যেমন বলা হয় - خائف وامن

অর্থাৎ—ভীত ও নিরাপদবোধকারী, কারণ أمن তাকেই বলা হয়, যখন বান্দা আল্লাহ্‌র ভীতি সম্পর্কে নিরাপদ এবং তার সন্তুষ্টির ব্যাপারে সাহস বোধ করে।

তবে প্রকৃতপক্ষে خوف এর বিপরীত শব্দ جرأت -ই।

'খওফ'-এর বিষয় চারটি। প্রথমত, যেসব পাপ হয়ে গেছে, তাকে অধিক স্মরণ করা—অত্যাচারের দ্বারা যেসব কাজ হয়ে গেছে, তাতে অধিক অনুশোচিত হওয়া। এমনভাবে এগুলোকে **স্মরণ** রাখা যেন তা থেকে মুক্তি পাওয়া তোমার পক্ষে সত্যিই মুশকিলের ব্যাপার হয়।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলার সে সব শাস্তি ও আযাবের বিষয় স্মরণ করা, যেগুলি সহ্য করার শক্তি বা সামর্থ্য মানুষের নেই।

তৃতীয়ত, নিজের নফ্স যে সেই সব শাস্তি সইতে অক্ষম, এই বিষয়টি স্মরণ করা।

চতুর্থত, যে-কোন সময় আল্লাহ পাক তোমাকে পাকড়াও করতে পারেন, তাঁর সে শক্তি ও সামর্থ্যের কথা স্মরণ করা।

রিযা—আল্লাহ্ তা'আলার দান ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা স্মরণ করে অন্তরকে আনন্দে উদ্বেলিত করা। আল্লাহ্‌র রহমতে শান্তি লাভের পিপাসা সৃষ্টি করা।

অন্যান্য বিপদাপদ ও বাধা-বিঘ্নের বিষয় মানুষের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু 'রিযা' মানুষের আয়ত্তে। কেবল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও অশেষ দানের বিষয় স্মরণ রাখলেই এটি অর্জিত হয়।

রিযার বিপরীত হলো ইয়াস অর্থাৎ নৈরাশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান থেকে বঞ্চিত থাকার বিষয় স্মরণ করা এবং অন্তরকে তা থেকে

বিছিন্ন করা। এটা সরাসরি গুনাহ। অপরপক্ষে, আশা করা ফরয। কারণ, বান্দার পক্ষে নৈরাশ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার এই একটি মাত্র পন্থা। অন্যথায়, আল্লাহর রহমত ও দানের উপর বিশ্বাসীর জন্য এটি নফল এবং অতিরিক্ত ব্যতীত আর কিছু নয়।

রিযা বা আশার বিষয়বস্তুও চারটি। প্রথমত, কোনও সুপারিশ ও শাফা'আতকারী ব্যতীতই আল্লাহ্ তা'আলা যে এত মহা সওয়াব ও দান-দক্ষিণা কেবল তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায়ই করছেন, তা স্মরণ করা। তোমার কর্মফল হিসেবে যে তা প্রাপ্ত হচ্ছে, তা স্মরণ না করাই উত্তম। কারণ কর্মফল হিসেবে সওয়াব পাওয়ার প্রশ্ন দেখা দিলে, তাতে তা ছোট করে দেখা হবে।

তৃতীয়ত, দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে বিনা বলা-কওয়া, বিনা চাওয়া এবং কারো কোন দাবি না থাকা সত্ত্বেও যে আল্লাহ্ পাক এত অসংখ্য দান করেছেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে সাহায্য করছেন, তা উপলব্দি করা।

চতুর্থত, আল্লাহ্র গোস্বা ও শাস্তির চাইতে তাঁর রহমত ও দান যে অধিক আগুয়ান, সে কথা স্মরণ করা। স্মরণ করা যে, তিনি বান্দার প্রতি আরহামুর রাহিমীন। তিনি বান্দার প্রতি নম্র ও সহনশীল।

এভাবে উভয় দিককার সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে বারবার স্মরণ করলে আল্লাহ্র মর্যী সকল অবস্থায়ই 'খওফ ও রিযা' তোমার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তওফীক দান করুন।

বিশেষ কথা

অত্যন্ত সতর্কতা এবং সকল বিষয়কে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে তোমাকে এ সংকটময় প্রান্তর অতিক্রম করতে হবে। কারণ এ ঘাঁটিটিও খুবই কঠিন এবং বিপদে পরিপূর্ণ। কারণ এর দুই পাশে অবস্থিত দু'টি ধ্বংসকারী পথ। আর এ দুই ধ্বংসকারী পথের মধ্য দিয়েই চলে গেছে 'খওফ ও রিযা'র পথ।

ধ্বংসকরী দু'টি পথের একটি হলো আমান অর্থাৎ নিরাপত্তার পথ, আর দ্বিতীয়টি হলো নিরাশার পথ। এ দুই ধ্বংসকারী রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে 'খওফ ও রিযা'র মসৃণ ও সঠিক পথ। যদি তোমার উপর 'রিযা' বা আশার এমন

আধিক্য দেখা দেয় যে, 'খওফ' বা ভীতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে তুমি নিরাপত্তা ও ভয়হীনতার রাস্তায় পতিত হবে। আল্লাহ্‌র বিচারের দিন ক্ষতিগ্রস্ত দল তারাই হবে, যারা এখন নিজেদেরকে নিরাপদ এবং ভয়হীন অবস্থায় রাখে। আর যদি 'খওফ' বা ভীতি এমন আধিক্য লাভ করে যে, আশাই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তুমি নিপতিত হবে নিরাশার অতল গহবরে। অথচ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কেবল কাফির জাতিই নিরাশ ও হতাশ হয়।

কিন্তু তুমি যদি একই সঙ্গে ভীতি ও আশা অবলম্বন করো এবং উভয়টিকেই সমভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে সেটাই হবে মধ্যম, সঠিক এবং সোজা পথ। আর এ রাস্তাই সেসব আউলিয়া ও সূফী সাধকদের রাস্তা, যাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا • وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ -

এরা নেক কাজের প্রতি দ্রুত ধাবমান হতো, আর আশা ও আশঙ্কাসহ আমার ইবাদত করতো। আর থাকতো আমাদের সামনে সন্ত্রস্ত অবস্থায়।

(সূরা আম্বিয়া ঃ ৯০)

উপরিউক্ত আলোচনায় তিনটি রাস্তাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাস্তা তিনটি হলোঃ নিরাপত্তা বোধের রাস্তা, নিরাশার রাস্তা এবং ভীতি ও আশার রাস্তা।

তৃতীয় রাস্তাটি প্রথম দু'টি রাস্তার মাঝখানে। সুতরাং তুমি যদি একটু ডান দিকে ঝুঁকে পড়ো অথবা বাম দিকে কিছুটা সরে পড়ো, তাহলে সেই ধ্বংসকারী রাস্তায় পতিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে তুমিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আরও মনে রাখবে, এ ধ্বংসকারী রাস্তা দু'টি অত্যন্ত আকর্ষণীয়, মনোহর এবং সঠিক রাস্তার চাইতে তুলনামূলকভাবে এ রাস্তা দু'টিতে পথ অতিক্রমও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ।

কারণ, যখন তুমি ডানদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তখন দেখতে পাবে— আল্লাহ্‌র দান, আল্লাহ্‌র দয়া-দাক্ষিণ্য ও রহমত এত অসংখ্য ও অসীম যে, সে পরিপ্রেক্ষিতে ভয়-ভীতি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে মানুষ সামান্য সময়ের জন্য তাতেই ভরসা করে নির্ভয় হয়ে যায়। তেমনি বাম দিকে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ

করবে—দেখবে যে, আল্লাহ্‌র আজিমুশ্‌শান কুদরত, অকল্পনীয় প্রতাপ ও প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্যের যার কোন শেষ নেই এবং আউলিয়া ও সাধকদের পর্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়ের জন্য তিনি পাকড়াও করে থাকেন— তখন একবার তোমার মনে হতাশা ও নিরাশার কালো ছায়া নেমে আসবে।

সুতরাং কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত নয়, সেজন্য কেবল ভরসা ও নিরাপত্তাবোধেরই সৃষ্টি হয় কিংবা কেবলমাত্র তাঁর প্রতাপ-প্রতিপত্তির প্রতি দৃষ্টি দেয়া ঠিক নয়, যাতে কেবল নিরাশা ও হতাশারই সৃষ্টি হয়। বরং একই সময়ে উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ্‌র রহমতের দিকে যেমন দৃষ্টি দেবে, তেমনি দৃষ্টি দেবে তাঁর প্রতাপ-প্রতিপত্তির দিকে। এভাবে উভয় দিকের কিছু কিছু গ্রহণ করার মাধ্যমে গড়ে উঠবে মধ্যম একটি বোধ, যে বোধ সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সঠিক। এভাবেই হাসিল করতে হবে শান্তির নিষ্কণ্টক পথ।

এক্ষেত্রে আরও মনে রাখতে হবে, কেবল আশার রাস্তা বড় সহজ এবং বড়ই প্রশস্ত, কিন্তু পরিণতি তার লোকসানজনক ও ক্ষতিকারক। আবার তেমনি কেবল ভীতির রাস্তাও খুবই প্রশস্ত, কিন্তু পরিণামে সরাসরি পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী। আর এতদুভয়ের মাঝখানে খওফ ও রিযার সমন্বয়ে নির্মিত যে রাস্তা, তা সংকীর্ণ এবং তাতে চলাও মুশকিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ রাস্তাই নিরাপদ। এ রাস্তায় চললে এ দুনিয়ায় যেমন কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের সৌভাগ্য হয়, তেমনি এজন্যই আখিরাতে মিলবে জান্নাত ও আল্লাহ্‌র দর্শন।

তোমরা কি জানো না, এ রাস্তা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেছেন? তিনি বলেছেনঃ

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمْعًا -

সে সকল লোক তাদের রবকে আশা ও ভীতির সাথে ডাকে।

অন্যত্র বলেছেন।ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ - جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

সুতরাং কোন ব্যক্তিই জানে না, তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে তাদের জন্য কি কি নয়ন তৃপ্তকারী সামানা লুক্কায়িত ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে।

(সূরা সাজদা ঃ ১৭)

সুতরাং বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি, তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং দৃঢ়তার সাথে তা কার্যকরী করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ খুব সহজে এটি হাসিল করা সম্ভব নয়।

এখন মনে রাখতে হবে যে, এ রাস্তায় চলা, যে নফস নেকীর প্রতি বিরূপ মনা, তাকে নেক কাজের প্রতি আগ্রহী করা এবং নেক কাজে স্থিতি অর্জন-এ তিনটি নীতিকে সম্মুখে রাখা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এ নীতিগুলোতে স্থিতি অর্জন ব্যতীতও তা সম্ভব হয় না। সে নীতি তিনটি হলো (১) প্রেরণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী এবং ভীতি ও সতর্ককারী আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ স্মরণ করা, (২) আল্লাহ্‌ কর্তৃক হিসেব-নিকেশ গ্রহণ এবং তৎকর্তৃক মাফ করার বিষয় স্মরণ করা এবং (৩) আখিরাতের শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা।

এর প্রতিটি বিষয়ই এখন আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করা হবে।

প্রথম নীতিঃ আশা ও ভীতি সম্পর্কে আল্লাহ্‌র ফরমান

প্রথমেই আল্লাহ্‌ পাক পবিত্র কুরআনে প্রেরণা ও সতর্কতা দান করে যে সব কথা বলেছেন এবং আশা ও ভীতি সম্পর্কে যা বলেছেন, সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

আশা সম্পর্কিত আয়াতের কিছু সংখ্যক নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا-

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সকল গুনাহ মাফ করেন।

وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ -

আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কে আছে, যে গুনাহ্ মাফ করেন?

غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ –

তিনিই গুনাহ্ মাফকারী এবং তওবা কবূলকারী।

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّئَاتِ –

আর তিনি এমন দয়াবান যে, আপন বান্দাদের তওবা কবূল করেন এবং তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ –

তোমাদের রব মেহেরবানী করাকে নিজের যিম্মা ধরে নিয়েছেন।

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ –

আমার রহমত সমস্ত বিষয়কে ঘিরেই পরিব্যাপ্ত, সুতরাং যারা আমাকে ভয় করে, তাদের নামে সে রহমত তো অবশ্যই লিখবো।

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ –

সত্যই আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও দয়াবান।

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا –

আল্লাহ পাক মু'মিনদের প্রতি অতি মেহেরবান।

মোটকথা, এ আয়াতগুলো ছাড়া এই একই অর্থ প্রকাশ করে রিযা বা আশা সম্পর্কিত এরূপ বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

তেমনি ভয় প্রদর্শনকারী ও তার প্রতাপ-প্রতিপত্তি প্রকাশকারী আয়াতও বহু আছে। যেমনঃ

يَا عِبَادِ فَاتَّقُوْنِ –

হে আমার বান্দাগণ! আমাকে (আমার শাস্তির জন্য) ভয় করো।

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ-

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদের এমনি (উদ্দেশ্যহীন) সৃষ্টি করেছিলাম এবং ধারণা করেছিলে যে, তোমরা আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে না?

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى -

মানুষ কি ধারণা করে যে, এমনিতেই (বেফায়দা) ছেড়ে দেয়া হবে?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَاَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ - مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهٖ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لاَ نَصِيْرًا-

না তোমাদের আকাঙক্ষায় কোন কাজ হয়, আর না আহলে কিতাবদের। যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে, তাকে তার শাস্তি দেয়া হবে আর সে ব্যক্তির আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বন্ধুও মিলবে না আর না পাবে কোন সাহায্যকারী। (সূরা নিসাঃ ১২৩)

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا -

আর তারা অজ্ঞতার দরুন মনে করছে যে, তারা বুঝি ভাল কাজ করেই চলেছে।

وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ -

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাদের সামনে এমন ব্যাপার উপস্থিত হবে, যে সম্পর্কে তারা ধারণাও করতে পারেনি।

وَ قَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا-

আমরা সেদিন কাফিরদের সেসব কাজের প্রতি মনোযোগ দেব, যে গুলো তারা পৃথিবীতে করে গেছে। তারপর তাদের এমন অসহায় করে ফেলব, যেমন বিক্ষিপ্ত ধুলির রাশি।

মোটকথা, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই কামনাই করছি, তিনি যেন আমাদের এসব থেকে রক্ষা করেন।

এখন আমি সে আয়াতগুলো উল্লেখ করবো, যে আয়াতগুলোতে ভীতি ও আশার বিষয় একই সাথে অপূর্বভাবে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

[হে মুহাম্মদ (স)] আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়াবানও বটে।

এরপর ইরশাদ করছেনঃ

وَاِنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ -

কিন্তু এই যে আমার আযাব খুবই কষ্টদায়ক।

এজন্য উপরিউক্ত বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, বান্দার মধ্যে যেন কেবল আশাই আধিক্য লাভ না করে। তিনি আরও বলেনঃ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

তিনি কঠিন শাস্তিদানকারী।

আবার বলেনঃ

ذِى الطَّوْلِ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ -

তিনিই কুদরতওয়ালা। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই।

উপরিউক্ত আয়াত এ মর্মই প্রকাশ করছে যে, শুধু যেন বান্দার মধ্যে ভয় ও ভীতির সঞ্চার হয়েই ব্যাপার শেষ হয়ে না যায়, ইবাদত করার তাকীদও অনুভূত হয়।

আবার বলেনঃ

وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ –

আল্লাহ্ তা'আলা ‍‍‍‍‍‍‍‍‍কেই (তোমাদের) ভয় করতে বলেন।

অপর স্থানে আবার বলেনঃ

وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ –

আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি খুবই মেহেরবান।

অতঃপর আর একটু গভীরভাবে আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী নিয়ে চিন্তা করুন।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ –

যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে না দেখেও ভয় করে।

এখানে 'খাশিয়া'কে 'রহমান'- এর সাথে উল্লেখ করেছেন। جبار এবং متكبر শব্দ উল্লেখ করেন নি। এমন বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ভয়ের সাথে রহমতের কথা উল্লিখিত হোক, যাতে তোমার অন্তরে কেবল ভীতিরই সঞ্চার হয়ে তোমার শান্তি ও স্বস্তিই বিলুপ্ত করে না দেয়। বর্ণনা ঠিক এমন যে, 'স্নেহার্দ্র পিতা'কে ভয় করো অথবা 'রহমদিল আমীর'কে ভয় করো।

সবকিছুরই উদ্দেশ্য হলো মধ্যম ও সঠিক অবস্থার সৃষ্টি হোক। কেবল নিরাশা বা কেবল আশা সৃষ্টি না হোক।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করে তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

দ্বিতীয় নীতিঃ আল্লাহ্র ব্যবহার পর্যবেক্ষণ

এবারে প্রথমে ভীতির দিকটা স্মরণ রাখো। তারপরই ইবলিসের ঘটনাটিকে পর্যালোচনা করো। ইবলিস আশি হাজার বছর আল্লাহ্র ইবাদত করেছিল। এক পা রাখা যায়, এমন জায়গাও অবশিষ্ট ছিল না, যে জায়গায় সে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদা করেনি। কিন্তু মাত্র একটি নির্দেশ অমান্য করার ফলেই সে হলো আল্লাহ্র দরবার থেকে বহিষ্কৃত। আশি হাজার বছরের ইবাদত ভেস্তে গেল।

কিয়ামত পর্যন্ত সে হলো মালাউন এবং তাকে পরিণত করা হলো চিরকালের জন্য কঠিন অগ্নির আযাবের ইন্ধনে। এমনকি বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ আমি জিবরাঈল (আ)-কে বায়তুল্লাহ্‌র পরদায় ঝুলতে দেখলাম। তিনি দোয়া করছেনঃ আয় ইলাহী! ওহে প্রভু! আমার নাম ও আকৃতিতে কোন পরিবর্তন করো না।

এরপর আদম (আ)-এর কথা ভেবে দেখো। তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং এমন নবী, যাঁকে আল্লাহ্ নিজ কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত ফেরেশতা যাঁকে সিজদা করেছেন। অতঃপর তাঁকে ফেরেশ্‌তাগণই কাঁধে করে আল্লাহ্‌র পাশে (প্রতিবেশী) নিয়ে রেখেছেন। সেই আদম (আ) যখন নিষিদ্ধ জিনিস থেকে সামান্য একটু মুখে দিলেন, তখনই নির্দেশ দেয়া হলোঃ আমার পাশে অমান্যকারীর স্থান হতে পারে না। ফেরেশতাদের নির্দেশ দেয়া হলোঃ (যে ফেরেশতাগণ তাঁকে বহন করে আল্লাহ্‌র প্রতিবেশী করেছিলেন), সমস্ত আসমান থেকে সরিয়ে আদমকে যমীনে রেখে এসো। বর্ণিত আছে, অতঃপর দু'শ বছর ধরে সেই গুনাহ্‌র জন্য আহাজারী, কষ্ট-বিপদ ও কঠোর পরিশ্রম না করা পর্যন্ত তাঁর তওবা কবূল করা হয়নি। তা সত্ত্বেও তার পরিণতি তাঁর বংশধরের জন্য চিরকাল বহন করতে হবে।

পর নূহ (আ)-এর কথায় আসা যাক। সকল রাসূলের আগে তিনি দীনের প্রচার করতে গিয়ে কত কষ্ট, কত যাতনাই না ভোগ করেছেন, তাঁর সে যাতনা ও কষ্টের কথা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। তা সত্ত্বেও কোনক্রমে তাঁর মুখ থেকে একবার অবাঞ্ছিত একটি বাক্য বের হওয়ার সাথে সাথেই তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হলোঃ

فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ - اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ -

আমার নিকট এমন অনাবশ্যক বিষয়ে সওয়াল করো না, যে সম্পর্কে

তোমার কোন জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে নসীহত করছি, তুমি ভবিষ্যতে যেন নাদান না হও। (সূরা হুদঃ ৪৬)

এমনকি বর্ণিত আছে -- এ ঘটনার পর নূহ (আ) শরমে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মাথা উঁচু করে আসমানের দিকে তাকান নি।

হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে একটি বিচ্যুতি ঘটেছিল। সেজন্য তিনি এতখানি ভীত ও বিনীত হয়েছিলেন যে, তিনি বলেছেনঃ

وَ الَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ -

যার প্রতি আমার আশা আছে যে, তিনি কিয়ামতের দিন আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা শুআরাঃ ৮২)

বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আ) ভীতিতে এমন কাঁদতে থাকতেন তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করা হয়। তিনি এসে তাঁকে বলতেনঃ কোন দোস্ত কি নিজের দোস্তকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পারেন?

এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম (আ) বলতেনঃ নিজের ভুলের প্রতি যখন তাকাই, তখন আমি বন্ধুত্ব সম্পর্কের কথা ভুলে যাই।

এবার হযরত মূসা (আ)-র ঘটনা পর্যালোচনা করো। তিনি রাগবশত এক ব্যক্তিকে চপেটাঘাত করেছিলেন। এজন্য তিনি আল্লাহ্র দরবারে কতই না কান্নাকাটি, কতই না আহাজারী করেছেন। কত যে তওবা করেছেন, তার কি কোন ইয়ত্তা আছে? তিনি দোয়া করে বলেছেনঃ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ -

হে পরওয়ারদিগার! আমি আমার নফ্সের উপর জুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। (সূরা কাসাসঃ ১৬)

হযরত মূসা (আ)-র সময়ে এক ব্যক্তির নাম ছিল বালাম ইবনে বাউর। তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি যখন আসমানের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাতেন, তখন আরশ পর্যন্ত সকল জিনিসই তাঁর নজরে পড়তো। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاءَ الَّذِىْ اٰتَيْنَاهُ اٰيَاتِنَا - فَانْسَلَخَ مِنْهَا -

তাদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পড়ে শোনাও, যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শন। অতঃপর সে তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

এ আয়াতে তাঁর কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যক্তিও একবার মাত্র তার দৃষ্টিতে অন্য দুনিয়াবাসীদের প্রতি ফিরিয়েছিল এবং স্বীয় আউলিয়াদের কোন একজনের সম্মানের বিষয় পরিত্যাগ করেছিল, যার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তি থেকে তাঁর মারিফাত কেড়ে নিলেন এবং তাকে পরাজিত কুকুরের ন্যায় করা হলো। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ -

অতঃপর তার অবস্থা কুকুরের ন্যায় হয়ে গেল। যদি তুমি তাকে আক্রমণ করো, তবুও সে কেবল হাঁপায় (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭৬)

(আসতাগফিরুল্লাহ্!) এমনকি চিরকালের জন্যই সে ধ্বংসে নিপতিত হলো। ভ্রান্তির অতল গহবরে হলো তার স্থান।

কোন কোন আলিম সে ব্যক্তি সম্পর্কেই বলেছেন যে, সে ব্যক্তির নিকট প্রথমে বার হাজার জ্ঞানান্বেষী ভীড় করে থাকতো। তাঁর নিকট থেকে নোট নিতো। কিন্তু পরে তার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তা আর বলার নয়। সে ব্যক্তিই প্রথম এ সম্পর্কে কিতাব লিখে যে, বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টা নেই।

আমি বারবার আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করছি যে, এমন কঠিন শাস্তি এবং এমন অপমান ও অসম্মানে যেন তিনি আমাদের কখনো পতিত না করেন।

এবার দুনিয়ার ভ্রষ্টতা ও নিষ্ঠুরতার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। এ দুনিয়া বিশেষ করে আলিমদের গোমরাহ্ করে। খানিকটা বিবেক খাটিয়ে চলতে হবে। কারণ ব্যাপার বড্ড কঠিন। জীবনের সময় অল্প, আমলের ফিরিস্তি দীর্ঘ। অপরপক্ষে, আল্লাহ্ সব কিছুরই খবর রাখেন। যা হোক, তিনি যদি আমাদের আমলকে বিশুদ্ধতার সাথে পূর্ণ করে দেন এবং আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করেন, তাও তাঁর পক্ষে মুশকিল কিছু নয়।

এরপর হযরত দাউদ (আ)-এর কথা স্মরণ করো। তিনি ছিলেন যমীনে আল্লাহ্র খলীফা। তিনি একটি ভুল করেছিলেন সেজন্য তিনি এত কেঁদেছিলেন

যে, তাঁর ক্রন্দনের ফলে যে অশ্রুপ্লাবন হয়েছিল, তাতে মাটিতে ঘাস জন্মেছিল। তবুও এই বলে কাঁদছিলেনঃ আমার প্রভু আমার আহাজারীর প্রতি রহম করছেন না। জবাব এলোঃ ওহে দাউদ! গুনাহ্ ভুলে যাওয়া হয়েছে। আহাজারীটাই স্মরণে আছে। মোটকথা, চল্লিশ বছর কান্নকাটির পর তাঁর তওবা কবূল হয়েছিল।

ইউনুস (আ)-এর কথাই স্মরণ করা যাক। কোন কারণে একটু অনাবশ্যক ক্রোধ হয়েছিল। সেজন্যই তাঁকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাছের পেটে আটক রাখা হয়। মাছের পেটে থেকে তিনি বলতেনঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -

ফেরেশতাগণ তাঁর এ আওয়াজ শুনতে পেয়ে আল্লাহ্র দরবারে জানালেনঃ আওয়াজ তো বোঝা যায়। কিন্তু কোথায় তা ঠিক করা যায় না। তখন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেনঃ এটা আমার বান্দা ইউনুস-এর ডাকের আওয়াজ। ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক আটকের প্রতি ইংগিত করে নাম উল্লেখ না করে তাঁর সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করলেন ঃ و ذو النون অতঃপর পুনরায় বললেনঃ

فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ فَلَوْلاَ اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ

لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -

অতঃপর মাছ তাকে অক্ষত অবস্থায় বের করে দিল। সে তখন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল। যদি সে তখন তসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো (অর্থাৎ তসবীহ না পড়তো) তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তার (মাছের) পেটেই থাকতে হতো। (সূরা সাফ্ফাতঃ ১৪২-১৪৪)

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁর নিয়ামত ও দয়ার বিষয় উল্লেখ করে বলেছেনঃ

لَوْلاَ اَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ -

যদি আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে সাহায্যকারী না হতেন, তাহলে যে ময়দানে তাকে মাছের পেট থেকে ফেলে দেয়া হয়েছিল, সেখানেই দুরবস্থায় ফেলা হতো। (সূরা কলমঃ ৪৯)

এখানে সাহায্যকারী হওয়া অর্থে তওবা কবূলও বোঝায়। কারণ, তওবা কবূলের পূর্বে সাহায্য করার প্রশ্নই উঠে না।

সুতরাং হে অবুঝ সাধক! আল্লাহ্র এ ব্যবহার সম্যক উপলব্ধি করো। ভেবে দেখো, এটা সেখানেই শেষ হয়নি। এমনিভাবে তা সাইয়েদুল মুরসালীন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। এমনকি, রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও বলা হয়েছেঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَاتَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

সুতরাং আপনাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনি সেভাবেই দীনের পথে কায়েম থাকুন। আর যারা কুফরী থেকে তওবা করে আপনার সাথেই আছে, তারাও ঠিক থাকুক। দীনের সীমারেখা ছাড়িয়ে কেউই এদিক-ওদিক একটু নড়বে না।(মনে রাখবে, আল্লাহ পাক) তিনি নিশ্চয়ই সকলের কার্যকলাপ উত্তমভাবে প্রত্যক্ষ করেন। (সূরা হুদঃ ১১২)

এমনকি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেনঃ

شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ وَ اِخْوَاتُهَا

সূরায়ে হূদ এবং এ ধরনের অন্যান্য সূরা আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।

আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেছেনঃ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ -

এমনকি, আল্লাহ্ পাক মাগফিরাতের সাথে সাথে পুরস্কারের ঘোষণাও দিয়েছেন।

তিনি বলেনঃ

وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ -

আমরা আপনার উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যে বোঝা আপনার কোমর ভেংগে রেখেছিল। (সূরা ইনশিরাহ)

আবার ইরশাদ করেনঃ

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ -

যাতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অগে-পিছের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেন।

(সূরা ফতহ্ ঃ ২)

এতদ্সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে এত অধিক নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে যেতো। এ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরাম আরয করেছিলেনঃ আয় রাসূলুল্লাহ (সা)! আপনি কেন এত ক্লেশ ভোগ করেন? আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অতীত এবং ভবিষ্যতের সকল গুনাহ্ই মাফ করে দিয়েছেন। এ কথার জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ

اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا -

আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?

রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেনঃ

لَوْ اَنِىْ وَ عِيْسٰى اَوْ خُذْنَا بِمَا كَسَبَتْ هَاتَانِ لِعَذَا بِنَا عَذَابًا

اَلِيْمًا لَمْ يُعَذِّبْهُ اَحَدٌ فِى الْعَا لَمِيْنِ -

আমার ও ঈসা (আ)-র আমলের ব্যাপারে যদি ধরপাকড় (হিসেব-নিকেশ) শুরু হয়, তাহলে আমাদের এমন শাস্তি দেয়া হবে যে, আজ পর্যন্ত আলমে এমন শাস্তি কাউকে দেয়া হয়নি।

তা সত্ত্বেও তিনি রাতে বেশুমার নামায পড়তেন, কাঁদতেন এবং এ দোয়া করতেনঃ

اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَبِرِ ضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُبِكَ

مِنْكَ لاَ اُ حْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا عَلٰى اَثْنَيْتَ نَفْسِكَ -

আমি তোমার পবিত্রতার মাধ্যমে তোমার আযাব এবং তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মাধ্যমেই তোমা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আমি তোমার সেইরূপ প্রশংসা-কীর্তন করতে অপারগ, প্রকৃতপক্ষে তুমি যেরূপ (প্রশংসার যোগ্য), আর তুমি নিজে তোমার সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছ।

আরও লক্ষ্য করে দেখে সাহাবায়ে কিরামের কথা। তাঁরাই হলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম উম্মত। তাঁরাই সকল যুগের সেরা মানুষ। তথাপি হয়তো কোন সময় তাদের মধ্যে একটু কৌতুকের ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। তজ্জন্যই এই আয়াত অবতীর্ণ করা হয়ঃ

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ –

ঈমানদারদের জন্য কি এখনো সে সময় হয়নি যে, আল্লাহ্‌র নসীহতের জন্যে তাদের অন্তঃকরণ ঝুঁকে পড়বে? (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

এতদ্‌সত্ত্বেও এই উম্মতের জন্যও 'হদুদ' ও অন্যান্য ব্যাপারে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এমনকি, ইউনুস ইবনে ওবায়েদ (র) বলতেনঃ পাঁচ দিরহাম চুরির জন্যও অংগচ্ছেদের ব্যাপারে অভয় (উপেক্ষা নীতি) হওয়া উচিত নয়। কারণ, তাতেও আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এজন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমাদের প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন তাঁর রহমতের পক্ষপুটে আমাদের আশ্রয় দান করেন। কারণ, তিনিই আরহামুর রাহিমীন।

যা হোক, এখন একবার আশার দিকটিকে স্মরণ রেখে আল্লাহ্ পাকের অজিমুশ্‌শান রহমত সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কারণ, এ আলোচনাও জরুরী।

আল্লাহ্‌র রহমতের যে কোন সীমা নেই, কোন প্রকারেই যে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়, তার প্রমাণ একটিমাত্র বিষয়েই পরিস্ফুট যে, সত্তর বছর কুফরী করার পরও যদি কোন ব্যক্তি একটি মুহূর্তের তরে ঈমান আনয়ন করে, তবে তিনি তাকেও মাফ করে দেন। আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ইরশাদ করেনঃ

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ -

আপনি সে সব কাফিরদের বলে দিন যে, যদি তারা কুফরী থেকে বিরত হয়, তাহলে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের যে গুনাহ্ হয়েছে তার সবই মাফ করে দেয়া হবে। (সূরা আনফালঃ ৩৮)

ফিরাউনের যাদুকরদের কথা কি তোমরা শোননি? তারা হযরত মূসা (আ)-র সাথে প্রতিযোগিতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসেছিল এবং আল্লাহ্র দুশমন ফিরাউনের নামে শপথ করে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। কিন্তু মূসা(আ)-র কার্যকলাপ (মুজিযা) প্রত্যক্ষ করে তারা যখন বুঝতে পারলো যে, তিনিই সত্যের উপরে আছেন, তখন তারা সমস্বরে বলে উঠলোঃ امنا برب العالمين অর্থাৎ আমরা বিশ্বপ্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম। এ ঘটনার পর তারা আর কোন নেক কাজ করেছেন বলে জানা যায় না। তথাপি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে কি রকম প্রশংসা করে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। এক মুহূর্তের ঈমানের জন্য তাদের কত কবীরা ও কত সগীরা গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছিলেন। তারা কেবল সৎ অন্তঃকরণে এ বাক্যটি বলেছিল- امنا برب العالمين কিন্তু তা-ই কতখানি মকবুল হয়েছিল যে, তাঁদের অতীতের সমস্ত গুনাহ্ খাতা মাফ করে দেয়া হয়। আর তাদের বানিয়ে দেয়া হলো জান্নাতের শহীদদের চিরকালের নেতা।

এ ঘটনা সে ব্যক্তিদের, যারা সকল প্রকারের দুষ্কৃতি, কুকর্ম, যাদুগিরী প্রভৃতিতে লিপ্ত থাকার পর মাত্র এক মুহূর্তের জন্য তার তওহীদ বর্ণনা করেছিল। অথচ তাদের প্রতিই আল্লাহ্র যখন এত মেহেরবানী, তখন যারা সমস্ত জীবন আল্লাহ্র মারিফত এবং তওহীদের মধ্যেই কাটিয়ে দেয়, তাদের প্রতি তিনি কতখানি দয়া করবেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তদুপরি যারা আল্লাহ্ ব্যতীত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন কিছুর প্রতিই আকৃষ্ট নয়, তাদের জন্য আল্লাহ্ পাক কি যে রহমতপূর্ণ ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তা কি কল্পনা করা যায়?

আসহাবে কাহাফের কথা স্মরণ করে দেখো। তারা তাদের সমস্ত জীবন কুফরী ও মুনাফিকীতে অতিবাহিত করেছিল। তথাপি যখন তারা প্রত্যাবর্তন করলো এবং বললোঃ

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا -

আমাদের রব তো তিনি, যিনি আসমান ও যমীনের রব। আমরা তাঁকে ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবো না। (সূরা কাহফ ঃ ১৪)

এভাবে তারা যখন আল্লাহ্র দরবারে দরখাস্ত পেশ করলো, তখন কিভাবেই না তাদের দরখাস্ত কবূল করা হলো এবং কত নিয়ামত ও সম্মানে তাদের বিভূষিত করা হলো। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ -

তাদের কখনো ডানে, কখনো বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম।
(সূরা কাহফঃ ১৮)

তাদের এত সম্মানিত করেছিলেন এবং এতখানি 'ভয়-ভীতির' ঐশ্বর্যে সুসজ্জিত করেছিলেন যে, তাদের কথা শ্রেষ্ঠতম মানবকে উদ্দেশ্য করেও বলেছেনঃ

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا -

আপনি যদি উঁকি দিয়ে তাদের দেখেন, তাহলে তাদের অবস্থা দেখে আপনিও পলায়নপর হতেন এবং আপনার মধ্যে তাদের ভীতি সঞ্চারিত হতো।
(সূরা কাহফ ঃ১৮)

এমনকি, তাদের সাথে যে কুকুরটি অবস্থান করতো, তারও এত সম্মান দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র গ্রন্থে সে কুকুরের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। দুনিয়াতে তাদের সাথেই ওকে আটক করেছেন, আখিরাতেও তাদের সাথেই কুকুরটিও জান্নাতে দাখিল হবে।

সুতরাং, ভেবে দেখো! আল্লাহ্কে মাত্র চিনেছিল, ইবাদত করেনি, এমন একটি জাতির একটি কুকুরের প্রতি যদি আল্লাহ্র এত রহমত ও করুণা বর্ষিত হয়, তাহলে যে মুসলমান বান্দা আল্লাহ্কে জেনেছে, তাঁর সেবায় ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং সত্তর বছর পর্যন্ত সেই একই সাধনায় কাটিয়েছে, তার উপর আল্লাহ্র রহমত ও করুণার যে বারি-বর্ষণ হবে, তাতে আর সন্দেহের কি

আছে? আর যদি সে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতেই সত্তর হাজার বছর জীবিত থাকে,তাহলে তার উপর আল্লাহ্র রহমত ও করুণা কিভাবে বর্ষিত হবে, তা কি কল্পনা করা যায়! তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না যে, পাপীদের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) বদ্দোয়া করেছিলেন বলে তাঁর উপর আল্লাহ্ পাক কিরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন?

হযরত মূসা (আ) ও কারূনের ঘটনা স্মরণ করে দেখ। মূসা (আ)-কে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ কারুন তোমার নিকট সাহায্য চেয়েছিল, অথচ তুমি তা করনি। কিন্তু আমি আমার ইয্যত ও বুযুর্গীর শপথ করে বলছি, যদি সে (কারুন) আমার নিকট সাহায্য চাইত, তবে আমি তাকে সাহায্য করতাম এবং তাকে ক্ষমা করতাম।

হযরত ইউনুস (আ)-এর কথাই স্মরণ কর না কেন, তাঁর জাতি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক কেমন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন? তারপর আবার কত দ্রুত তাদের ওযর কবূল করে বিভ্রান্ত-প্রায় অবস্থা থেকে তাদের রক্ষা করেন।

আমাদের রাসূলে করীম (সা)-এর কথাই ভেবে দেখ। তিনি একদিন বনী শায়িবার দরজায় দাখিল হলে তথায় উপস্থিত একদল লোক হেসে উঠেছিল বলে তিনি বলেছিলেনঃ তোমরা কেন হাসছ? এরপরে আমি যেন আর কখনো হাসা অবস্থায় না দেখি। অতঃপর তিনি যখন হাজরে আসওয়াদের নিকটবর্তী হয়েই আবার পিছন ফিরে বললেনঃ আমার নিকট জিবরাঈল (আ) আগমন করেছিল। তিনি বললেনঃ হে মুহাম্মদ (সা)! আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ আমার রহমত থেকে আমার বান্দাদের কেন নিরাশ করছো?

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ –

আমার বান্দাদের বলে দাও যে, আমি গাফুরুর রহীম। (সূরা হিজর ঃ ৪৯)
রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও বলতেনঃ

اَللّٰهُ اَرْحَمُ بِالْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْوَلَدَةِ الشَّفِيْقَةِ بِوَلَدِهَا –

আল্লাহ্ পাক মু'মিন বান্দাদের প্রতি স্নেহার্দ্র জননীর চাইতেও অধিক দয়াশীল।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مِائَتَهُ رَحْمَةٍ فَوَاحِدُهُ مِنْهَا قَسَمَهَا بَيْنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْبَهَائِمِ فِيْهَا يَتَطَاطَعُوْنَ بِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَاَوْخَرُ وَمِنْهَا تِسْعَةٌ وَّتِسْعِيْنَ لِنَفْسِهٖ لِيَتَرَحَّمَ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

আল্লাহ্ পাকের শতটি রহমত রয়েছে। তন্মধ্যে মাত্র একটি রহমত সমস্ত মানুষ, জিন ও অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। সে সূত্রেই তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি ও কৃপা প্রদর্শন করে থাকে। আর অবশিষ্ট ৯৯টি আল্লাহ্ পাক নিজের নিকট সংরক্ষিত রেখেছেন। কিয়ামতের দিন এগুলোর দ্বারা তিনি বান্দাদের প্রতি রহমত প্রদর্শন করবেন।

সুতরাং, আল্লাহ্ পাক যখন একটি রহমতের দ্বারাই তোমার উপর তাঁর মারিফাত প্রভৃতির এতখানি পুরস্কার ও সম্মান দান করেছেন, তখন আহলে সুন্নত আল-জামাতের মারিফাতসহ মানব-শ্রেষ্ঠ নবী (সা)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ রহমত থেকেও তুমি অমূল্য সম্পদ লাভ করতে সমর্থ হবে।

পরিশেষে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমার এ বিনীত আরয যে, তিনি যেন তাঁর রহমত ও করুণা এবং বরকত থেকে আখিরাতে বঞ্চিত হওয়ার দুর্ভাগ্য ও অসম্মানে আমাদের পতিত না করেন। তিনিই সবচাইতে দয়াবান ও করুণাময়।

তৃতীয় নীতিঃ পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির হুঁশিয়ারী

এ নীতিটিকে বুঝবার জন্য পাঁচটি অবস্থাকে স্মরণ রাখতে হবে। মওত, কবর, কিয়ামত, জান্নাত ও দোযখ। এই স্থানগুলোতে একদিকে নেককার ও অপরদিকে গুনাহ্গারদের কিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় এবং হতে হবে, সে বিষয়গুলোকে স্মরণ করাই হলো এক্ষেত্রে জরুরী কর্তব্য।

মওত—এ প্রসংগে কয়েকটি ঘটনা আলোচনাই যথেষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

প্রথম ঘটনা

ইবনে শাবরামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে—তিনি বলেছেনঃ আমি ইমাম শাবীসহ এক রোগীকে দেখতে গেলাম। মৃত্যু-যন্ত্রণা তাঁর উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি বসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা শারীকালাহু' উচ্চারণ করাচ্ছিল। ইমাম শাবী তাকে বললেনঃ একটু আস্তে উচ্চারণ করাও। একথা শুনে রোগী বলে উঠলোঃ আপনি উচ্চারণ করান, আর না করান আমি কিছুতেই এ কলেমা পরিত্যাগ করতে পারি না। অতঃপর সে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলোঃ

وَ اَلْزَ مَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا –

আর, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের 'তাকওয়া'র কলেমায় দৃঢ়বদ্ধ রেখেছেন এবং তারা তার যোগ্য এবং অধিকারীও বটে। (সূরা ফতহঃ ২৬)

একথা শুনে ইমাম শাবী বললেনঃ আল্লাহ্‌র অসংখ্য প্রশংসা! যিনি আমাদের এ বন্ধু ও সহযোগীকে নাজাতের পরিবেশে রেখেছেন।

দ্বিতীয় ঘটনা

ফোযায়েল ইবনে আয়ায তাঁর এক শাগরেদ মৃত্যু-শয্যায় শায়িত বলে জানতে পেরে তাকে দেখতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর অসুস্থ শাগরেদের শিয়রে বসে সূরায়ে ইয়াসিন পাঠ করা শুরু করলেন। সূরা পাঠ করা শুনে শাগরেদ বলে উঠলেনঃ ওস্তাদজী! এ সূরা পাঠ করবেন না। ফোযায়েল চুপ করলেন। অতঃপর শাগরেদকে কলেমায়ে 'লা'-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়তে বললেন। কিন্তু সে জওয়াব দিলঃ 'আমি কলেমা উচ্চারণ করবো না কারণ, ও কলেমায় আমার কোন দরকার নেই।' এ বাক্য শেষ হতে না হতেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। অতঃপর ফোযায়েল ইবনে আয়ায স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে চল্লিশ দিন ধরে কেবল কাঁদতে থাকলেন। এমনকি, তিনি ঘর থেকে আর বের হলেন না। এরপর একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর সে শাগরেদকে দোযখের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হযরত ফোযায়েল তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি কারণে আল্লাহ্ পাক তোমার নিকট থেকে ঈমানের অমূল্য-ধন কেড়ে নিলেন? আমার শাগরেদদের মধ্যে তো তোমার উচ্চ মর্যাদা ছিল।

সে ব্যক্তি জবাবে বললোঃ তিনটি কারণে এমন হয়েছে। প্রথমতঃ চোগলখোরী; কারণ, আমি আমার সঙ্গীদের এমন সব কথা বলতাম, যা আপনার নিকট বলতাম না। দ্বিতীয়ত, হিংসা। কারণ আমি আমার সাথীদের সাথে হিংসা করতাম। তৃতীয়ত, আমার একটি রোগ ছিল। আমি একদিন চিকিৎসকের নিকট গিয়ে সে রোগের প্রতিকারের কথা জিজ্ঞেস করলাম। চিকিৎসক আমাকে জানালো যে, বছরে একবার করে এক পেয়ালা শরাব পান করতে হবে। তা না করলে এ রোগ যাবে না। কি করব? বাধ্য হয়ে আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে শরাব পান করতাম।

তৃতীয় ঘটনা

(ক) আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক সম্পর্কে বর্ণিত আছে। তাঁর মৃত্যুক্ষণ যখন ঘনিয়ে এলো, তখন আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং একটু মুচকি হাসি তাঁর মুখে ছড়িয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন ঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ –

(খ) আমি ইমামুল হারামাইনের নিকট শুনেছি। তিনি উস্তাদ আবি বকর থেকে বর্ণনা করেছেন—তিনি বলেছেন ঃ আমরা যখন শিক্ষালাভ করি, সে সময় আমার এক সঙ্গী ছিল। সে জ্ঞান লাভের ব্যাপারে খুবই চেষ্টা-তদবীর করতো। তাছাড়া, সে খুব মুত্তাকী এবং ইবাদত-গোযারও ছিল। কিন্তু শত চেষ্টা-তদবীর সত্ত্বেও জ্ঞান হাসিলের ব্যাপারে সে খুব কামালিয়ত অর্জন করতে সক্ষম হলো না। তার এ অবস্থা দৃষ্টে আমি তাজ্জব হলাম। অতঃপর সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। এ অসুস্থাবস্থায়ও সে সব সময়ই আউলিয়ায়ে কিরামদের তাঁবুতেই সময় কাটাতে লাগলো। কোন চিকিৎসকের শরণাপন্ন কখনো সে হলো না। অপরপক্ষে, অসুস্থাবস্থায়ও সে তার পূর্বের চেষ্টা-তদবীর অব্যাহত রাখলো। তারপর হঠাৎ একদা তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়লো। সে সময় আমি তার পাশে বসে আছি— একবার সে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর বললো ঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ –

অতঃপর তৎক্ষণাৎ তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল ! (সুবহানাল্লাহ্)

চতুর্থ ঘটনা

মালিক ইবনে দিনার থেকে বর্ণিত, তাঁর এক পড়শী মৃত্যুশয্যায় শায়িত জেনে তিনি তাকে দেখতে গেলেন। সে মালিক ইবনে দিনারকে দেখে বললো ঃ আমার সামনে দু'টি আগুনের পাহাড়। এতে উঠতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

ইবনে দিনার বলেন, আমি তার পরিবারের লোকদের নিকট জানতে পারলাম যে, এ ব্যক্তির দু'টি বাটখারা ছিল। একটিতে জিনিস মেপে নিত আর একটির দ্বারা জিনিস মেপে দিত।

ইবনে দিনার বলেন ঃ আমি বাটখারা দু'টি চেয়ে নিলাম এবং একটিকে অপরটির উপর ছুঁড়ে মেরে ভেঙ্গে ফেললাম। অতঃপর সে ব্যক্তিকে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম। সে জবাব দিল ঃ হ্রাস পাওয়া তো দূরের কথা, আরও বেশী— অনেক বেশী বোধ হচ্ছে।

কবর ও মৃত্যুর পরের অবস্থা

এ ব্যাপারেও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট।

প্রথম ঘটনা

কোন এক সালেহীন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সুফিয়ান সওরীর ইন্তেকালের পর তাঁকে আমি খাবে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,'আবূ আবদুল্লাহ্! আপনার অবস্থা কি? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেনঃ এটা কুনিয়াত ধরে ডাকার সময় নয়। অতঃপর আমি পুনরায় বললামঃ সুফিয়ান, কেমন আছেন? এবার তিনি আমার কথার জবাবে এ মর্মার্থে এক কবিতা পাঠ করলেন ঃ

আমি আমার পরওয়ারদিগারের প্রতি বাহ্য দৃষ্টিতে তাকালাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ ওহে ইবনে সাঈদ (সুফিয়ান সওরী)! তোমার প্রতি আমার সন্তুষ্টি ও খোশনূদী—ধন্য হও। রাতের অন্ধকারে অশ্রু-ভারাক্রান্ত, উদ্বিগ্ন এবং বেদনাপ্লুত মন নিয়ে তুমি জেগে কাটিয়েছ। সুতরাং যে সৌধ তোমার, সেটাই গ্রহণ করতে পারো। আর আমার দর্শন লাভ করতে থাকো। কারণ আমি তোমা থেকে দূরে নই।

দ্বিতীয় ঘটনা

কোন এক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পর অপর ব্যক্তি খাবে দেখতে পেল। দেখলো, তার চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং হাত দু'টি কাঁধের সাথে বাঁধা! জিজ্ঞেস করা হলোঃ আল্লাহ পাক তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তখন জবাবে সে মর্মার্থে এ কবিতা পাঠ করলো ঃ

'এমন একদিন ছিল, যখন আমরা সময় নিয়ে খেলা করতাম। কিন্তু এখন সময় আমাদের নিয়ে কৌতুক করছে।'

এখন উপরিউক্ত ঘটনায় বর্ণিত দুই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখ। কিরূপ বিপরীত তাদের দশা। আরও দুই ব্যক্তির কথা শোন ঃ

প্রথম ব্যক্তি

কোন এক নেককার ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর একটি ছেলে ছিল। ছেলেটিকে শহীদ করে ফেলা হয়। অতঃপর সে ব্যক্তি তার ছেলেকে কোনদিন আর খাবেও দেখতে পেলেন না। কিন্তু উমর ইবনে আবদুল আযীয যেদিন ইন্তেকাল করেন, সে রাতে তাঁর ছেলেকে তিনি খাবে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ইন্তেকাল করনি ? ছেলে জবাব দিল ঃ না, আমাকে শহীদ করা হয়েছে। আমি জীবিতই আছি— আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আমি রিযিক পেয়ে থাকি।

উক্ত নেককার ব্যক্তি বলেন ঃ অতঃপর আমি আমার ছেলেকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম ঃ এতদিন তো তোমাকে দেখলাম না। আজ কি জন্য এসেছো? সে জবাবে বললো ঃ সমস্ত আসমানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, উমর ইবনে আবদুল আযীযের জানাযায় শরীক হওয়া থেকে কোন নবী, কোন সিদ্দিক এবং কোন শহীদ যেন বাদ না থাকে। এ জন্য আমি তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছি। তাই আপনাকে সালাম জানাতে এলাম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

অপর একটি ঘটনায় জানা যায়, হিশাম ইবনে হাসান (র) থেকে বর্ণিত আছে—তিনি বলেছেন ঃ আমার এক যুবক ছেলে ছিল। সে মারা গেল। আমি

একদিন খাবে তাকে দেখতে পেলাম। কিন্তু দেখি যে, চেহারায় বৃদ্ধের ছাপ পড়েছে। আমি এ অবস্থা দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ হে বৎস! বৃদ্ধের ছাপ কোথা থেকে এলো? সে জবাবে বললোঃ অমুক ব্যক্তি যখন (ইন্তেকাল করে) আমাদের নিকট এলো, তখন তার আগমনের দরুন দোযখ একটি ঠাণ্ডা (স্বস্তির নিঃশ্বাস) শ্বাস ফেললো। দোযখের এ ঠাণ্ডা শ্বাসেই আমরা সব বুড়ো হয়ে গেলাম।

আয় আল্লাহ্ ! আমাদের সকলকে দোযখের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো।

কিয়ামত

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার এ ফরমানটিকে সম্মুখে রাখতে হবেঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا -

যেদিন আমরা মুত্তাকীদের রহমানের (নিয়ামতপূর্ণ স্থান) দিকে মেহমান হিসেবে একত্র করবো এবং পাপীদের দোযখের দিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় টেনে নিয়ে যাবো। (সূরা মরিয়ম ঃ ৮৫-৮৬)

এক ব্যক্তি তো কবর থেকে এমন শান-শওকতে উঠবেন যে, তার জন্য 'বোরাক' এবং মুকুট ও মাণিক্য-খচিত পোশাক প্রস্তুতই থাকবে। তাঁর মর্যাদা এত বেশি হবে যে, শুধু জান্নাতেই তাঁর স্থান হবে না— তিনি হেঁটেও সেখানে যাবেন না— যাবেন বোরাকে চড়ে। অপরপক্ষে, অপর এক ব্যক্তির অবস্থা এই হবে যে, সে যখন কবর থেকে উঠবে, তখন তার জন্য প্রস্তুত থাকবে লোহার শিকল, পায়ের বেড়ী আর রশি। তাকে হেঁটে হেঁটেও দোযখে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। বরং তাকে উপুড় করে ফেলে হেঁচড়ে দোযখে নিয়ে যাওয়া হবে। (আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের এ ধরনের আযাবের কারণ থেকে রক্ষা করো।)

আমি কয়েকজন আলিমের কাছেই শুনেছি, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেনঃ কিয়ামতের দিন একদল লোক কবর থেকে বের হওয়ার আগেই

তাদের জন্য এমন সব সওয়ারী মওজুদ থাকবে, যেগুলোর পাখা হবে সবুজ বর্ণের। তাঁরা এগুলোতে সওয়ার হলে সওয়ারীগুলো তাঁদের নিয়ে কিয়ামতের প্রান্তে উড়তে থাকবে। অতঃপর তাঁরা যখন জান্নাতের নিকটবর্তী হবেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের দেখতে পাবেন তখন তাঁরা পরস্পর বলাবলি করবেন। একদল বলবেনঃ এরা কে? অপর দল জবাব দিবেনঃ সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের মধ্যেই কোন দল হবেন।

অতঃপর কতিপয় ফেরেশতা তাঁদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমরা কারা এবং কোন্ নবীর উম্মত? তাঁরা জবাব দেবেনঃ আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত। তখন ফেরেশতাগণ পুনরায় জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমাদের হিসেব কি হয়ে গেছে? তাঁরা জবাব দেবেনঃ না। ফেরেশতাগণ পুনরায় জিজ্ঞেস করবেনঃ তোমাদের আমলের ওযন হয়ে গেছে? তাঁরা জবাব দেবেনঃ না হয়নি। তখন ফেরেশতাগণ তাঁদের বলবেন যে, তাহলে ফিরে যাও। তোমাদের এ সবকিছুরই মুকাবিলা করতে হবে। তখন তাঁরা জবাব দেবেনঃ আমাদের তো এমন কিছু ছিল না, যার জন্য হিসেব-নিকেশ হবে।

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাঁরা বলবেনঃ আমরা তো দুনিয়ার কোন জিনিসের অধিকারী হইনি, যার দ্বারা ন্যায়পরায়ণতা বিনষ্ট বা জুলুমের ব্যাপার ঘটতে পারে ? বরং পরওয়ারদিগারের ডাকেই আমরা ইবাদত করেছি— তিনি আহবান করেছেন বলে এসেছি। তখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আওয়াজ হবে যে, আমার এ বান্দারা ঠিকই বলছে।

مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

তাছাড়া, তোমরা কি আল্লাহ্ পাকের এই ফরমানটি শোননি? তিনি বলেছেনঃ

اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ –

যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সে বক্তি কি তার চাইতে উত্তম, যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ অবস্থায় আগমন করবে? (সূরা হা-মীমঃ ৪০) সুতরাং ভেবে দেখ, এত সব বিপদাপদ, ভয়-ত্রাস ও আশঙ্কার মধ্যে যে ব্যক্তি নির্ভয় থাকবে— যার অন্তরে সামান্যতম ভয়ের উদ্রেক হবে না— যে থাকবে সম্পূর্ণ

নিরাপদ— তিনি সেদিন কত মর্যাদাশীল, কত সম্মানী হবেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করছি ঃ হে পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাদের সেই মহান শহীদানের মর্যাদা দান করো। হে আল্লাহ্ ! তোমার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

জান্নাত ও দোযখ

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের দু'টি আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই যথেষ্ট হয়ে যায়। তার একটি হলো ঃ

وَ سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا –

এবং তাদের পরওয়াদিগার তাদের পবিত্র শরাব পান করতে দেবেন।

(সূরা দাহর ঃ ২১)

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا –

এটা তোমাদের জন্য পুরস্কার। আর তোমরা দুনিয়ায় যে চেষ্টা করেছিলে, তা মকবুল হয়েছে। (সূরা দাহর ঃ ২২)

অপরপক্ষে দোযখীদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ– قَالَ اَخْسَؤُا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ –

হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! আমাদের এ জাহান্নাম থেকে বের করে দাও। পুনরায় যদি আমরা অনুরূপ করি তাহলে আমরা সত্যিই পাপী বলে প্রতিপন্ন হবো।

কিন্তু আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে বলা হবেঃ এ জাহান্নামেই মুখ বুঁজে পড়ে থাকো— আমার সাথে আর কথা বলো না।

বর্ণিত আছে, এ সময় এদেরকে কুকুরে রূপান্তরিত করা হবে। মোটকথা, অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত হবে যে, তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। ইয়াহিয়া ইবনে সাদ আর রাজী বলেছেনঃ জানি না, কোন্ বিপদটি বড় বলে মনে হবে; একটি জান্নাত লাভে বঞ্চিত হওয়া, অপরটি দোযখে নিক্ষিত হওয়া। জান্নাতের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা যেমন অসম্ভব হবে, তেমনি দোযখের কষ্টও সহ্য করা সম্ভব হবে না। নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া সকল অবস্থায়ই বেদনাদায়ক— তদুপরি দোযখে চিরস্থায়ী থাকতে হবে, এটা যে কত মর্মান্তিক, কতখানি বেদনাদায়ক আর কত বড় বিপদ তা বোঝা উচিত সকলের। জাহান্নামে যদি চিরকাল না থাকতে হতো তথাপি তা অনেকটা সহজ হতো। কিন্তু ব্যাপার তো তা নয়; বরং তার উল্টো। এমন কোন্ মানুষ আছে, যে সেই মহাবিপদ, মহাকষ্ট, মহাযন্ত্রণাকে সহ্য করতে পারবে? আর এমন কোন্ ব্যক্তিই বা আছে, যে সেই সুখ-সৌভাগ্য (বেহেশত) থেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে ?

হযরত ঈসা (আ) বলেছেনঃ চিরকাল থাকতে হবে এ বিষয়টিই ভীত লোকদের নিকট দুঃসাধ্য মনে হয়।

হযরত হাসান (র)-এর সামনে একদিন আলোচনাক্রমে বলা হলো যে, দোযখ থেকে সর্বশেষ যে ব্যক্তি বের হবে, তার নাম হবে হানাদ। এক হাজার বছর আযাব ভোগের পর তার নিষ্কৃতি হবে। সে চীৎকার করে বলতে থাকবে ঃ ইয়া হান্নান, ইয়া মান্নান।

একথা শুনে হযরত হাসান (র) কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন যে, আহা ! আমিই যদি 'হানাদ' হতাম। তাঁর এ কথা শুনে উপস্থিত সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলো। তখন হযরত হাসান (র) বলতে লাগলেনঃ আফসোস তোমাদের জন্য, দোযখ থেকে কোন দিন বের হওয়ার যোগ্যও হবে না।

উপরে বর্ণিত সবকিছু মাত্র একটি মূল বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত দান করে, যার কল্পনা করতেই মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে আসে—চেহারা পাণ্ডুর হয়ে যায়, পাকস্থলী অকেজো হয়ে যায় (অর্থাৎ খানা পিনায় রুচি থাকে না), অন্তর জার জার হয়ে যায়— চোখ ফেটে বেরিয়ে আসে অশ্রুর বন্যা। সে বিষয়টি হলো, মারিফাত ও ঈমান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এটা এমন একটি মকাম, যে মকামে পৌঁছে ভীত ব্যক্তিদেরও ভয় বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ক্রন্দনকারীদের চোখ বেয়ে শুধু অশ্রু প্রবাহিত হয়।

কেউ কেউ বলেছেনঃ দুঃখ তিন প্রকার (তিনটি আশঙ্কায়)। প্রথমত, নেক আমল যদি কখনো কবূল না হয়। দ্বিতীয়ত, গুনাহর জন্য দুঃখ; যদি তা কখনো মাফ না হয়, এ আশঙ্কায়। তৃতীয়ত, ঈমান ও মারিফত বিলুপ্তির আশঙ্কার দুঃখ।

বিশেষ বুযুর্গ ব্যক্তিদের মতে, প্রকৃতপক্ষে দুঃখ একটিই (অর্থাৎ একটি আশঙ্কাই দুঃখের কারণ) আর তা হলো ঈমান ও মারিফাত 'সলব' (কেড়ে নেয়া) বা তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কার দুঃখ। অবশিষ্ট সকল দুঃখ এর সামনে তুচ্ছই বলতে হবে। কারণ অবশিষ্টগুলোর তদারক সম্ভব।

ইউসুফ ইবনে আসবাতের নিকট আমি জানতে পেরেছি—তিনি বলেছেনঃ আমি একদিন সুফিয়ান সওরীর নিকট গিয়েছিলাম। লক্ষ্য করলাম যে, সুফিয়ান সওরী সারা রাত ধরে ক্রন্দন করছেন। ভাবলাম, গুনাহ্র ভয়ে হয়তো তিনি অমন কাঁদছেন। তখন আমিও তওবা করার জন্য অগ্রসর হলাম। তিনি বললেনঃ আরে! আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে গুনাহ মাফ করিয়ে নেয়া তো অতি সহজ ব্যাপার। আমি তো ভয় করছি যে,(আল্লাহ্ না করুক) ইসলামের সৌভাগ্য থেকে যদি বঞ্চিত করা হয় !

পরিশেষে আমি করুণাময় আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সেই মুসীবতে (ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়া) নিপতিত না করেন, বরং তিনি যেন তাঁর অশেষ করুণা ও রহমতের দ্বারা আমাদের জীবনের ইতি করেন ইসলামেরই উপর। নিশ্চয়ই তিনি পরম করুণাময়।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 'খওফ' এবং 'রিযা'র রাস্তার মধ্যে কোন্ রাস্তা অবলম্বন করা উচিত? তাহলে মনে রাখবে যে, উভয়টির সমন্বয়ে গঠিত রাস্তাই সঠিক রাস্তা—সেটাই অনুসরণীয়। কারণ যে ব্যক্তির উপর 'রিযা'র আধিক্য হবে, সে আশাতেই নিমজ্জিত থাকবে। ফলে শেষ পর্যন্ত তার আশাটুকু থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তির উপর 'খওফ'-এর আধিক্য হবে, সে খারিজী হয়ে পড়বে।

মোটকথা, 'খওফ' এবং 'রিযা' উভয়টিই রক্ষা করতে হবে— কোনটাই হারানো চলবে না।

কারণ প্রকৃত ভীতি যেমন প্রকৃত আশা হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, তেমনি প্রকৃত আশাও প্রকৃত ভীতিশূন্য হওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে.

পূর্ণতার আশা কেবল ভীতদের মধ্যেই পাওয়া যায়। নির্ভর ও নিরাপত্তা বোধের সাথে আশার কোন সম্পর্ক নেই। তেমনি আশার মধ্যেই ভীতিও পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে নিরাশার কোন স্থান নেই।

এখন হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা উত্তম অথবা কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, শক্তিধর ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির জন্য 'খওফ'ই উত্তম এবং তাকেই তার অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। আর যদি দুর্বল ও কমজোর হয়, তবে 'রিযা'ই রক্ষা করা উত্তম এবং তার পক্ষে 'রিযা'কেই অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। বিশেষ করে আখিরাতের ক্ষেত্রে 'রিযা'কেই অগ্রাধিকার দেয়া দরকার।

এ জন্যই বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ যাদের অন্তর আমার ভয়-ভীতিতে চিড় চিড় হয়ে গেছে, আমি তাদের নিকটবর্তী। এমন অবস্থায় পৌঁছলে 'রিযা'কে অবলম্বন করাই উত্তম এবং শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থ্যবান থাকার সময় যে 'খওফ' অবলম্বন করেছিল, সে পরিপ্রেক্ষিতে এ সময় 'রিযা'ই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। এ জন্যই বলা হয়েছেঃ

لاَ تَخَافُوْا وَلاَتَحْزَنُوْا -

ভয় করো না এবং নেতিয়ে পড়ো না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, বহু হাদীসে আল্লাহ্‌র প্রতি উত্তম ধারণা রাখার তাকিদ করা হয়েছে। তাহলে এ হাদীসগুলোর উপর কিভাবে আমল করা যাবে? এর জবাবে এতটুকুই মনে রাখা যথেষ্ট যে, আল্লাহ্‌র নাফরমানীসহ অন্যান্য প্রকারের সকল গুনাহ্ থেকে দূরে থাকা এবং তার আযাব ও শাস্তির জন্য 'খওফ' রাখা এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত ও খিদমতের চেষ্টা করা 'উত্তম ধারণা'র বিপরীত নয় এবং প্রকৃতপক্ষে এগুলোই উত্তম ধারণা থেকে উদ্ভূত।

আরও একটি সূক্ষ্ম বিষয় এখানে আলোচনা করা দরকার। বিষয়টি হলো 'রিযা ও তামান্না' সম্পর্কিত । সাধারণ লোক এ ব্যাপারে প্রায়ই ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছে।

'রিযা ও তামান্না'— এ দুটোর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। 'রিযা' হলো কোন বিষয়ের ভিত্তির উপর আশা করা– আর ভিত্তিহীন আশাকে বলা হয় 'তামান্না'। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন এক ব্যক্তি জমি চাষ করলো, উত্তম বীজ বপন করলো এবং আবাদের যাবতীয় করণীয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার পর বললো যে, এ ক্ষেত থেকে আমি এক শ' মণ শস্য আশা করছি। এই শ্রেণীর আশাকে বলা হবে 'রিযা'।

অপরপক্ষে কোন এক ব্যক্তি চাষাবাদ কিছুই করলো না— বসে বসে দিন কাটালো— সারা বছর আলস্য ও নির্ভাবনায় কাটিয়ে দিল। অতঃপর ফসল কাটার 'মওসুম' এলে বললো ঃ আমার শ' মণ ধান হতো। এ শ্রেণীর আশাকে বলা হবে ভিত্তিহীন আশা অর্থাৎ 'তামান্না'।

ঠিক একই অবস্থা এ ক্ষেত্রেও অর্থাৎ যে বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও খিদমতের ব্যাপারে খুব চেষ্টা-যত্ন করে এবং গুনাহ্ ও নাফরমানী থেকে বিরত থাকে—অতঃপর যদি সে বলে যে, 'আমি আশা করছি যে, আল্লাহ্ পাক আমার এ সামান্য ইবাদত কবূল করুন এবং এতে যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তাও তোমার অপার করুণায় শুধরে লও। আর, আমার এ সামান্য ইবাদতের জন্য আমাকে অধিক দান করো— আমার সকল প্রকার বিচ্যুতি ক্ষমা করো।' এই সঙ্গে যদি সে (বান্দা) আল্লাহ্র প্রতি উত্তম ধার্রণাও রক্ষা করে, তবে একেই বলা হবে 'রিযা'।

আর যদি কেউ আলস্যকেই সম্বল করে, নেক কাজ পরিত্যাগ করে সঙ্গে সঙ্গে গুনাহ্তে লিপ্ত হয়, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্টি, প্রতিদানের ওয়াদা ও শাস্তির হুমকি কোন কিছুকেই পরোয়া না করে অথচ বলতে থাকে যে, আল্লাহ্র নিকট থেকে আমার জান্নাত লাভের এবং দোযখ থেকে পরিত্রাণের আশা আছে, তাহলে এটা নিছক 'আশা' ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এ ধরনের আশাকে 'উত্তম ধারণা' বা 'রিযা' আখ্যা দেয়া সরাসরি ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

কোন এক কবি বলেছেন ঃ

'ওহে বেআমল নাজাতের আশাবাদীর দল,

শুকনোয় কি নৌকা চলতে পারে ?

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنِ

اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ الْاَمَانِىَ -

প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসের রক্ষণাবেক্ষণে এবং মৃত্যুর পরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে। আর প্রকৃত মূর্খ সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত কর, অথচ আল্লাহ্‌র প্রতি আশা নিয়ে বসে থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ মন্তব্যের মধ্যে উপরিউক্ত বিষয়টির সকল দিক সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে হাসান বসরী (র)-ও বলেছেন : এমন একদল মানুষ আছে, মাগফিরাত ও ক্ষমার আশা যাদের ধোঁকায় নিপতিত করেছে। শেষ পর্যন্ত এরা খালি হাতে বিদায় গ্রহণ করে। যাবার বেলায় একটি নেকীও তাদের সাথে থাকে না।

সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যদি কেউ বলে যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি 'উত্তম ধারণা' পোষণ করছি, তাহলে আমি বলবো, তিনি মিথ্যা দাবি করছেন। কারণ যদি আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর 'উত্তম ধারণাই' থাকতো তাহলে অবশ্যই তিনি নেক আমল করতেন। আল্লাহ্ পাক তো পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করছেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا -

যে ব্যক্তি আপন পরওয়ারদিগারের সাক্ষাৎ-প্রত্যাশী তার কর্তব্য নেক আমল করা। (সূরা কাহফ : ১১০)

অধিকন্তু :

وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدَاكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ

আর তোমাদের সে ধারণা, যা তোমরা তোমাদের পরওয়ারদিগারের প্রতি রেখেছিলে এবং অতঃপর তোমরা পতিত হয়েছিলে বিনষ্টে।

(সূরা হা-মীম : ২৩)

জাফর সাবগী থেকে বর্ণিত আছে—তিনি বলেন যে, আমি আবুল মায়সারাল আবিদকে দেখেছি, পরিশ্রম (ইবাদতে) কষ্ট-ক্লেশের জন্য তাঁর মেরুদণ্ড বের হয়ে পড়েছিল। আমি বললাম ঃ 'আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি রহম করুন ! আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তো অতি প্রশস্ত।' একথা শুনে তিনি বিরক্ত হলেন এবং বললেন ঃ আমার মধ্যে এমন কি লক্ষ্য করেছেন, যা নিরাশার ইঙ্গিত বহন করে ? এ কথা তো অতি সত্য যে ঃ

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ -

আল্লাহ্র রহমত তো নেককারদের নিকটবর্তী। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৬)

জাফর বলেছেন ঃ তাঁর এ কথা শুনে আমার ক্রন্দন এসে গেলো।

মোটকথা, সমস্ত নবী-রাসূল, আবদাল ও আউলিয়াগণও নেক কাজ করা ও গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য এমনভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও স্থির নিশ্চিত হতে পারে নি। তাহলে তুমি কি বলবে যে, তাঁরা আল্লাহ্ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করতেন না ? এমন তো কিছুতেই হতে পারে না। বরং এ বুযুর্গ ব্যক্তিগণ তো আল্লাহ্র সীমাহীন রহমতের বিষয় অধিক জানতেন এবং তাঁর অশেষ করুণা ও সীমাহীন অনুগ্রহ সম্পর্কে তাঁদের উত্তম ধারণাই ছিল।

কিন্তু তাঁরা মনে করতেন, চেষ্টা-যত্ন ব্যতীত ভিত্তিহীন আশা আশাই মাত্র এবং তা অহমিকা ব্যতীত আর কিছু নয়।

যা হোক, এ সূক্ষ্ম বিষয়টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে থাকতে হবে পূর্ণ সচেতন।

বাকি আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তওফীক দানকারী।

'খওফ' ও 'রিযা' সৃষ্টির উপায়

মোটকথা, তুমি যখন একদিকে যেমন আল্লাহ্ পাকের সীমাহীন ও ব্যাপাক রহমতের কথা চিন্তা করবে, সে রহমত যে সর্বত্রই বর্ষিত হচ্ছে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, স্মরণ করবে যে, তুমি মানবশ্রেষ্ঠ ও নবীকুল শিরোমণির উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ্ পাকের অনন্ত করুণা, অসীম অনুগ্রহ ও অপরিসীম মমতা ও সাহায্য-সহানুভূতি বিনা সুপারিশেই এবং বিনা মাধ্যমেই তোমার উপর

অবিরত ঝরে পড়ছে এবং রহমত ও করুণা সম্পর্কে তাঁর এ নীতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না কখনো— অপর পক্ষে, তেমনি লক্ষ্য করবে আল্লাহ পাকের অসীম প্রতাপ, অখণ্ড প্রতিপত্তি, অবিমিশ্র শৌর্য-বীর্য ও অকল্পনীয় প্রভাবের প্রতি তাঁর শাস্তির ভয়াবহতা স্মরণ করবে, যে শাস্তির ভার আসমান-যমীনও সহ্য করতে পারে না। আর চিন্তা করবে নিজের অসংখ্য ভুল-ত্রুটি, আলস্য-ঔদ্ধত্য ও নাফরমানীর ফলে সৃষ্ট অসংখ্য গুনাহ্ আর তোমার সেই সূক্ষ্ম অপকর্ম যা সকলের দৃষ্টি এড়ালেও সেই মহাপ্রভুর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। মনে রাখবে যে, তিনি সকল লুক্কায়িত বা গোপনীয় তথ্যের খবর রাখেন, আর স্মরণ করবে আল্লাহ্র সেসব পুরস্কার ও নিয়ামতদানের কথা, যার সুখ-স্বাদের কথা মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। অপরপক্ষে তেমনি উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে তাঁর কঠিন বিচার, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি— যে শাস্তি সহ্য করার কথা কল্পনা করা যায় না। এ সকল বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে, স্মরণ রাখবে এবং চিন্তা করবে। তাহলে একবার আল্লাহ্র রহমত ও করুণার কথায় হৃদয় হবে করুণাসিক্ত, তেমনি আবার তাঁর কঠিন বিচার ও শাস্তি এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে নিজের নফসের কাঠিন্য ও ঔদ্ধত্যের তুলনা করে সঠিকভাবে নিজের পরিণতি উপলব্ধি করলে হৃদয় হবে ভীত-সন্ত্রস্ত। কেবল তখনই হাসিল হবে একসাথে 'খওফ ও রিযা'। এ অবস্থায় পৌঁছে তুমি সোজা-সরল ও সঠিক পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে এবং ধ্বংসকারী হতাশাপূর্ণ ও নির্ভয়ের হাত থেকে পাবে রক্ষা। অবস্থাটি এই হবে যে, তুমি যখন ন্যায় ও সামঞ্জস্যের এমন একটি শরবতের পেয়ালা পান করছো, যার ফলে এরপর 'রিযা'র হিমশীতল স্পর্শ যেমন তোমাকে অবশ করতে পারবে না, তেমনি নিছক 'খওফ'-এর উত্তাপও তোমার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং এখন তোমার মনযিলে মকসূদের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোন বাধা থাকবে না। নফসের অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, সে এখন নেক কাজের জন্য প্রস্তুত, আলস্য ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করে সে এখন আল্লাহ্র ইবাদত ও খিদমতের জন্য সম্পূর্ণ আগ্রহী। শুধু তাই নয়, গুনাহ্ ও অসম্মানের বস্তু পরিহার— এমনকি, একদম পরিত্যাগ করতেও সে (নফস) আর দ্বিধা করবে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, নওফুল ইকালী যখন জান্নাতের কথা স্মরণ করতেন, তখন তাঁর নেক কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতো— আর যখন দোযখের কথা স্মরণ করতেন, তখন তাঁর আলস্য দূর হয়ে যেতো।

এভাবেই তুমি সেই আবেদীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হবে। হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে রেখেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَ غَبًا وَّ رَهْبًا وَّ كَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ –

এরা নেক কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয়। আর আশা ও আশঙ্কাসহ আমাদের ইবাদত করে। আর তারা আমাদের সামনে দাঁড়ায় বিনীত ভাব নিয়ে।

এবার তুমি মনে করতে পারো, আল্লাহ্‌র মর্জি এবং উত্তম তওফীকের মাধ্যমে তুমি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছো এ মহা সঙ্কটপূর্ণ ঘাঁটিটিও আর লাভ করেছো দুনিয়ার সম্ভাব্য সকল পবিত্রতা ও স্বাদ। আর, সংগ্রহ করে ফেলেছো আখিরাতের জন্য পুরস্কার ও প্রতিদানের এক মহাভান্ডার।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই উত্তম তওফীক দান করুন। তিনিই পরম দয়ালু ও অতি করুণাময়।

নবম সোপান

মন্দের প্রভাব-মুক্তি

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে উত্তম তওফীক দান করুন। দীনের রাস্তা যখন পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, তখন আমাদের চেষ্টা-যত্নকে মন্দ বস্তু থেকে আলাদা রাখা এবং ধ্বংসকারী জিনিস থেকে তাকে রক্ষা অবশ্য কর্তব্য। ইখলাসকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন এবং উদ্দেশ্যকে উত্তমভাবে স্মরণ রাখার মাধ্যমেই তা সম্ভব। তাছাড়া অন্য দুটো কারণেও মন্দ প্রভাব থেকে আমলকে রক্ষা করা অপরিহার্য। প্রথম কারণ হলো, আমল বা চেষ্টা-যত্ন যেন ফলপ্রসূ হয় অর্থাৎ তা যেন আল্লাহ্র দরবারে যথারীতি গ্রহণের উপযুক্ত হয় এবং তার পরিবর্তে সওয়াব দান করা হয়। নতুবা যদি সওয়াবের অংশ-বিশেষ বা সমগ্র সওয়াবই বন্টিত হয়ে যায়, তবে তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

أَنَا أَغْنَى الأَغْنِيَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً فَأَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِيْ

فَنَصِيْبِيْ لَهُ فَإِنِّيْ لاَأَقْبَلُ إِلاَّ مَا كَانَ لِيْ خَالِصًا–

আমি মানুষের শিরক থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী (অর্থাৎ আদৌ মুখাপেক্ষী নই)। যে ব্যক্তি তার আমলে আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে শরীক করে, তখন তার অর্থ এই হয় যে, সে যেন আমার অংশটিও অপরকে দিয়ে দিল। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্যই আমল কবূল করি না, যতক্ষণ না তা আমার জন্য খালিস হয়।

বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন মানুষ যখন আল্লাহ্ পাকের নিকট তাদের আমলের সওয়াবের জন্য দরখাস্ত পেশ করবে, তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন ঃ তোমার জন্য কি মজলিসে স্থান করা হয়নি (অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শনের জন্য

মানুষকে সরিয়ে স্থান করে দেয়া), দুনিয়ায় কি তুমি নেতৃত্ব পাওনি, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে তোমাকে কি সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়নি কিংবা এই আমলের জন্য কি তোমার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়নি ?

মোটকথা, আমলে এমন সব মন্দ জিনিস জড়িত থাকতে পারে, যা শুধু ক্ষতিকারকই নয়—আমলকে ধ্বংস করে দিতেও সক্ষম। যেমন রিয়া।

রিয়ার অনিষ্টকারিতা

রিয়ার জন্য দুই প্রকারের অসম্মান ও বিপদে পতিত হতে হয়। প্রথমত সমস্ত ফেরেশতার সামনে নিজের ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। কারণ ফেরেশতাগণ বান্দার আমল (রিয়া-মিশ্রিত) সানন্দ-চিত্তে আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দান করেন ঃ এই আমল 'সিজ্জীনবাসীদের' স্থানে রেখে দাও। কারণ, এই আমল আমার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। ফলে সে সময় ফেরেশতাদের সামনে একদিকে যেমন বান্দার, অপরদিকে তেমনি সেই আমলের তুচ্ছতা ও হীনতা প্রতিপন্ন হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, আর একবার অসম্মানী ঘটবে কিয়ামতের দিন প্রকাশ্যভাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُرَائِىْ يُنَادِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَرْبَعَةِ اَسْمَاءٍ يَاكَافِرُ يَافَاجِرُ

يَا غَادِرُ يَاخَاسِرُ ضَلَّ سَعْيُكَ وَبَطَلَ اَجْرُكَ فَلاَ خَلاَقَ لَكَ الْيَوْمَ

اِلْتَمِسِ الاَجْرَ مِمَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ يَا مُخَادِعُ -

রিয়াকারীকে কিয়ামতের দিন চারটি নামে ডাকা হবে— ওহে কাফির! ওহে ফাজির ! ওহে দাগাবাজ! এবং ওহে অনিষ্টকারী! তোর চেষ্টা-যত্ন বরবাদ হয়ে গেছে— তোর সওয়াব বাজেয়াফত হয়ে গেছে। আর তোর জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। হে ধোঁকাবাজ, তুই যার জন্য আমল করতিস, তার কাছ থেকেই সওয়াব হাসিল কর।

আরও বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে ঃ তারা আজ কোথায়, যারা মানুষের ইবাদত করতো? দন্ডায়মান হও এবং যাদের জন্য আমল করতে, তাদের নিকট থেকে সওয়াব গ্রহণ করো। আল্লাহ্ পাক তো সামান্যতম ভেজাল আমলও কবূল করেন না।

আরও একটি বিপদ এই যে, রিয়ার কারণে জান্নাতের আশা তিরোহিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

إِنَّ الْجَنَّةَ تَكَلَّمَتْ وَقَالَتْ اَنَا حَرَامٌ عَلٰى كُلِّ بَخِيْلٍ وَ مُرَاءٍ -

সেদিন জান্নাত বলে উঠবে এবং ঘোষণা করবে যে, কৃপণ ও রিয়াকারীর জন্য আমার (জান্নাত) মধ্যে প্রবেশ হারাম (নিষিদ্ধ)।

এ হাদীসের দুই রকম অর্থ হতে প্যারে। প্রথমত, কৃপণের অর্থ যে ব্যক্তি নেক কাজে কৃপণতা করে এবং কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করে। আর রিয়ার অর্থ হলো খুব জঘন্য ধরনের রিয়াকারী। প্রকৃতপক্ষে এ রিয়াকে মুনাফিকী বলা যায়-- যারা নিজের ঈমান ও তওহীদ বিশ্বাসকে প্রদর্শনীমূলক করে তোলে।

আর একটি অর্থ এই হতে পারে যে, কৃপণতা ও রিয়া থেকে যে বিরত না থাকে এবং নফসকে তা থেকে কিছুতেই রক্ষা করে না। শেষোক্ত অর্থে দু'টি ভয়াবহ বিপদ রয়েছে। কারণ এ জিনিসটি মানুষকে কুফরীর পর্যায়ে পতিত করে। ফলে জান্নাতের আশা তিরোহিত হয়ে যায়। অপরদিকে ঈমান 'সলব' (কেড়ে নেয়া) হয়ে যায়। মানুষ দোযখের যোগ্য হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বিপদ হলো দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়া। কারণ আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফরমান এভাবে উদ্ধৃত করেন ঃ

اَوَّلَ مَنْ يُدْ عٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ قَدْ جَمِعَ الْقُرْاٰنُ وَرَجُلٌ قَدْ

قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ كَثِيْرُ الْمَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْقَارِيِّ

اَلَمْ اُعَلِّمَكَ كَمَا اَنْزَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِىْ رَسُوْلِىْ فَيَقُوْلُ بَلٰى يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ

مَاذَا عَمِلْتَ فِيْمَا عَلِمْتَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ قُمْتُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَ اَطْرَافَ النَّهَارِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ كَذِبْتَ وَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ كَذِبْتَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُّقَالَ فُلاَنٌ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ذٰلِكَ - وَ يُؤْتٰى لِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُوْلُ لَهُ ٠

اَلَمْ اَوْسَعُ عَلَيْكَ حَتّٰى لاَاَذَعَكَ تُحْتَاجُ اِلٰى اَحَدٍ فَيَقُوْلُ بَلٰى يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ فِيْمَا عَمِلْتَ فِيْمَا اٰتَيْتُكَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ اَصِلُ الرَّحْمِ اَتَصَدَّقُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ كَذِبْتَ و تَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ كَذِبْتَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُّقَالَ اَنَّكَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيْلَ وَ يُؤْتٰى بِالَّذِىْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ مَا فَعَلْتَ فَيَقُوْلُ اُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِكَ حَتّٰى قُتِلْتُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ كَذِبْتَ وَ تَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ كَذِبْتَ وَ يَقُوْلُ اللّٰهُ بَلْ اَرَدْتَ اَنْ يُّقَالَ فُلاَنٌ جَرِىٌّ وَ شُجَاعٌ فَقَدْ قِيْلَ ذَالِكَ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِيَدِهٖ عَلٰى رُكْبَتِىَّ وَ قَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اُولٰئِكَ اَوَّلُ خَلَقَ اللّٰهُ يُسْعَرُ بِهِمْ نَارَ جَهَنَّمَ -

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে আহবান করা হবে— কুরআনের কারী, আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ এবং মালদার। কারীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্

পাক বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে সেই কালাম শিখাইনি, যে কালাম আমি আমার রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছিলাম? সে জবাব দেবেঃ হে আমার পরওয়ারদিগার, অবশ্যই তা করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক বলবেনঃ আচ্ছা, তুমি যা জানতে তা তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ? কারী জবাব দেবেনঃ আমি দিন রাত কুরআন পাঠ করতাম। কিন্তু আল্লাহ্ পাক, এমনকি ফেরেশতাগণও বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছো। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলবেনঃ তোমার তো আকাঙক্ষা ছিল যে, লোকে তোমাকে কারী বলুক— তা তুমি যা আকাঙক্ষা করতে, তা তো পেয়েছোই অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমাকে কারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতঃপর মালদারকে ডাকা হবে। তাকে বলা হবেঃ আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদের অধিকারী করিনি? সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার? নিশ্চয়ই তুমি তা করেছিলে। তখন ইরশাদ হবেঃ আচ্ছা যে মাল তোমাকে দিয়েছিলাম, তা তুমি কি কাজে লাগিয়েছ? সে জবাব দেবে- আমি তা দিয়ে সিলায়ে রেহমী (আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজনের প্রতি হক আদায়) ও সদকা-খয়রাত করেছি। কিন্তু আল্লাহ্ পাক এবং ফেরেশতাগণ তার এ কথা অস্বীকার করবেন। আল্লাহ্ পাক বলবেনঃ তোমার তো উদ্দেশ্য ছিল লোকে তোমাকে দানশীল বলুক। দুনিয়ায় তোমাকে তা বলা হয়েছে।

এরপর ডাকা হবে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীকে। আল্লাহ্ পাক তাকে বলবেনঃ দুনিয়ায় গিয়ে তুমি কি কাজ করেছ? সে জবাব দেবেঃ তুমি তোমার রাস্তায় জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলে। আমি সে জন্য তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি—এমনকি শেষ পর্যন্ত নিজে শহীদ হয়ে গেছি। তার এই কথাও আল্লাহ্ পাক এবং ফেরেশতাগণ অস্বীকার করবেন। আল্লাহ্ পাক বলবেনঃ তোমার উদ্দেশ্য তো ছিল দুনিয়াবাসী তোমাকে সাহসী এবং বীর বলুক— তোমার সে উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ডান হাত আমার হাঁটুর উপর রাখলেন এবং বললেনঃ ওহে আবূ হুরায়রা! এদের দ্বারাই প্রথম দোযখের অগ্নি প্রজ্বলিত হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে— তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে,

اِنَّ النَّارَ وَ اَهْلُهَا يَعْجُوْنَ مِنْ اَهْلِ الرِّيَا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه

صلعم وَكَيْفَ تُعْجُ النَّارُ - قَالَ مِنْ حَرِّ النَّارَ الَّتِىْ يُعَذَّبُوْنَ بِهَا-

দোযখ এবং দোযখিগণ রিয়াকারীদের দেখে ভয় পেয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোযখ কিভাবে ভয় পাবে ? তিনি বললেন ঃ তাদের (রিয়াকারীদের) যে অগ্নির দ্বারা আযাব হবে, সেই অগ্নির তেজ দেখে।

মোটকথা, বুদ্ধিমান ও বিবেকবানদের সচেতন হওয়ার জন্য উপরে বর্ণিত বিষয়ই যথেষ্ট।

ইখলাস ও রিয়ার প্রকৃত পরিচয়

আমাদের উলামাদের মতে, ইখলাস দুই প্রকার। প্রথমত, আমলের ইখলাস; দ্বিতীয়ত, সওয়াব তলবের ইখলাস। আমলের ইখলাস হলো ঃ আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের সংকল্প, আল্লাহ্র নির্দেশকেই প্রাধান্য দেয়া এবং সঠিক ইতেকাদই কেবল এই ইখলাস সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই প্রকার ইখলাসের বিপরীত হলো 'নিফাক' বা মুনাফিকী—আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের সাথে নিজের সংশ্রব বা সম্পর্ক রাখা বা স্থাপন করা।

আমাদের শায়খ (র) বলেছেনঃ 'নিফাক' সেই ভ্রান্ত ইতেকাদকে বলা হয়, আল্লাহ্ সম্পর্কে মুনাফিক যে ধারণা পোষণ করে।

সওয়াব তলবের ইখলাস হলো— নেক কাজের জন্য আখিরাতে উপকৃত হওয়ার আকাঙক্ষা পোষণ করা।

আমাদের শায়খ (র) বলেনঃ নেক কাজের জন্য আখিরাতে উপকৃত হওয়ার আকাঙক্ষা পোষণ করা এমনভাবে যে, তাতে যেন এমন কোন আপত্তি সৃষ্টি হতে না পারে, যা তার উত্তম ও নেক হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা বা জটিলতা সৃষ্টি করে। ঠিক এমনিভাবে উপকৃত হওয়ার আশাও থাকতে হবে।

হযরত ঈসা (আ)-কে তাঁর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ আমলের ইখলাস কি? তিনি জবাবে বলেনঃ কেবল আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যেই আমল করা এবং তাতে অন্য কারো সামান্য প্রশংসাও সংশ্লিষ্ট বা শামিল না করা।

হযরত ঈসা (আ)-র এই মন্তব্যের মধ্যে রিয়া পরিত্যাগ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জুনায়িদ (র) বলেছেনঃ আমলকে সকল প্রকার পংকিলতা থেকে পাক-সাফ করার নামই ইখলাস।

ফোযায়েল (র) বলেছেনঃ মুরাকিবাকে স্থিতিশীল করে তোলা এবং অন্য সবকিছুকে বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দেয়ার নামই ইখলাস।

ইখলাসের মোটামুটি বর্ণনা দেয়া হলো। ইখলাস সম্পর্কে বহুজনের বহু রকমের বক্তব্য রয়েছে। তবে প্রকৃত পরিচয় সুস্পষ্ট হওয়ার পর আর অধিক বক্তব্য উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করছি না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যখন ইখলাসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

تَقُوْلُ رَبِّىَ اللّٰهُ ثُمَّ تَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ –

বলো যে, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুই তোমার 'রব'। অতঃপর তিনি যা নির্দেশ করেন, তাকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করো।

অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তি ও কামনার অনুসরণ করো না। নিজের 'রব' ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি আল্লাহ্র ইবাদতের দৃঢ়তা অবলম্বন করো।

এসব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছুর সম্পর্ক ত্যাগের নামই প্রকৃত ইখলাস। আর ইখলাসের বিপরীত হলো 'রিয়া' এবং দেখিয়ে আমল করা এবং আখিরাতের উপর পার্থিব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া।

রিয়াও দুই প্রকার। একটি হলো অবিমিশ্র রিয়া আর একটি হলো মিশ্র রিয়া। কেবল দুনিয়ায় লাভবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখাকে বলে অবিমিশ্র রিয়া। আর দুনিয়ায় লাভবান হওয়া এবং পরকালে উপকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখার নাম হলো মিশ্র রিয়া।

আমলে ইখলাসের উপকার এই যে, প্রতিটি ক্রিয়া ও প্রতিটি আমলই আল্লাহ্র সান্নিধ্য-সেতু এবং সওয়াবে পরিণত হয়। আর সওয়াব তলবে ইখলাসের প্রভাবে আমল মকবুল হয় এবং তা সওয়াব ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়।

'নিফাক' আমলকে ধ্বংস করে এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্য-সেতু থেকে তা ইবাদতকারীকে বহিষ্কার করে দেয়।

কোন কোন আলিম বলেন ঃ আরিফদের তরফ থেকে অবিমিশ্র রিয়া প্রকাশ পেতে পারে না, যদিও তার দ্বারা অর্ধেক সওয়াব বাতিল হয়ে যায়। আবার কোন কোন আলিম বলেন ঃ আরিফদের তরফ থেকেও অবিমিশ্র রিয়া প্রকাশ পেতে পারে। আর তাহলে সেই কারণে দ্বিগুণ সওয়াবের অর্ধাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি মিশ্র রিয়া প্রকাশ পায় তবে সওয়াবের এক-চতুর্থাংশ সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের শায়খ (র)-এর মতে, সঠিক কথা হলো ঃ আখিরাতের বিষয় স্মরণের সময় আরিফের তরফ থেকে সাধারণভাবে অবিমিশ্র রিয়া প্রকাশ না পাওয়াই স্বাভাবিক। তবে হাঁ, ভুলবশত তা প্রকাশ পেতেও পারে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, রিয়া যে প্রকারের হোক না কেন, এর প্রভাব আমল কবূলের ব্যাপারে এবং সওয়াবের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া রিয়ার প্রভাবে সওয়াবও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়— অর্ধেক হ্রাস পাক আর এক-চতুর্থাংশই হ্রাস পাক।

মনে রাখতে হবে যে, কোন কোন আলিমের মতে, আমল তিন প্রকার।

প্রথমত, যে আমলে উভয় প্রকারের ইখলাস একত্রিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই জাহিরী ইবাদত।

দ্বিতীয়ত, যে আমলে ইখলাসের কোন প্রকারই পাওয়া যায় না। এটা হলো বাতিনী ইবাদত।

তৃতীয়ত, যে আমলে সওয়াব তলবের ইখলাস পাওয়া যায় ঠিক কিন্তু আমলের ইখলাস তাতে আদৌ থাকে না। এটা হলো সেই সব নফল বিষয়, যাতে কেবল সওয়াবেরই আশা করা হয়। আমাদের শায়খ (র) বলেছেনঃ যেসব ইবাদত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্যও করা সম্ভব, তাতে আমলের ইখলাস প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং বাতিনী ইবাদতেও বহু ক্ষেত্রে আমলের ইখলাস পাওয়া যায়।

মাশায়েখগণ বলেছেনঃ সওয়াব তলবের ইখলাস বাতিনী ইবাদত হতে পারে না। কারণ, এই ইবাদতে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জাগ্রত থাকতে পারে না এবং এই ধরনের ইবাদত রিয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত এবং পবিত্র। সেই জন্য

এই ধরনের ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াব তলবের জন্য ইখলাসের প্রয়োজন করে না।

আমাদের শায়খ (র) বলেন ঃ কোন বান্দা যখন বাতিনী ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য হাসিল করতে থাকেন, তখন যদি তিনি তার দ্বারা (বাতিনী ইবাদতে) দুনিয়ায় লাভবান হওয়ার কামনা করেন, তাহলে সেটাও রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হবে।

বাতিনী ইবাদতেও উভয় প্রকার ইখলাস পাওয়া অসম্ভব নয়। তেমনি নফল আমলের শুরুতেও উভয় প্রকার ইখলাসই পাওয়া যেতে পারে। অপরপক্ষে, আখিরাতের পাথেয় হিসেবে যেসব নফল কাজ করা হয়, তাতে আখিরাত তলবের ইখলাস পাওয়া যেতে পারে। তবে আমলের ইখলাস এতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ, সান্নিধ্য-সেতু হওয়ার যোগ্যতাই তাতে নেই, বরং এ হলো সান্নিধ্য-সেতুর উপকরণ মাত্র।

যা হোক, এতক্ষণ কেবল ইখলাসের শ্রেণী ও পরিচয় সম্পর্কেই আলোচনা করা হলো। এখন ইখলাস প্রয়োগ বা আমলে ইখলাস কার্যকরীকরণ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

এ ব্যাপারে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, আমলের ইখলাস কর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। কোন অবস্থাতেই তা পৃথক হয় না। তবে সওয়াব তলবের ইখলাস অনেক সময় বিলম্বে হতে পারে। কোন কোন আলিমের মতে, আমল থেকে অব্যাহতি লাভের পর এই ইখলাস জাগ্রত হয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমলের সমাপ্তি রিয়া অথবা ইখলাস — কোনটার উপর হবে ? এই ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই যা হবার, তা হবেই। এরপরে তার তদারক সত্যিই কঠিন।

আমাদের উলামায়ে কিরাম ব্যতীত মাশায়েখে কিরামের মতে, যতক্ষণ রিয়ার দ্বারা লক্ষ্যবস্তু হাসিল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে ইখলাস সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু যখন রিয়ার দ্বারা লক্ষ্যবস্তু হাসিল হয়ে যায়, তখন আর তাতে ইখলাস সৃষ্টির অবকাশ থাকে না।

আবার কোন কোন আলিমের মতে, ফরয আমলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইখলাস কায়েম করা যেতে পারে। নফল প্রভৃতিতে তেমন কোন সুযোগ বিদ্যমান থাকে না। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ফরয আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বান্দার

উপর আরোপ করেছেন। সুতরাং তাতে ফযীলত এবং আসানীও রেখেছেন। অপরপক্ষে, নফল স্বয়ং বান্দা নিজের উপর নিজে আরোপ করে। সুতরাং এটার দাবি কষ্টের পরেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এখানে একটি বিশেষ উপকৃত হওয়ার বিষয় রয়েছে। তা এই যে, যদি কোন ব্যক্তির তরফ থেকে রিয়া প্রকাশ পায় অথবা আমলে ইখলাস বিলোপ হয়ে যায়, তাহলে উপরিউক্ত বিষয়সমূহের যে কোন একটির দ্বারা তার প্রতিকার এবং তদারক করা সম্ভব। উপরিউক্ত বিভিন্ন মত উল্লেখের উদ্দেশ্য আমলকারীদের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা। কারণ, একটিতে যদি নিজের রোগের প্রতিকার না পাওয়া যায়, তাহলে তিনি অপরটি অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। ইনশাআল্লাহ্ যে কোন একটি মতের দ্বারা হয়ত যে কোন একজনের উপকার হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, প্রত্যেক আমলই আলাদা-আলাদা ইখলাসের মুখাপেক্ষী কি না?

এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন আলিমের মতে, প্রত্যেক আমলের জন্যই আলাদা আলাদা ইখলাসের প্রয়োজন। কিন্তু অপর একদল আলিম বলেন ঃ সমস্ত ইবাদতের জন্য একটি ইখলাসই যথেষ্ট হতে পারে। তাছাড়া, আরকান-সম্পন্ন আমল যেমন নামায, ওযু প্রভৃতি, এগুলিতে একটি ইখলাসই যথেষ্ট। কারণ, একটি অপরটির শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে এগুলো একই হুকুমের আওতায় পড়ে।

আচ্ছা, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় নেক-আমলের জন্য কেবল আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে উপকৃত হওয়ার আশা রাখে এবং মানুষের প্রশংসা ও তাদের নিকট থেকে কোন উপকারের আশা না রাখে এবং তাতে মানুষকে দেখবার উদ্দেশ্যও না থাকে— তাহলে তাও কি রিয়া হবে? এ অবস্থায়ও তা অবিমিশ্র রিয়া হবে। কারণ, উলামায়ে কিরাম বলেছেন ঃ রিয়া প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল, আকাঙক্ষা বা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং পার্থিব লাভ যদি নেক আমলের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হয়, তাহলে এটাও রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার আশা রাখা হোক অথবা মানুষের প্রতিই আশা রাখা হোক।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهٖ وَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ -

যে ব্যক্তি আখিরাতের আবাদের (সুখ-সমৃদ্ধি) কামনা করে, আমরা তার আবাদে অধিক দান করবো। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার আবাদের প্রত্যাশী তাকে আমরা তার কিছু (অবশ্য যদি ইচ্ছা করি, নতুবা নয়) দুনিয়া দান করবো। কিন্তু আখিরাতে তার ভাগ্যে কিছুই থাকবে না। (সূরা শূরা ঃ ২০)

এ ব্যাপারে 'রিয়া' নামে কোন কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না। কারণ, রিয়া শব্দটি رويت শব্দ থেকে নির্গত।

আলোচ্য ভ্রান্ত কামনাটির নাম এ জন্য 'রিয়া' রাখা হয়েছে যে, মানুষের জন্য মানুষকে দেখাবার উদ্দেশ্যেই এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যে মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত এবং ইবাদতে ইলাহীতে সময় অতিবাহিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যদি দুনিয়ার কিছু প্রার্থনা করা হয়, তবে তাও কি রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হবে ? এ ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় এই যে, বেশী অর্থ-সম্পদ ও ঐশ্বর্য-বৈভব থাকার উপর সে পবিত্রতা (মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়া) অর্জন নির্ভর করে না। বরং এটি অর্জিত হয় 'অল্পে তুষ্টি' এবং আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতা থেকে।

তবে ইবাদতে ইলাহীর জন্য প্রস্তুত হতে যা দরকার শুধু ততটুকু মাত্রই যদি প্রার্থনা করা হয়, তাহলে তা 'রিয়া' হবে না। কারণ, এটি আখিরাতের বিষয় এবং তার পাথেয় সংশ্লিষ্ট। যদি নেক কাজের ব্যাপারে এ ধরনের নিয়ত করা হয়, তাহলেও তা রিয়া হবে না। কারণ এ নিয়তের ফলে বিষয়টি আখিরাতের আমলের হুকুমের আওতায় পড়ে যায়। তাছাড়া 'ইরাদায়ে খায়ের' অর্থাৎ নেক ইচ্ছায় 'রিয়া' হয় না। তেমনি তুমি যদি তার দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব এবং উলামা ও মাশায়েখের ভালবাসার ইরাদা করো এবং এ ইরাদার উদ্দেশ্য যদি হয় আহলে হকের সমর্থন (সত্যতা প্রতিপন্ন বা মর্যাদা বৃদ্ধি) এবং বিদ'আতীদের অস্বীকার (হীনতা ও তুচ্ছতা প্রতিপন্ন) অথবা মানুষের মধ্যে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি আর নিজের নফসের মর্যাদা ও বুযুর্গী বৃদ্ধি এবং দুনিয়া লক্ষ্যবস্তু না

হয়— তাহলে এর সকল ইচ্ছাই প্রশংসনীয় এবং সৎ হওয়ার ফলে এগুলোতে 'রিয়া'র সামান্যতমও অবকাশ নেই। কারণ, এর সবগুলো ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের লক্ষ্যাভিসারী। আমি কোন কোন মাশায়েখের নিকট আলিমদের একটি রীতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। রীতিটি হলো এই যে, আর্থিক সঙ্কট ও অভাব-অনটনের সময় তাঁরা সূরায়ে ওয়াকিয়া পাঠ করে থাকেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তাঁদের এরূপ করার মকসুদ কি এ নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের আর্থিক সঙ্কট দূর করুন এবং সংসার জীবনে যথারীতি স্বাচ্ছন্দ্য দান করুন ? এ যদি মকসুদ হয়, তাহলে দুনিয়ার উপকারার্থে আখিরাতের আমলে ইরাদা রাখাই তো প্রতিপন্ন হয়। অথচ তা তো দূরস্ত (জায়েয) নয়।

মাশায়েখগণ জবাবে বলেছেনঃ উক্ত বুযুর্গদের সূরায়ে ওয়াকিয়া তিলাওয়াতের মকসুদ এই-ই থাকে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁদের যেন নিতান্ত প্রয়োজনীয় রুযী দান করেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে প্রস্তুতি ও ইলমের চর্চা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হন। এসব প্রকৃতপক্ষে নেক ইরাদা। এ ইরাদার লক্ষ্যবস্তু দুনিয়া নয়।

অপরপক্ষে, অভাব-অনটন ও আর্থিক সঙ্কটের সময় উপরিউক্ত সূরা তিলাওয়াতকে প্রাধান্য দান এবং সেটাকেই ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণের যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর বাণী পাওয়া যায়।

এসব বিষয়কে সামনে রেখেই উলামায়ে কিরাম উক্ত সূরা পাঠ করাকে রীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নতুবা আর্থিক সঙ্কটের ব্যাপারে তাঁরা সামান্যই বিচলিত। বরং, পার্থিব কোন সঙ্কটে পড়লে যেমন এঁরা আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা-গীতি করেন, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ও তেমনি হামদ ও সানা পাঠ করেন। শুধু তাই নয়, পার্থিব সঙ্কটকে এঁরা গনিমত (সৌভাগ্য) মনে করেন। নিজেকে সঙ্কটে পতিত দেখে এবং আল্লাহ্র তরফ থেকে তা হওয়ার জন্য তাঁরা সঙ্কটকেই মহান নিয়ামত মনে করেন। অপর পক্ষে, যখন স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয়, সাধারণত এটাকে নিয়ামত ও ইহসান মনে করলেও তাঁরা (নেক আলিমগণ) এতে বিচলিত হয়ে পড়েন এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বুঝি বা পরীক্ষা ও বিপদ অবতীর্ণ হচ্ছে। কারণ, তাঁদের উদ্দেশ্য হলো মুসাফিরের ন্যায় জীবন কাটানো

এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপোসে দিন গুযরান। তাঁরা নিজের মুখেই স্বীকার করেন আমাদের সর্বমোট সম্পদ বা সম্বল হলো উপোস থাকা। প্রকৃতপক্ষে তাসাউফের নীতিই এই। আমার এবং আমার বুযুর্গদেরও মতবাদ এটাই। কারণ, এ নীতিই সলফে সালেহীন থেকে চলে আসছে। পরবর্তী সময়ে কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিষয়টি আমি এ জন্য বর্ণনা করলাম যে, যারা এ পথের পথিক নয় এবং এ জ্ঞানের সাথে যাদের সম্পর্ক নেই, তারা যাতে তাঁদের (নেকপন্থী আলিমদের) কার্যকলাপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা করে না বসতে পারে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উলামায়ে কিরাম, জাহেদীন (সংসার বর্জনকারী) এবং সংযম ও ধৈর্য অবলম্বনকারী লোকদের পক্ষে এটা কি সমীচীন ? তাহলে মনে রাখবে যে, এটা সুন্নত-সংশ্লিষ্ট। আর তাছাড়া, তাতেও উদ্দেশ্য (লক্ষ্যবস্তু) হলো 'কানায়াত' (আত্ম-তুষ্টি যা আছে, তাতেই তুষ্টি অথবা কিছু না থাকলেও অন্তরে স্বাবলম্বিতা থেকে সৃষ্ট তুষ্টি) অর্জন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য প্রস্তুত থাকা। মন্দ জিনিস, কামনা-লালসা, অভাব-অনটন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের নিকট এটা আত্মসমর্পণ নয়। বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ আমলের পরে (সূরায়ে ওয়াকিয়া পাঠ) অন্তরতুষ্টি অর্জন এবং কুকুর-সদৃশ ক্ষুধা নিস্তেজ, দুর্বল এবং হতাশ হয়ে পড়বে। এটি পরীক্ষিত সত্য। যাঁরা পরীক্ষা করেছেন, তাঁরা এর সত্যতার প্রমাণ পেয়েছেন। বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে অনুধাবন এবং আমল করা উচিত।

দ্বিতীয় মন্দ বস্তু

দ্বিতীয় মন্দ বিষয় হলো আত্মগর্ব বা অহঙ্কার এবং আত্মগৌরব। এ বিষয়টি থেকেও দুইটি কারণে নিজেকে রক্ষা করা কর্তব্য। প্রথমত, এটি আল্লাহ্‌র সাহায্য ও তওফীকের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে, অচিরেই ধ্বংসের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় ধ্বংসকারী। প্রথমত কার্পণ্য, যে কার্পণ্য নীতি অনুসরণ করা হয়; দ্বিতীয়ত প্রবৃত্তির এমন কামনা, যেটাকে অনুগমন করা হয়; এবং তৃতীয়ত নিজের ব্যাপারে আত্মগর্ব বা আত্মগৌরব করা।

দ্বিতীয় কারণ— আত্মগর্ব, অহঙ্কার ও আত্মগৌরব থেকে নিজেকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, এর দ্বারা নেক-আমল ধ্বংস এবং বরবাদ

হয়ে যায়। এ জন্যই হযরত ঈসা (আ) তাঁর খাদিমদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ বাতাস বহু প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছে— আর বহু আবিদকেই (ইবাদতগুযারের) আত্মগৌরব ও আত্মগর্ব ধ্বংস করে দিয়েছে।

আসল উদ্দেশ্য হলো ইবাদত। কিন্তু এ স্বভাবগুলো মানুষকে এমনই নীচাশয় বানিয়ে দেয়, তার মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলজনক কোন কাজ করার যোগ্যতাই বিদ্যমান থাকে না। আর যদিও যা কিছুটা করতে সক্ষম হয় তাও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারে না। ফলে শেষ পর্যন্ত তার কাছে নেক আমল অবশিষ্টই থাকে না।

এ জন্য এ ধরনের ধ্বংসকারী বিষয় থেকে নিজেকে সর্বযত্নে দূরে রাখা কর্তব্য। আল্লাহ্ পাকের নিকট সকলেরই এ প্রার্থনা করা উচিত যে, তিনি যেন এরূপ ধ্বংসকারী বিষয় থেকে রক্ষা করেন।

আত্মগর্বের অর্থ ও তার প্রতিক্রিয়া

আত্মগর্বের প্রকৃত কথা হলো নিজের নেক আমলকে বড় মনে করা। উলামায়ে কিরাম আত্মগর্বের বিস্তারিত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন জিনিস, কোন মখলূক অথবা কোন নফসের সাথে জাত্যাভিমান ও বুযুর্গী জাহির করাকে আত্মগর্ব বলা হয়। তবে আত্মগর্ব অনেক সময় উক্ত তিনটি জিনিসের কোন একটির (জিনিস, মখলূক, নফস) সামনে জাহির হয়।। আবার কখনো দুটোর সামনে হয়। এক্ষেত্রে 'দ্বিগুণ' আত্মগর্ব প্রকাশিত হয়। তেমনি কোন একটির সামনে আত্মগর্ব প্রকাশ হলে তা একই আত্মগর্ব বলে প্রমাণিত হবে।

আত্মগর্বের বিপরীত বিষয় হলো বিনীত ভাব। অর্থাৎ এ কথা স্মরণ করা যে, এ কাজটি আল্লাহ্ প্রদত্ত তওফীকেই তো সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। আর তিনি এ কাজের মর্যাদা, সম্মান এবং সওয়াব— যা কিছু হয় দান করবেন। যেসব অবস্থায় আত্মগর্ব দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আছে সেসব ক্ষেত্রে এ বিনীত ভাবটি সৃষ্টি করা জরুরী, অন্যান্য ক্ষেত্রে মুস্তাহাব।

আত্মগর্বে নেক আমলে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বলেছেন ঃ আত্মগর্ব মানুষের আমলকে ধ্বংস করার জন্য প্রতীক্ষা করে।

যদি মানুষ মৃত্যুর আগে তওবা করে তাহলে অবশ্য সে নিরাপদ হয়ে যায়। নতুবা কেবল ধ্বংস এবং বরবাদী ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

মুহাম্মদ ইবনে সাবিরের মতও এই। তবে তিনি বলেন, আমল ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো আমলের সৌন্দর্য ও সৌকর্য বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। ফলে সে আমল সওয়াব বা কোন প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। অনেক আলিম বলেন ঃ আত্মগর্বের ফলে অতিরিক্ত লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। তবে এছাড়া অন্য আর কিছু ক্ষতি হয় না।

এখন যদি প্রশ্ন উঠে যে, আরেফীনের তরফ থেকে এ ধরনের বিষয় প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা কি করে করা যেতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের নেক আমলে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিয়েছেন? তাহলে এ আত্মগর্ব সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম ও উত্তম বিষয় মনে রাখা দরকার। বিষয়টি এই যে, মানুষের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী আত্মগর্ব তিন প্রকারঃ

প্রথমতঃ এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা সর্বাবস্থায়ই আত্মগর্বে নিমজ্জিত। এরা হলেন ঃ 'কাদরিয়া' এবং 'মুতাজিলা' সম্প্রদায়। এরা নিজেদের কর্মে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইহসান' স্বীকার করে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য, বিশেষ তওফীক এবং দয়া-করুণার কথাও স্বীকার করে না। সন্দেহই তাদের এ রোগের কারণ।

দ্বিতীয়তঃ আর এক শ্রেণীর লোক, যারা সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার ইহসান ও তওফীকের কথা স্বীকার করেন। এরাই হলেন সঠিকপন্থী। এঁদের থেকে কখনো আত্মগর্ব প্রকাশ হতে পারে না। এঁদের যে বিশেষ সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করা হয়েছে, তা-ই তাঁদের এ সঠিক পথে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

তৃতীয়তঃ আর এক শ্রেণীর লোক হলেন সাধারণ শ্রেণীর। আহলে সুন্নত সম্প্রদায়ও এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। সচেতন অবস্থায় এঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত তওফীকের কথা স্মরণ করে বিনীত থাকেন। আবার কখনো অসচেতন বা অসতর্কতার জন্য এঁরা আত্মগর্বে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন।

এখন প্রশ্ন হলো রিয়া এবং আত্মগর্ব ব্যতীত আরও কোন কিছু কি আছে, যা আমলকে দুষ্ট করে দিতে পারে ? তাহলে মনে রাখো, রিয়া এবং আত্মগর্ব ছাড়া আমলে জটিলতা ও দুষ্টতা সৃষ্টি করার মতো আরও বিষয় আছে। তবে এ দুটো

বিষয় থেকেই অধিকাংশ খারাবি সৃষ্টি হয় বলে এ দুটোর আলোচনাকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হলো।

কোন কোন মাশায়েখ বলেছেন ঃ নিজের আমলকে দশটি জিনিস থেকে রক্ষা করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এই দশটি জিনিস হলোঃ (১) নিফাক (কলুষতা)), (২) রিয়া (প্রদর্শনমূলক মনোভাব), (৩) ইখতিলাত (মিশ্রিতকরণ,), (৪) ইহসান (কৃতার্থ করার ভাব), (৫) আযা (অবহেলা), (৬) নাদামত (অনুশোচনা), (৭) উজব (আত্মগর্ব), (৮) হাসরত (দুঃখ) (৯) যিল্লত (অপমান), (১০) মানুষের গালি-গালাজের ভয়।

আমাদের শায়েখগণ অতঃপর উপরিউক্ত দশটি জিনিসের বিপরীত দশটি জিনিস সৃষ্টির কথা বলেছেন।

নিফাক বা কলুষতার বিপরীত হলো ইখলাস সৃষ্টি করা। রিয়ার বিপরীত হলো সওয়াব তলবে ইখলাস সৃষ্টি করা। ইখতিলাত বা মিশ্রিতকরণের বিপরীত হলো আমলে মনোযোগিতা অর্জন। কৃতার্থ করার ভাবের বিপরীত হলো আল্লাহ্ পাকের উপর নিজের আমলকে অর্পণ। আযার (অবহেলা) বিপরীত হলো আমলের হিফাযত করা। নাদামতে বা অনুশোচনার বিপরীত হলো নফসে দৃঢ়তা ও ধৈর্যের ভাব সৃষ্টি। আত্মগর্বের বিপরীত হলো বিনীত ভাব; আর দুঃখের (হাসরত) বিপরীত হলো নেক আমলকে সৌভাগ্য মনে করা। যিল্লতের বিপরীত হলো তওফীকের মহত্ত্ব ও বড়ত্ব স্মরণ করা। তেমনি মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার বিপরীত হলো আল্লাহ্র জন্য ভয় রক্ষা করা।

নিফাক সরাসরি আমল ধ্বংস করে দেয়। রিয়া আমলকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। আযা বা অবহেলা অনেক সময় সদকার মৌলিকত্বই বিনষ্ট করে দেয়। অনেক মাশায়েখ বলেন ঃ এর দ্বারা কেবল সওয়াবটুকু বিনষ্ট হয়। অনেক আলিমের মতে, অনুশোচনার দ্বারা আমল বরবাদ হয়ে যায়। আত্মগর্বে আমলের অতিরিক্ত ও বহু সওয়াবের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তেমনি দুঃখ, গঞ্জনার ভয় প্রভৃতি আমলে দুর্বলতা আনয়ন করে এবং সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়।

রিয়া ও আত্মগর্বের অনিষ্টকারিতা

এরপর তোমাকে এই ভয়াবহ সঙ্কট-প্রান্তরও অতিক্রম করতে হবে, যে প্রান্তরের প্রতিটি দিকে, প্রতিটি পদক্ষেপেই বিপদ ও পেরেশানী বিদ্যমান, যেখানে

প্রতিটি মুহূর্তেই কঠোর সতর্কতা অবলম্বন নিতান্তই জরুরী। কারণ, নেক কাজ দ্বারা উপকার লাভকারী ব্যক্তিরা অপর সকল ঘাঁটি অতিক্রম করে আসে এবং সকল প্রকার দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করে— এমনকি যাদের জন্য সসম্মানে ইবাদতের মকামও হাসিল হয়ে যায়, তাদের নিকটও এ ঘাঁটি ব্যতীত অন্য কোনটির জন্যই আশঙ্কা নেই। কারণ, এ ঘাঁটিতে এমন সব পেরেশানী রয়েছে, যার ফলে উক্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান এবং এমন সব জিনিস বিদ্যমান, যেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে ইবাদতের উপর আপদ প্রকাশিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এমনকি, এর ফলে ইবাদতে ফাসাদ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে, তাছাড়া এ ঘাঁটির ভয়াবহতা শুধু ব্যাপকই নয়, এতে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা সব সময়ই। এ ঘাঁটি অতিক্রমের পক্ষে বাধা সৃষ্টিকারী জিনিস হলো দু'টি। তা হলো উপরে বর্ণিত রিয়া এবং আত্মগর্ব। সুতরাং এ দুটি বিষয় সম্পর্কে আলাদা আলাদা এমন কতকগুলো নীতি বর্ণনা করা প্রয়োজন, যার দ্বারা তা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং বিপদ ক্লেশ খানিকটা লাঘব করা সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে প্রথমেই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর ইরশাদের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا -

আল্লাহ্ তিনিই, যিনি সাত আসমান তৈরি করেছেন। তেমনি যমীনও। আর উভয় স্থানে (আসমান এবং যমীনে) আহ্‌কাম নাযিল হতে থাকে। আর এটা এ জন্য বাতলিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ্ পাক সব কিছুর উপরই সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ্ পাক সকল জিনিসকে তাঁর নিজের জ্ঞানের আওতায় রেখেছেন। (সূরা তালাকঃ ১২)

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যেন বলছেন ঃ আসমান যমীন এবং তার মধ্যে যত অপূর্ব ও বৈচিত্র্যময় জিনিস আছে, সবকিছুই আমি সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের চিন্তা করার জন্যও আমি এটাকেই যথেষ্ট মনে করেছি যে, তোমরা সম্যক উপলব্ধি করো যে, আমিই সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানী। আর তুমি মাত্র

দু'রাকাত নামায আদায় করো। তাতেও কত প্রকার ভুল-ত্রুটি এবং কত খুঁত যে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। তা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টি, আমার অবহিতি, আমার প্রশংসা এবং আমার গ্রহণকে তুমি যথেষ্ট মনে করতে পারছো না। মানুষের দ্বারা তোমার ইবাদতের প্রশংসা না করানো পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে পারছো না।

তাহলে তোমরাই বলো,.এটা কি কৃতজ্ঞতা, না এটা বুদ্ধিমানের কথা ? কোন বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে কি এ ধরনের কার্যকলাপ পছন্দনীয় হতে পারে? আরে বেওকুফ! খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করে দেখো।

দ্বিতীয় নীতি

কোন এক ব্যক্তির নিকট একটি উত্তম মোতি আছে এবং সে ইচ্ছা করলে সেই মোতি একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করতে পারে। কিন্তু যদি সে তা না করে সেই মোতি এক পয়সায় বিক্রি করে, তাহলে এটা কি একটি মস্তবড় ক্ষতি নয়? তাছাড়া, তার এ কার্য কি একথারই সাক্ষ্য বহন করবে না যে, লোকটি জ্ঞান, সাহস ও বুদ্ধির দিক দিয়ে একেবারেই নীচু পর্যায়ের? তেমনি তার বিবেচনা শক্তি আছে বলেও কেউ স্বীকার করতে চাইবে না। সুতরাং মানুষের কোন আমলের জন্য অপর লোকের নিকট থেকে যে প্রশংসা পাওয়া যায়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও প্রশংসার সামনে তার মূল্য একটি লাকড়ির মত— এমনকি এক পয়সার চেয়েও কম। আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সওয়াবের মূল্য লাখ স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও বেশি—এমনকি, দুনিয়া ও আসমানের সবকিছুর মূল্যও তার কাছে তুচ্ছ। সুতরাং, নিজেকে সেই তুচ্ছ জিনিসের সাথে জড়িত করে এমন মহামূল্য সওগাত থেকে বঞ্চিত করা কি বিরাট ক্ষতি এবং আহাম্মকীর কাজ নয়?

যদি দুনিয়া লাভের হীন ইচ্ছা ব্যতীত কোন গত্যন্তর না-ই থাকে তাহলেও আখিরাতের ইরাদাই করো। কারণ, তাতে দুনিয়া এমনিতেই এসে যাবে। বরঞ্চ আল্লাহ্র নিকটই তা প্রার্থনা করো। তিনি হয়তো উভয় জীবনেই সবকিছু তোমাকে দান করবেন। কারণ, তিনিই উভয় জাহানের মালিক। চিন্তা করে দেখো— আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে, (তার একথা অবশ্যই জানা থাকা উচিত যে) আল্লাহ্ পাকের নিকট দুনিয়া এবং আখিরাত— উভয়টির প্রতিদানই রয়েছে।

হুযূর (সা) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُعْطِى الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ وَلَايُعْطِى الْاٰخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا -

আল্লাহ পাক আখিরাতের আমলের প্রতিদানে দুনিয়া দান করেন, কিন্তু দুনিয়ার (দুনিয়ামুখী) কাজের জন্য আখিরাত দান করেন না।

সুতরাং তুমি তোমার নিয়তকে যদি খালিস করতে পারো এবং আখিরাতের উদ্দেশ্যে চেষ্টা-যত্নে সর্বশক্তি নিয়োগ করো, তাহলে কেবল তুমি আখিরাতই পাবে না, স্বাভাবিকভাবে দুনিয়াও তোমার পদচুম্বন করতে বাধ্য।

অপরপক্ষে তুমি যদি কেবল দুনিয়াই কামনা করো তাহলে আখিরাত তো শুরুতেই হাতছাড়া হয়ে যাবে, দুনিয়াও পাবে কিনা সন্দেহ। কারণ, অনেক সময়ই দুনিয়া হাসিল হয় না আর হলেও তা স্থায়ী হয় না।

তৃতীয় নীতি

মনে রাখবে, যার জন্য তুমি কাজ করছো, যার শুভ দৃষ্টির কামনায় তুমি পরিশ্রমে ব্যাপৃত, সেই মখলূক (মানুষ) যদি জানতে পারে বা টের পায় যে, তুমি তাদের শুভ দৃষ্টির কামনায়ই অনুরূপ করছো, তাহলে তারাও অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধ প্রকাশ করবে। এমনকি তোমাকে অসম্মান এবং নিম্নে পতিত করবে। সুতরাং কোন জ্ঞানবান এবং বিবেকবান ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করতে পারে ? কোন জ্ঞানবান এবং বিবেকবান ব্যক্তি কি সেই ব্যক্তির জন্য কোন কাজ করতে রাযী হবে, যে ব্যক্তি তার জন্য কাজ করা হচ্ছে বলে জানলে পুরস্কার না দিয়ে বরং অসন্তুষ্ট হয় এবং অসম্মান করে ?

সুতরাং রে হতভাগ্য ! সেই মহাপ্রভুর জন্য আমল করো, যিনি একথা জানতে পারবেন যে, তুমি তাঁরই উদ্দেশ্যে আমল করেছো, তাঁরই জন্য সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছো, তাঁরই সন্তুষ্টি তোমার লক্ষ্যবস্তু—তাহলে তিনি

তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং তোমাকে এতখানি দান করবেন যে, তুমি শুধু যা চাও তাই পাবে না, তোমার ধারণার বাইরেও পাবে — তুমি হবে আনন্দিত। শুধু তাই নয়, তিনি তোমাকে সকল চিন্তা এবং সকল প্রকারের মুখাপেক্ষিতা থেকেও করবেন মুক্ত ও স্বাধীন। সুতরাং এটাই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো।

চতুর্থ নীতি

কোন ব্যক্তি এমন একটি কাজ করার যোগ্যতা রাখে, যে কাজ দ্বারা সে দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ্র নিকট থেকে পুরস্কার পেতে পারে। কিন্তু তা না করে যদি সে সেই কাজ দ্বারা কোন এক নীচাশয় ও হীন মনোবৃত্তির মানুষের খুশি তালাশ করে, তবে তাকে বেওকুফ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কারণ, তার এই কার্যের দ্বারা সে যে একজন বুদ্ধিহীন, বিবেকহীন এবং অজ্ঞ মানুষ, তাই ঠিকমতো প্রমাণ করবে। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তির নিকট কৈফিয়তও তলব করা যেতে পারে, যেখানে বাদশাহ্র সন্তুষ্টি ও শুভ দৃষ্টি লাভ করা যায়, সেখানে তার এই নীচাশয় চামারের সন্তুষ্টির চেষ্টা কেন?

আর তাছাড়া বাদশাহ্র অসন্তুষ্টির ভয়ে সেই নীচাশয় চামারও যদি সেই ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তবে তো তার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। এমন হওয়া স্বাভাবিকও বটে।

রিয়াকারের বেলায়ও হুবহু একই অবস্থা ঘটে থাকে। সুতরাং মখলূকের (মানুষ) ন্যায় হীন, তুচ্ছ ও নীচাশয়ের সন্তুষ্টির চেষ্টা করার কি দরকার, যেখানে রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা তোমার আছে ? রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির পরে আর কি কোন কিছুর প্রয়োজন থাকতে পারে ?

অধিকন্তু, যদি সাহস অত্যন্ত ক্ষীণ হয় অর্থাৎ যদি তুমি দুর্বল মনোবৃত্তি সম্পন্ন হও এবং সর্বাবস্থায়ই যদি মানুষকে সন্তুষ্ট করার প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে চায়, তাহলে তোমাকে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। পদ্ধতিটি এই যে, প্রথমে নিজেকে খালিস করো এবং তোমার সমস্ত প্রচেষ্টা ও সকল চেষ্টা-যত্ন করো আল্লাহ্মুখী। তাহলে তিনি সকল অন্তঃকরণকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করে দেবেন, মানুষকে তোমার চারধারে জমা করে দেবেন এবং মানুষের হৃদয়ে ভরে দেবেন তোমার প্রতি ভালবাসা। কারণ, সকল অন্তঃকরণ ও সকল

মন তাঁরই কুদরতের আওতাধীন। এই পদ্ধতিতে তোমার এমন জিনিসই অর্জিত হবে, যা তোমার চেষ্টায় কখনো সম্ভব হতো না। অপরপক্ষে, তুমি যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেবল মখলূকের (মানুষের) সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করো, তাহলে তিনি সকল অন্তঃকরণকে (মানুষের) তোমার বিমুখী করে দেবেন, মানুষের মন তোমার প্রতি ঘৃণায় ভরিয়ে দেবেন— ফলে, সৃষ্টি হবে সমগ্র মখলূক ও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির এক নির্মম ইতিহাস। এটাকেই বলে প্রকৃত হতভাগ্য ও বঞ্চিত অবস্থা।

হযরত হাসান (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ কোন এক ব্যক্তি বলতো যে, আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আল্লাহ্‌র এত ইবাদত করবো যে, সর্বত্রই যেন আমার চর্চা শুরু হয়ে যায়।

বস্তুত, সেদিন থেকেই সে মসজিদে প্রথম আসতো এবং সকলের পরে যেতো। যত মানুষ মসজিদে আসতো, তারা সবাই তাকে নামাযে মশগুল পেতো। উপর্যুপরি রোযাও শুরু করে দিয়েছিল সে এবং যিকিরের মজলিসেও উপস্থিত হতো। ছ'মাস ধরে সে এরূপ করার পরে বিষয়টি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এরপর সে যখনই কোন জনসমাবেশের নিকট দিয়ে যেতো, তারাই তখন বলতো ঃ 'আল্লাহ্' এই রিয়াকারীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো— তাকে সঠিক পথ দেখাও।'

অতঃপর সে অনুশোচনায় বিদগ্ধ হতে লাগলো এবং নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললো ঃ আমি অনাবশ্যক রিয়া করছি কেন? এরপর সে বললো ঃ এখন থেকে যা আমল করবো, তা কেবল আল্লাহ্ পাকের জন্যই করবো।

যা হোক, সে পূর্বের আমলই ঠিক রাখলো। তাতে বেশি কিছুই করলো না, কেবল তার নিয়তটা নেক নিয়তে রূপান্তরিত হলো। এরপর সে যে জনসমাবেশের নিকট দিয়েই যেতো, তারাই বলতো ঃ আল্লাহ্ ! অমুক (সেই ব্যক্তি) ব্যক্তির প্রতি রহম করো। লোকটি এখন কল্যাণ ভিখারী হয়েছে।

অতঃপর হযরত হাসান (র) পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا–

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ্ পাক তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা মরিয়ম ঃ ৯৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভালোবাসবেন এবং মু'মিনদের অন্তরে তাদের প্রতি মহব্বত জন্মিয়ে দেবেন। কোন এক ব্যক্তি কত সুন্দর বলেছেন ঃ

হে প্রশংসা ও সওয়াবের প্রত্যাশী দল, যারা আমলের মর্যাদা চাও (তোমরা মনে রেখো যে) আল্লাহ্ তা'আলা রিয়াকারীকে অসম্মানে নিপতিত করেন এবং তার সকল প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম বরবাদ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাত প্রত্যাশী, সে যেন তাঁর (আল্লাহ্) জন্য ভয় রক্ষা করে; খালিস তাঁরই জন্য আমল করে। দোযখ ও বেহেশত তাঁরই হাতে। তাঁর মেহেরবানী আকৃষ্ট করতে পারলে অসংখ্য দানে পরিপূর্ণ হবে তোমার সবকিছু। মনে রেখো, মানুষের হাতে কিছুই নেই। তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নিছক অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি।

এখন আত্মগর্ব বা আত্মগৌরব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

প্রথমত, বান্দার আমল যখন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি, শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁর নিকট গ্রহণীয় হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, তখনই তার মর্যাদা হয় অপরিসীম ও মূল্য হয় অশেষ। নতুবা শ্রমিকদের দিকে চেয়ে দেখ, দুই দিরহামের জন্যই তো তারা সারাদিন কাজ করছে! তেমনি দুই মুঠো ভাতের জন্যই হয়তো একজন চৌকিদার সারা রাত ধরে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। মোটকথা, সকল পেশার লোকই রাত দিন কিছু টাকা-কড়ির জন্যই পরিশ্রম ও ক্লেশে পতিত থাকে।

সুতরাং, তোমার সকল কর্ম-প্রচেষ্টাকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত করার জন্য যদি তুমি একটি দিন রোযা রাখো এবং সে রোযাটি যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয় ও তাঁর নিকট গ্রহণীয় হওয়ার মতো হয়, তাহলে সেদিনের সে রোযাটির মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

স্থিতিশীল (ধৈর্যশীল) মনের অধিকারীদের জন্য বেহিসাব প্রতিদান মজুদ থাকবে। (সূরা যুমার ঃ ১০)

আর হাদীসে বর্ণিত আছে— আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّائِمِيْنَ مَالاعَيْنٌ رَأَتْ وَلاَاُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٌ -

আমি আমার রোযাদার বান্দাদের জন্য সেসব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কানও কখনো শোনেনি কিংবা মানুষ যা কখনো ধারণাও করতে পারে না।

এটা তোমার সেই দিনটিই, যে দিনের সারাক্ষণ কঠোর পরিশ্রম করে মিলতো মাত্র দু'দিরহাম। অথচ কেবল দুপুরের খাওয়াটাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিলম্বিত করার ফলেই তার দান এত বেড়ে গেছে। তেমনি তুমি এক রাত আল্লাহ্‌র ইবাদতে জাগরণ করো, আর সে জাগরণের উদ্দেশ্য যদি কেবল সেই মহাপ্রভুই হন, তাহলে সেই রাত জাগরণের যে মূল্য ও মর্যাদা হবে, তারও কোন সীমারেখা নেই।

আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলেন ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ - جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

কোন মানুষই জানে না, তাদের আমলের প্রতিদান হিসেবে গায়েবে তাদের জন্য কি কি নয়ন-জুড়ানোর সামানা মজুদ রয়েছে।

এটাও তোমার সেই রাত, যে রাতের সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে দু'মুঠো খাবার পেতে। কেবলমাত্র তোমার সেই মহান নিয়তের জন্য তারই দাম এত বেড়ে গেছে।

বরঞ্চ আল্লাহ্ পাকের জন্য সামান্য একটু সময় করেই নেও না কেন ? দু'রাকাত নামাযই আদায় করো, নতুবা অন্তত একবার নিঃশ্বাস ছাড়ার সময়ে একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলো। তারও সওয়াব অসংখ্য, তারও মূল্য অপরিসীম। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ -

যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করবে— সে পুরুষ হোক আর নারী হোক—যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে সে জান্নাতে দাখিল হবে। সেখানে তারা লাভ করবে বেহিসাব নিয়ামত। (সূরা মুমিন ঃ ৪০)

এটা হলো অসংখ্য শ্বাসের মধ্যে একটি শ্বাস মাত্র— যে শ্বাসের মূল্য তোমার নিকট এবং দুনিয়াবাসীদের নিকট কিছুই নয়।

সুতরাং কেন এমনভাবে অযথা সময় নষ্ট করছো ? কেন তোমার জীবনের এমন অমূল্য সময়কে বাজে কাজে লিপ্ত করে তার অপচয় ঘটাচ্ছ? আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও শুভ দৃষ্টি প্রত্যাশী হলেই তো তোমার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পল-অনুপল মর্যাদায় ভরপুর ও মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।

সুতরাং জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির জন্য তার আমলের তুচ্ছতা এবং তার মরতবার স্বল্পতা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকা অবশ্য কর্তব্য। আর মনে রাখা কর্তব্য যে, তার আমলের যতটুকু মূল্য বা মর্যাদা তা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ, করুণা এবং দয়ারই ফল। তাছাড়া, আরও একটি কথা মনে রাখবে। তা এই যে, নিজের কার্যকলাপে এমন কিছু যেন না ঘটে, যা আল্লাহ্ পাকের শুভ দৃষ্টি এবং মরযির খিলাফ প্রতিপন্ন হতে পারে। কারণ অনুরূপ হলে আমলের সমস্ত মূল্যই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফলে তার দাম সেই দুই দিরহাম, দু'মুঠো খাবার প্রতিপন্ন হবে বা তার চেয়েও কম দামে চলে গিয়ে হেয় ও তুচ্ছ হয়ে পড়বে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু আঙুরের খোসা অথবা ফুলের একটি তোড়া, যার দাম বাজারে বড়জোর এক বেলা আহার্যের সমান। কিন্তু এই খোসাগুলো বা ফুলের তোড়াটিই যদি কোন বাদশাহ্র নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করে আর বাদশাহ তা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিদানে তাকে এক হাজার দিরহাম দান করে, তাহলে বাদশাহ্র সন্তুষ্টি ও শুভ দৃষ্টিই এই তুচ্ছ জিনিসটির মূল্য কত বেশী করে দিল, তা একবার ভেবে দেখো। এখন সেই আঙুরের খোসাগুলো বা ফুলের তোড়াটির মূল্যই প্রকারান্তরে হাজার দিরহামে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বাদশাহ যদি সন্তুষ্ট না হন এবং তা গ্রহণ না করে ফেরত দেন, তবে তার দাম সেই পূর্ববৎ, এক বেলা আহার্যের সমান বা তার চেয়েও কম।

আমাদের অবস্থাও ঠিক একই রূপ। সুতরাং সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। সর্বদা নজর রাখবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, শুভ-দৃষ্টির প্রতি। প্রতিটি কার্যকে,

প্রতিটি পদক্ষেপকে সেসব বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত রাখতে হবে, যা আল্লাহ্র দরবারে অপছন্দনীয়।

দ্বিতীয় মূলনীতি

তোমার অবশ্যই জানা আছে যে, এই দুনিয়ার কোন বাদশাহ্ যখন কাউকে খাবার বা পান করার জন্য কিছু দান করে, তখন সেই ব্যক্তি রাতদিন বাদশাহ্র খিদমতের জন্য প্রস্তুত থাকে। তাতে অপমান ও নিজের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সে বাদশাহ্র কাছে কৃতার্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে— মোটকথা, সর্বদা এবং সব ব্যাপারেই সে খিদমতের জন্য সব সময় হাযির থাকবে। অনেক সময় সারা রাত ধরে বাদশাহ্র দরজা পাহারা দিতে হবে। কোন দুশমন এলে তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। ফলে, জীবনের আশংকা ব্যাপক— যে জীবনকে খানিকটা চাঙ্গা রাখার জন্য দু'মুঠো খাদ্য সংগ্রহ করা দরকার। অথচ জীবনের বদলা কিছুই হতে পারে না। মোটকথা, সামান্য উপকার গ্রহণের পরিবর্তে শত কষ্ট, ক্লেশ ও ক্ষতি এবং গভীর আশঙ্কাপূর্ণ অবস্থার মুকাবিলা করতে হবে। অথচ যে সামান্য উপকার গ্রহণ করা হয়েছে, তারও প্রকৃত মালিক আল্লাহ। যা কিছু তাকে বাদশাহ দিয়েছেন তাও আল্লাহ্র জিনিস। বাদশা বা অন্য কেউ মাধ্যম বা কারণ মাত্র। এর বেশী কিছু নয়। অথচ তোমার পরওয়ারদিগার অনস্তিত্ব থেকে তোমাকে অস্তিত্বে এনেছেন। অতি উত্তমভাবে তোমাকে প্রতিপালিত করেছেন। তোমার নফসের ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য নিয়ামতে ভরপুর করেছেন, ধর্মীয় জ্ঞান দান করে বা ধর্মের পথে চলবার পক্ষে তওফীক দিয়ে তোমাকে করেছেন সৌভাগ্যশালী। মোটকথা, তোমাকে তিনি যে কি দিয়েছেন, তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা তোমার জ্ঞান বা বিবেকের সাধ্যাতীত। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا۔

যদি তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামতের গণনা করতে শুরু করো, তাহলে গণনা করতে সক্ষম হবে না।

অথচ, তুমি দু'রাকাত নামায পড়ছো, তাও আবার ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা, তথাপি ভবিষ্যতে সওয়াবের আশা!

এতদসত্ত্বেও সেইজন্য বড়াই করা বা আত্মগর্ব প্রকাশ করা কোন জ্ঞানী ও বিবেকবান মানুষের পক্ষে সমীচীন কি না? কিছুতেই সমীচীন নয়। সুতরাং এদিকে সুষ্ঠুভাবে নজর রাখা উচিত।

তৃতীয় মূলনীতি

মনে করো এমন বাদশাহ্, যাঁর মর্যাদা ও শান-শওকত এমন যে, অন্য সব বাদশাহ, আমীর তাঁর খিদমতে হাযির থাকে, তাঁর খিদমত করাকেই তারা নিজেদের জন্য সৌভাগ্য মনে করে; বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বিজ্ঞানিগণ যাঁর খিদমতের জন্য সদা উন্মুখ, তাঁর শুভ দৃষ্টি, আকর্ষণ এবং সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সকলেই প্রতীক্ষমান—তাঁর চারদিকে বড় বড় নেতা ও আমীর চলেন। সেই বাদশাহ্ যদি কোন একজন সাধারণ দোকানদার বা অজ্ঞাত পল্লীর কোন এক সাধারণ লোককে দয়া করে কাছে ডাকেন এবং সমস্ত বাদশাহ, নেতা ও আমীর খিদমতের জন্য হাযির থাকা সত্ত্বেও বাদশাহ্ সেই ব্যক্তিকে কিছু দান করেন এবং তার ত্রুটিপূর্ণ খিদমতেই তার প্রতি শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহলে বলতেই হবে যে, এই ব্যক্তিকে খিদমত করার সুযোগ দেওয়াটা উক্ত বাদশাহ্র কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অথচ সেই পল্লীবাসী বা দোকানদার যদি তার সেই তুচ্ছ, ত্রুটিপূর্ণ খিদমতের জন্যই বাদশাহ্কে কৃতার্থ করেছে বলে মনে করতে শুরু করে এবং তজ্জন্য আত্মগর্ব এবং বড়াই করা শুরু করে, তাহলে বলতে হবে যে, লোকটা এক নম্বরের বেওকুফ অথবা এক নম্বরের পাগল। লোকটির মাথায় কিছুই নেই।

যাহোক, এই উদাহরণটি গভীরভাবে অনুধাবন করার পর আমার আসল বক্তব্যের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো! আমাদের প্রকৃত মাবুদ এবং বাদশাহ্ সাত আসমান ও যমীন এবং এসবের মধ্যে যা কিছু আছে, সবাই যার গুণকীর্তন করে—এর মধ্যে এমন কিছুই নেই, যা সেই মহান প্রভুর মহিমা কীর্তন করে না; আর সেই মাবুদ যাঁর সামনে আসমান ও যমীনের সবকিছুই সিজদাবনত, যার খাস খাদিম হলো জিবরাঈল আমীন, মিকাঈল, ইসরাফীল, আযরাঈল (আ) এবং আরও অসংখ্য ফেরেশ্তা, যাদের হিসাব কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাক নিজেই জানেন— যদিও এরা অতি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র এবং মর্যাদাসম্পন্ন ইবাদতের অধিকারী।

এরপরে তাঁর দরবারে যাঁরা খাদিম, তাঁদের মধ্যে আদম (আ), নূহ্ (আ), ইবরাহীম (আ), মূসা (আ), ঈসা (আ) এবং মানবশ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (সা)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বাকি সব নবী ও রাসূলও এই দলেরই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ তাঁরাও সেই দরবারেরই খাদিম— যদিও উচ্চ মর্যাদা, সুন্দরতম প্রশংসা, মহামূল্য মকাম এবং সম্মানিত স্বভাব বৈশেষ্ট্যে তাঁরা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

এরপরে আছেন সেইসব উলামায়ে কিরাম, নেকপন্থী ইমাম, সাধক, সংসারত্যাগী ও সূক্ষ্মদর্শী মারিফতপন্থিগণ। এঁরা সবাই নিজেদের পবিত্র দেহমন, উচ্চমর্যাদা এবং নিজেদের সেই খাস ইবাদত, যা কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।— সেই সবকিছু নিয়ে সেই মহান প্রভুর খিদমতে হাযির।

এ দরবারে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট নওকর ও গোলাম হলো দুনিয়ার বাদশাহ্ এবং জালিমগণ। এরা অপমান, অসম্মান এবং দীনতাকে সামনে নিয়ে সিজদাবনত হয়ে আছে। অপমানে এরা নিজের মুখমণ্ডলে মাটি মেখে রেখেছে। আর তাঁর সামনে করছে কেবল আহাজারী এবং পদাহত ও বিকৃত অবস্থায় নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রার্থনা এবং সেই মহান প্রভুর জন্য ইবাদত আর নিজেদের জন্য ধিক্কার ও লাঞ্ছনার স্বীকৃতি দিচ্ছে। এভাবে ধিকৃত অবস্থায়ও সেই মহান প্রভুর দরবারে সিজদাবনত হয়ে পড়ে আছে। যখন রাব্বুল আলামীন তাদের প্রতি দৃষ্টি তুলে চান, তখন তিনি তাঁর কৃপার গুণে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন।

অথচ সেই প্রভুই তাঁর সেই প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য সত্ত্বেও তোমার এ দীনতা ও নীচাশয়তাসহই তোমাকে তাঁর দরবারে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছেন। অথচ তোমার অবস্থা এই যে, তোমার শহরের কোন একটি বড়লোকের সাথে একটু দেখা করতে চাইলে সে হয়তো সময় দেয় না। তোমার গোত্রাধিপতির সাথে কথা বলতে চাও, হয়তো সে কথাই বলবে না। আর যদি কোন বাদশাহকে ভূলুণ্ঠিত সিজদাও করো, তথাপি সে ফিরে তাকায় না। কিন্তু কি আশ্চর্য— সেই মহা রাজাধিরাজ তোমাকে তাঁর ইবাদত, গুণকীর্তন ও প্রশংসা গীতি গেয়ে তাঁকে ডাকার অনুমতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং তুমি যখন প্রার্থনা করো, কিছু চাও এবং কোন কিছুর আশা নিয়ে দরখাস্ত পেশ করো, তিনি তার পুরোপুরিই দিয়ে থাকেন। এরপর তোমার ত্রুটিপূর্ণ দু'রাকাত নামাযে তিনি খুশী হন। শুধু খুশী না, তাতে এত সওয়াবও দান করেন যে, কোন মানুষ তেমন সওয়াবের কল্পনাও করতে পারবে না।

এতসব সত্ত্বেও, তুমি তোমার সেই দু'রাকাত নামাযের জন্য আত্মগর্ব প্রকাশ করছো, বড়াই করছো। আল্লাহ্ তা'আলার এতসব দান, এত করুণা— তার প্রতি তোমার খেয়াল নেই।

আফসোস! মানুষ কত নীচাশয়, মানুষ কত অজ্ঞ। আল্লাহ্, তুমিই সাহায্যকারী, তুমিই এ অজ্ঞ ঔদ্ধত্যপূর্ণ নফ্সকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারো।

বান্দার হীনতা এবং আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ

অপর একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করো। মনে করো, কোন এক মস্তবড় বাদশাহ্ তার দেশের প্রজাদের উপঢৌকন পেশের অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর আমীর, দলাধিপতি, নেতা, বিজ্ঞ, বিত্তশালী ও সওদাগরগণ বিভিন্ন রকম দামী দামী অমূল্য রত্ন, মোতি ও মাণিক্য নিয়ে তাঁর সম্মুখে হাযির হয়েছেন। ইতিমধ্যে একজন ফল-বিক্রেতা বা কোন এক সাধারণ পল্লীবাসী হয়তো কিছু সামান্য আঙুর, যার দাম হয়তো চার আনার বেশী হবে না, নিয়ে হাযির হলো। বড় লোকদের সমস্ত দামী মালমাত্তা ও এই অজ্ঞাত ব্যক্তির আঙুর একই সাথে বাদশাহ্র সামনে হাযির করা হলো। আর বাদশাহ্ যদি সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির উপঢৌকনটিই গ্রহণ করে তার প্রতি সন্তুষ্টি ও শুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং উত্তম ও দামী খিলাত দেয়ার নির্দেশ দেন, তাহলে এটা কি বাদশাহর চূড়ান্ত কৃপা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন হবে না? এখন যদি সেই অজ্ঞাত, দীনহীন ব্যক্তি বাদশাহ্কে কৃতার্থ করেছে বলে দাবি করে এবং তার এই উপঢৌকনের জন্য বড়াই এবং আত্মগর্ব প্রকাশ করে, তাহলে তাকে আস্ত পাগল, বেআদব, বেওকুফ এবং মূর্খ ছাড়া আর কি বলা যাবে?

সুতরাং, তুমি যখন কোন একটি রাতে ইবাদতে জাগরণ করো বা দু'রাকাত নামায পড়ো, তখন তা থেকে অব্যাহতি লাভের পর একথা চিন্তা করবে যে, দুনিয়ার কত প্রান্তে, শুষ্ক যমীন ও পাহাড় জংগলে তাঁর কত যে খাদিম, কত যে সিদ্দিকীন এবং কত যে আশিকে ইলাহী, কত যে মুজতাহিদীন এমনিভাবে তাঁরই জন্য রাতের পর রাত কাটিয়ে যাচ্ছেন, তার কি কোন ইয়ত্তা আছে?

আরো চিন্তা করে দেখো, এ সময়ই হয়তো আল্লাহ্র দরবারে কত বুযুর্গ, কত খালিস খাদিম ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কান্নাকাটি করছে। তোমার আমলকে

শুদ্ধ, সঠিক ও দুরস্ত করার জন্য শত চেষ্টা করেও হয়তো তুমি তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। তাঁর দরবারে যে সব ইবাদত পেশ করা হয়েছে, সেগুলোর তুলনায় তোমার ইবাদতের কি মূল্য আছে? তোমার ইবাদত তো অসতর্কতা, ভুল-ত্রুটি ও খুঁতে ভরা।

মোটকথা, রাব্বুল ইয্যতের সামনে সাহসে উচ্চশির হয়, এমন কে আছে?

আমাদের শায়খ (র) বলেছেনঃ তুমি তোমার নামাযের মধ্যে এমনভাবে কোন নামায কি আসমানের দিকে প্রেরণ করেছো, যেভাবে মালদারের নিকট খাঞ্চা (সর্বপ্রযত্নে) প্রেরণ করা হয়?

আবূ বকর আল ওয়ারাকা (র) বলতেনঃ কোন নারী যিনা করার পর যেমন অনুশোচনা ও ধিক্কারে জর্জরিত হয়, আমার প্রত্যেক নামাযের পরও আমি তার চাইতেও বেশী লজ্জা ও ধিক্কার অনুভব করি (সুবহানাল্লাহ্)!

যা হোক, তবুও সেই পরম প্রভু, রাব্বুল ইয্যত তোমার দু'রাকাত নামাযের মর্যাদা ও সম্মান দেন, তার জন্য অসংখ্য সওয়াব ও পুরস্কার দান করেন। অথচ, অবস্থা এই যে, তুমি তাঁর বান্দা, তাঁর গোলামের অন্তর্ভুক্ত। যা কিছুই তুমি আমল করো না কেন, কেবল তাঁরই অনুগ্রহ এবং করুণায় তা রূপলাভ করে। তা সত্ত্বেও তুমি তোমার সামান্য আমলকে নিয়ে বড়াই ও আত্মগর্ব করছো এবং অস্বীকার করছো আল্লাহ্র সমস্ত দান, অনুগ্রহকে। বড়াই ও শ্রেষ্ঠত্ব তো কেবল তাঁরই প্রাপ্য।

বিশেষ কথা

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছিঃ হে লোক সকল। আলস্য ও অসতর্কতা পরিত্যাগ করো! নইলে কেবল ক্ষতি আর ক্ষতি! কারণ, এ ঘাঁটিটি অত্যন্ত জটিল, কঠিন এবং ক্ষতিতে পরিপূর্ণ। তাছাড়া, এ ঘাঁটিটিই সর্বপ্রথম সামনে পড়ে। মনে রাখবে, সকল ব্যাপারের এটিই ভিত্তি। এখানে তুমি যদি নিরাপদ থাকতে পারো তবেই মুক্তি ও সাফল্য। আর যদি তা না পারো, ব্যাপার অন্যরূপ ধারণ করে, তাহলে তোমার সমস্ত চেষ্টা-যত্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সকল আশা হবে তিরোহিত, জীবন ধ্বংসে পতিত হবে।

এ ঘাঁটি সম্পর্কে তিনটি বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। যথা—

প্রথমত, এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, মারাত্মক ক্ষতিকর এবং সাংঘাতিক। এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এই কারণে যে, আত্মগর্ব ও রিয়া আসলে অত্যন্ত গোপনে সক্রিয় থাকে। ধর্ম বিষয়ে যিন্দা দিল, সতর্ক এবং সাবধান ব্যক্তির পক্ষেই কেবল তা টের পাওয়া সম্ভব। অলস, অসতর্ক, অসাবধান এবং অজ্ঞ লোকের পক্ষে এ বিষয়টি ধরা কিছুতেই সম্ভব নয়।

নিশাপুরের কোন কোন আলিমের কাছে আমি শুনেছিঃ আতা সালমা (রা) একবার একটি অতি উত্তম ও সুন্দর কাপড় বানিয়ে বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে গেলেন। জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ী তা দেখে বললোঃ এতে অমুক দোষ-ত্রুটি ও খুঁত আছে। আতা সালমা (র) কাপড়টি তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিয়ে সেখানেই বসে খুব কাঁদতে লাগলেন। তাঁর ক্রন্দন দেখে বস্ত্র ব্যবসায়ী খুব দুঃখিত হলো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চেয়ে কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু আতা (র) ব্যবসায়ীকে বললেনঃ আপনি যা ধারণা করছেন, আমি সেজন্য কাঁদছি না বরং আমি কাঁদছি এই জন্য যে, আমি এ কাপড়টা তৈরী করেছি অনেক যত্নে। কাপড়টিকে নিখুঁত, উত্তম ও সুন্দর করার ব্যাপারে আমার যা সাধ্য ছিল, তা আমি কাজে লাগিয়েছি। চেষ্টা করেছি, যাতে কোন ত্রুটি- বিচ্যুতি এতে না থাকে। কিন্তু যখন তা আমার চাইতে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সামনে পেশ করলাম, তখন তাতে এমন সব দোষ-ত্রুটি ও খুঁত ধরা পড়লো, যে বিষয়ে আমি অসতর্ক ও অনবহিত ছিলাম। সুতরাং আমার সেই আমলগুলোর অবস্থা কি হবে, যেগুলো আগামীকাল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে পেশ করা হবে? তাতে না জানি কত দোষ-ত্রুটি, কত খুঁত এবং কত আয়িব বের হয়ে পড়ে, যেগুলো এখন আমি ধরতেই পারছি না বা বুঝতেই পারছি না।

কোন এক সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি এক রাতে সেহরীর সময় আমার নীরব কামরায় বসে পবিত্র কুরআনের সূরায়ে তোয়াহা পড়ছিলাম। সূরা পড়া শেষ হলে আমার তন্দ্রা এসে গেল। আমি তন্দ্রাভিভূত হয়ে গেলাম। সেই অবস্থায়ই আমি খাবে দেখি যে, এক ব্যক্তি আসমান থেকে নেমে আসছেন। তাঁর হাতে একখানি কিতাব। লোকটি এসে আমার সামনে সেই কিতাব খুলে ধরলো। আমি তাতে দেখি যে, তাতে সূরায়ে তোয়াহার প্রতিটি আয়াত লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রতিটি আয়াতের নীচেই দশটি করে নেকী লেখা

হয়েছে। কিন্তু একটি আয়াতের নীচে কোন কিছুই লেখা নেই। মনে হয়, কোন কিছু লেখা ছিল, কিন্তু মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আরে ভাই! আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি যে, আমি এই আয়াতটিও পড়েছি। কিন্তু এর জন্য সওয়াব লেখা হলো না কেন? তিনি জবাব দিলেনঃ নিশ্চয়ই অপনি তিলাওয়াত করেছেন এবং আমিও তার জন্য নেকী লিখেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আসমানের তরফ থেকে নির্দেশ হলো যে, 'এই নেকী মিটিয়ে ফেলো'। অতঃপর আমি এই নেকী মিটিয়ে দিয়েছি। এ কথা শুনে আমি কাঁদতে শুরু করলাম, এবং বললামঃ কি অপরাধে এমন হলো? আমাকে জানানো হলো, তুমি যখন ঐ আয়াত পড়ছিলে তখন সেখান দিয়ে একজন মানুষ যাচ্ছিল, তজ্জন্য তুমি আয়াতটি খানিকটা বেশী আওয়াজ করে পড়েছো। এ জন্যই ঐ সওয়াব মিটিয়ে দেয়া হয়েছে।

মোটকথা, রিয়া এবং আত্মগর্ব এমন ভয়াবহ ও মারাত্মক ব্যাপার যে, এর যে কোন একটি একবার প্রকাশ পেলে সাথে সাথেই সত্তর বছরের ইবাদত বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি সুফিয়ান সওরী (র) এবং তাঁর সঙ্গিগণকে দাওয়াত করেছিলেন। তদনুযায়ী তাঁরা সে ব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। খাদ্য পরিবেশনের সময় হলে সে ব্যক্তি তাঁর কোন এক খাদিমকে বললেনঃ যে খেজুরের ঝুড়িটা আমি দ্বিতীয়বার হজ্জে গিয়ে নিয়ে এসেছি সেইটা নিয়ে এসো— প্রথমবারেরটা নয়। এ কথা শুনে সুফিয়ান সওরী (র) বললেনঃ আরে হতভাগ্য! এই কথা বলে তো দুই দুইটি হজ্জই ধ্বংস করে দিলি!

দ্বিতীয়ত, রিয়া এবং আত্মগর্বের পংকিলতা থেকে যদি সামান্যতম নেক আমল এবং ইবাদতও করা যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তারই মূল্য অপরিসীম। কিন্তু যদি নেক আমল ও ইবাদতের অধিকাংশই এ দুষ্ট গ্রহ ছেয়ে ফেলে, তবে আর তার কোন মূল্য অবশিষ্ট থাকে না। তবে যদি আল্লাহ্ পাক কৃপা করেন, সেটা আলাদা কথা।

হযরত আলী রাযিআল্লাহ্ আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ মকবূল (গৃহীত) আমলে কখনো কোন প্রকারেই কমি (হ্রাস) হতে পারে না।

নখয়ী (র)-কে কোন আমলের সওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ সে আমল যদি কবূল হয়ে যায়, তাতে তার সওয়াবের কোন সীমা নেই।

দাহাব (র) বলেছেনঃ প্রথম জীবনে এক ব্যক্তি সত্তর বছর পর্যন্ত এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত ছিল যে, প্রতিদিনই রোযা রাখতো এবং সাতদিন পর্যন্ত হয়তো ইফতারই করতো না। এরপর সে নিজের কোন একটা বিষয়ে প্রার্থনা করলো। কিন্তু সে প্রার্থনা কবূল হলো না। এতে করে সে নিজের নফ্‌সকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ সমস্ত দোষই তোরা। যদি তোর মধ্যে ভাল এবং কল্যাণকর কোন কিছু থাকতো, তাহলে অবশ্যই আমার প্রয়োজনের প্রার্থনা কবূল হতো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট এক ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, হে সাধক প্রবর! তোমার এ সময়টুকু (যে সময়টুকুতে তুমি তোমার নফ্‌সকে ধিক্কার দিচ্ছিলে) তোমার পূর্বেকার সমস্ত ইবাদতের চাইতেও উত্তম।

জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তিদের চিন্তা করা উচিত যে, এটা কত বড় আশ্চর্যের কথা যে, এক ব্যক্তি সত্তর বছর পর্যন্ত ইবাদতের ক্লেশ সহ্য করেছে— অপরপক্ষে মাত্র একটি মুহূর্ত ভাবনা করেছে; অথচ আল্লাহ পাকের নিকট সত্তর বছরের ইবাদতের চেয়ে এই মুহূর্তের চিন্তাই উত্তম প্রতিপন্ন হলো!

তাহলে এটা কি মস্তবড় ক্ষতি নয় যে, সত্তর বছরে যা তুমি করতে পারছো না— এক মুহূর্তেই তা করবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তুমি তা করছো না!

আল্লাহ্‌র কসম, এটা মারাত্মক ক্ষতি, মস্ত বড় লোকসান। এ ব্যাপারে আলস্য অবলম্বন এমন ক্ষতির কারণ, যার কোন তুলনা নেই। অপরপক্ষে যে স্বভাবটির এত মূল্য, এত অপরিসীম কদর, তাকে অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

এ কারণেই এসব সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইবাদত গোযার ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই তাঁরা এ ভেদ জানার চেষ্টা করেছেন। অতঃপর দুষ্টতা দূর করে কল্যাণকর দিকটিকে অবলম্বন করেছেন। এ জন্যই তাঁরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমল-সম্পন্ন হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেন নি। তাঁরা গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করেছেন। আমলের উৎকৃষ্টতা (ফযীলত) তার নিখুঁত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অতিরিক্ত বা বেশী আমলের কোন ফায়দা নেই। তাঁরা আরও বলেনঃ একটি রত্ন মাটির পাত্রের সহস্র টুকরার চাইতে বহু উত্তম।

যারা এ ধরনের সূক্ষ্ম জ্ঞান থেকে বঞ্চিত এবং এসব সম্পর্কে যাদের আদৌ কোন জ্ঞান নেই— তারা এসব বিষয়ে গূঢ় তত্ত্ব এবং অন্তরের রোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা বেশী রুকু সিজদা (নামায আদায়) ও অধিক সময় খানাপিনাকে বাদ দেয়ার (রোযা রাখা) উপরই গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। ফলে তারা সংখ্যার আধিক্যের ধোঁকায় নিপতিত রয়েছে। তারা জানে না, আমলের পবিত্রতা ও নির্মলতার মধ্যে কতখানি কল্যাণ নিহিত আছে। মগজহীন অসংখ্য আখরোটেই (ফল বিশেষ) ফায়দা কোথায়? ভিত্তি মজবুত না হলে তার উপর ছাদ চড়িয়ে যাওয়া সতর্ক ব্যক্তির কাজ নয়।

যা হোক, সতর্ক আলিম এবং কাশফের অধিকারীদের নিকট থেকে এসব ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিশেষ আলোচনা

প্রকৃত মা'বুদ, এমন বাদশাহ্ যাঁর ঐশ্বর্য ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির কোন শেষ নেই। তোমার উপর তাঁর এত অনুগ্রহ ও এত করুণা রয়েছে, যা বর্ণনাতীত। তোমার যে শরীরটা, তাও লুক্কায়িত দোষ-ত্রুটি, বিপদে ফেলার উপাদান ও উপকরণ এবং অজানা অজ্ঞাত সব জিনিসে পরিপূর্ণ। সুতরাং নফসের বাড়াবাড়িতে তাতে যদি কোন বিচ্যুতি ঘটে যায়, তাহলে তাকে রাব্বুল আলামীনের সেই ঐশ্বর্য ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির সামনে পেশ করার মতো শুদ্ধ ও সঠিক করে তোলার চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। নফ্সে তো এমন যে, সে সর্বদাই মন্দের প্রতিই আগ্রহান্বিত। কিন্তু আল্লাহ্‌র অশেষ দান ও করুণাপ্রাপ্তির জন্য তাকে অবশ্যই শুদ্ধ ও নির্মল করে তুলতেই হবে। অতঃপর হাসিল হতে পারবে কবূল ও সন্তুষ্টির মকাম। নতুবা এমন মহাকল্যাণের সুযোগ যদি হারিয়ে যায়, তবে নফ্সের পক্ষে তার পরিপূরণ সম্ভব নয়। ফলে, অনেক সময়ই এমন সব বিপদের সম্মুখীন হতে হয় যে, তার কোন হিসেব-নিকেশ নেই। সত্যিই ব্যাপারটি মারাত্মক এবং ভয়াবহ বিপদবাহী।

আরও মনে রাখবে, আল্লাহ্ পাকের প্রতিপত্তিও এমনভাবে পরিস্ফুটিত যে, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভকারী ফেরেশতাগণও দিনরাত তার সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, অনেকেই যেদিন তাকে পয়দা করা হয়েছে, সেদিন থেকে একই

অবস্থায় দণ্ডায়মান রয়েছে। অনেকেই আজ পর্যন্ত কেবল রুকু-সিজদাতেই পড়ে আছে। অনেকেই শুধু তসবীহ-তাহলীল পাঠের অবস্থায়ই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত একভাবে বসে আছে।

তাঁর ঐশ্বর্যের প্রকাশ এমনভাবে ঘটেছে যে, রুকুকারীর রুকু, সিজদাকারীর সিজদা এবং তসবীহ-তাহলীল পাঠকারীর তসবীহ্-তাহলীল পাঠ করা কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না। সবাই তাঁরা নিজ নিজ কাজে একইভাবে লিপ্ত থাকবেন। অতঃপর যখন তাঁরা এই মহাখিদমত থেকে অব্যাহতি লাভ করবেন, তখন তাঁরা বলে উঠবেনঃ তুমিই পবিত্র হে রব, আমরা সঠিকভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি নি।

আলমসমূহের নেতা, মানবশ্রেষ্ঠ ও নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেনঃ আয় আল্লাহ্! আমি তোমার প্রশংসা বর্ণনা করতে অপারগ। তোমার প্রশংসা গীতি সেভাবেই বললে যথার্থ হয়, তুমি নিজে যেভাবে তোমার সম্পর্কে বর্ণনা করেছো।

তিনি আরও বলেছেনঃ কোন ব্যক্তিই তার আমলের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হতে পারবে না। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার ব্যাপারেও কি তাই? তিনি জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, আমার ব্যাপারেও একই অবস্থা — যদি আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি রহমত করেন, তবে।

আর তাছাড়া, আল্লাহ্র নিয়ামত-অনুগ্রহ ও করুণার বিষয় অনুমান করা যায় নিম্নোক্ত আল্লাহ্র বাণী নিয়ে কিছুটা চিন্তা করলেই। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا -

আল্লাহ্র নিয়ামত যদি তোমরা গণনা করতে যাও, তাহলে হিসেব করতে সক্ষম হবে না।

বর্ণিত আছে, মানুষের হাশর হবে তিনটি বিভাগের অধীনে। একটি নেকীর দফতর, আর একটি গুনাহ্র দফতর, আর তৃতীয়টি হবে আল্লাহ্র নিয়ামতের। নেকীর পরিবর্তে তো নিয়ামত মিলবে, এতে কোন সন্দেহই নেই। এমন কোন নেকীই থাকবে না, যার পরিবর্তে কোন পুরস্কার কেউ না পাবে। এমনকি আল্লাহ্র পুরস্কার এবং নিয়ামত নেকীসমূহকে ঘিরে ফেলবে। তখন অবশিষ্ট

থাকবে গুনাহ্সমূহ। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র মরযী ব্যতীত আর কোন কিছুরই কোন ভূমিকা থাকবে না।

নফসের দোষ-ত্রুটি এবং তা থেকে যেসব বিপদের আশঙ্কা, তা তো আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। তাছাড়া, সবচাইতে ভয়ের ব্যাপার এই যে, কোন মানুষ হয়তো সত্তর বছর ধরে ইবাদত ও নেক আমলে ব্যাপৃত আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার কোন আমলই কবূল হয়নি অথচ সে এই সম্পর্কে কিছুই জানে না, কেবল ইবাদত করে চলেছে। আবার অনেক সময় এমনও হচ্ছে যে, একটিমাত্র মুহূর্তের কোন কাজের দরুন কারো দীর্ঘ দিনের ইবাদত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

আরও ভয়াবহ ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো অনেক সময় বান্দার প্রতি নজর করছেন, আর বান্দা হয়তো সে সময় তার ইবাদতে রিয়া ও প্রদর্শনীতে ব্যাপৃত আছে। ফলে, এই হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঔদ্ধত্য ও নাফরমানীর দায়ে তার ইবাদত প্রত্যাখ্যান করছেন।

কোন এক আলিমের নিকট শুনেছি— হাসান বসরী (র) সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) ইন্তেকালের পর একদিন তাঁকে খাবে দেখা গেল। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ আপনার অবস্থা কি? হাসান বসরী (র) জবাব দিলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে বললেনঃ ওহে হাসান! দু'টি দিনের কথা কি তোমার স্মরণ আছে— যেদিন তুমি মসজিদে নামাযের জন্য দাঁড়ালে মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে দেখা শুরু করেছিল বলে তুমি তোমার নামাযকে আরও সুন্দর ও আরও সৌষ্ঠবপূর্ণ করেছিলে? যদি তোমার আগের খালিস নামাযসমূহ না থাকতো, তাহলে আজ আমি তোমাকে আমার দরজা থেকে ফিরিয়ে দিতাম এবং তোমার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম।

মোটকথা, ব্যাপার যখন এতদূর গড়িয়ে গেছে, তখনই সূক্ষ্মদর্শী মারিফতপন্থিগণ এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করেন এবং নিজেদের ব্যাপারে ভীত হয়ে উঠেন। এমনকি, তাদের অনেকেই সে সব মানুষ নিজের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া পরিত্যাগ করেছেন, যে সব বিষয়ের দ্বারা আমলে সাফল্য অর্জন করে। রাবেয়া বসরী (র) বলেছেনঃ আমার যত আমলই হোক না কেন, তাকে আমি গণ্য করি না। অন্য একজন বুযুর্গ বলেছেনঃ নিজের নেকীকে এমনভাবে গোপন করো, যেভাবে মানুষের নিজের দোষ-ত্রুটি গোপন করে।

আরও এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেনঃ নেক আমলের জন্য যদি কোন গোপন ভাণ্ডার বানাতে পারো, তবে বানিয়ে ফেলো। বর্ণিত আছে, রাবেয়া বসরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি আশার ব্যাপারে এত ভীত কেন? তিনি জবাবে বলেছিলেনঃ যার আমল প্রকাশিত হয়ে পড়বে তাকেই পাকড়াও করা হবে।

আবূ ইয়াযিদ বোস্তামী (র) বলেনঃ আমি তিন বছর আল্লাহ্‌র ইবাদত করলাম। এরপর কি দেখছি! কোন একজন বলে গেলঃ আয় আবূ ইয়াযিদ! ইবাদতে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যদি সে মকামে পৌঁছতে চাও, তবে হেয় এবং দীনতা অবলম্বন করো। উস্তাদ আবুল ফজল বলতেনঃ আমি পরিষ্কার জানি যে, আমি যতটুকু নেক করি, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তা কবূল হয় না। এ-ব্যাপারে তার নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি জবাবে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন কিছুর প্রয়োজন করে না। সুতরাং তিনি যে কবূল করবেনই, এমন কি নিশ্চয়তা আছে? অ তাছাড়া, তার পক্ষে যে সব হক আছে, সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করাও কোন মানুষের সম্ভব নয়। এজন্যই আমি জানতে পেরেছি যে, আমার আমল সব অগ্রহণীয়। তখন তাকে বলা হলো যে, তাহলে আপনি ইবাদত ছেড়ে দেন না কেন? তিনি জবাবে বললেনঃ আশা যে, যদি কোনক্রমে তাঁর রহমতের দৃষ্টি পড়ে যায়। অপরপক্ষে, ইবাদতের দ্বারা নফসকেও নেক কাজ করায় অভ্যস্ত রাখা যায়। সূতরাং ইবাদত পরিত্যাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এবার ভেবে দেখো! এটি সেই সব বুযুর্গের কথা, যাঁরা সাধনা ও সংযমে, ইবাদত ও নেক আমলের মধ্যেই নিজেদের উৎসর্গ করে রেখেছেন। তাহলে তোমার অবস্থা কি হতে পারে? তোমার অবস্থাও তো সেই কবির উক্তির মতো, যিনি বলেছেনঃ আফসোস! আলস্য করেও মানুষ সম্মানের আশা করছে। নফসের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে এবং মনোযোগ দিয়ে চেষ্টায় অবতীর্ণ হও।

এ প্রসংগে আমি একটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। হযরত ম'আয (রা) বলেছেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে ছিলাম। তিনি একটি বাহনে সওয়ার হলেন এবং আমাকেও তাঁর পিছনে উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা সেই মহাপ্রভুর জন্য, যিনি তাঁর ইচ্ছা মতো আহকাম জারি করেন। তারপর আমাকে ডাকলেনঃ ওহে মা'আয! আমি

বললামঃ বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বললেনঃ আমি তোমার নিকট একটি বিষয় বর্ণনা করছি! এ বিষয়টি যদি তুমি রক্ষা করতে পারো, তাহেল তুমি অনেক উপকৃত হতে পারবে। আর যদি বিষয়টি হারিয়ে ফেলো (পরিত্যাগ করো) তাহলে আল্লাহ্র দরবারে তোমার কোন প্রমাণাদিই থাকবে না। অতঃপর বললেনঃ হে মা'আয, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান এবং যমীন সৃষ্টির আগে সাতজন ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক আসমানেই একজন ফেরেশতা দ্বারবান এবং দারোগা হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তাছাড়াও আসমানসমূহের প্রত্যেকটি দরজায় মর্যাদা অনুযায়ী একজন করে রক্ষী ফেরেশতা আছেন। ফেরেশতাগণ যখন বান্দার আমল নিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকেন, তখন সেই আমলে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলোকপিণ্ড কিরণ বিস্তার করে থাকে— সে আলোকে আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত আলোকিত করে। সে সময় ফেরেশতা আমলটিকে খুব একটা কিছু মনে করেন এবং তাঁর প্রশংসা করতে থাকেন। অতঃপর যখন আসমানের দরজায় পৌছেন, তখন সেই রক্ষী ফেরেশতা তাঁকে বলেন, এ আমল আমলকারীর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে এসো। আমি গায়েবের ভেদ জানি। আল্লাহ্ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন গীবতকারীর আমলকে ভিতরে ঢোকবার অনুমতি না দেই। অতঃপর সেই ফেরেশতা পরের দিন বান্দার আমল নিয়ে আসমানের দিকে উঠতে থাকেন। এতে রৌশনী থাকে, আলোক থাকে। ফেরেশতা আমলের গুণকীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে করতে চলেন। এভাবে দ্বিতীয় আসমানে পৌছে যান। তখন সেই আসমানের রক্ষী ফেরেশতা ডেকে বলেনঃ দাঁড়াও। এ আমল সে আমলকারীর মুখের উপর ছুঁড়ে মেরে এসো। কারণ, সে আমলের মাধ্যমে দুনিয়ার সাজসরঞ্জামের কামনা করছে। আমাকে আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন এই আমলকে আর আগাতে না দেই। ফলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এজন্য অভিশাপ দিতে থাকে। এরপর ফেরেশতা পুনরায় বান্দার সদকা, খয়রাত, রোযা প্রভৃতি নেক আমল নিয়ে আনন্দের সাথে আসমানের দিকে উঠতে থাকে। তিনি এসব আমলের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় আরও বেশী খুশী হয়ে প্রশংসা বর্ণনা করতে করতে উপরে উঠতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যখন তৃতীয় আসমানের নিকটবর্তী হন, তখন সে আসামানের রক্ষী ফেরেশতা তাঁকে ডেকে বলেনঃ থামো! এ আমল সেই বান্দার মুখের উপর মেরে দাও। আমি বড়াইকারীদের বাদশাহ্! আমাকে আমার পরওয়ারদিগার নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন এ

আমলকে আর আগাতে না দেই। কারণ. এ ব্যক্তি মজলিসে মানুষের সাথে অহংকার করতো।

অতঃপর ফেরেশতা বান্দার আমল নিয়ে চড়তে থাকেন। তখন আমল এমনভাবে আলোকিত হতে থাকে, যেন উজ্জ্বল তাকারাজি। আর আমলের ভিতরে এক ধরনের আওয়াজ হয়। তাতে বান্দার রোযা, নামায, হজ্জ, উমরা প্রভৃতির পবিত্রতা বর্ণিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে ফেরেশতা চতুর্থ আসমানে পৌঁছে যান। তখন সেই আসমানের রক্ষী ফেরেশতা তাকে বলেনঃ এখানেই থামো, আর অগ্রসর হয়ো না। এ আমল সেই আমলকারীর মুখের উপর ছুঁড়ে দাও। আমি আত্মগর্বকারীর বাদশাহ। আমাকে আমার পরওয়াদিগার নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন এ আমলকে সম্মুখে অগ্রসর হতে না দেই। কারণ, এ ব্যক্তি যখনই কোন নেক আমল করতো, সাথে সাথেই সে বড়াই এবং আত্মগর্ব প্রকাশ শুরু করতো।

অতঃপর ফেরেশতা বান্দার আমল নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন এবং আমলকে এমনভাবে সুসজ্জিত করে নেন, যেন দুলহান। হজ্জ, জিহাদ. উমরা — এ ধরনের উত্তম আমল নিয়ে যখন ফেরেশতা পঞ্চম আসমানে পৌঁছে যান. তখন সেই আমলে এমন রওশনী থাকে, যেমন রওশনী বিদ্যমান সূর্যে। অতঃপর সে আসমানের রক্ষী ফেরেশতা তাঁকে লক্ষ্য করে বলেনঃ আমি হিংসুকদের বাদশাহ। আল্লাহ্ পাক একে যত নিয়ামত দিয়েছেন, তা নিয়ে সে হিংসা করতো। সুতরাং তিনি তার প্রতি যতখানি সন্তুষ্ট ছিলেন, ততখানি বিরক্ত হয়েছেন। আমার পরওয়ারদিগার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তার আমল আমা ব্যতীত আর কারো নিকট যেতে না দেই। এরপর ফেরেশতা বান্দার আমল নিয়ে উপরে উঠতে থাকেন— এ আমলের মধ্যে থাকে উত্তম ও পূর্ণ ভাবে ওযু, বহু নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা। এ আমলগুলো নিয়ে তিনি ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছে যান। তখন সে আসমানের রক্ষী ফেরেশতা বলেনঃ আমি রহমতওয়ালা। আমল তার মুখের উপর ফেলে দাও। এ ব্যক্তি কোন মানুষের উপরই রহমত করতো না। যখন কোন ব্যক্তির সাথে কোন ব্যাপরে সে জড়িত হতো তখন সে গালিগালাজ করতো। আমার পরওয়ারদিগার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ আমি কখনো যেন এই আমল আর কারো কাছে যেতে না দেই। এরপর ফেরেশতা পুনরায় বান্দার আমল নিয়ে উপরে উঠতে থাকেন। এতে থাকে অসংখ্য সদকা.

নামায, রোযা, সংসার বর্জন এবং তাকওয়ায় সুসজ্জিত আমলসমূহ। সে আমলে বিজলীর ন্যায় আওয়াজ এবং রওশনী থাকবে। অতঃপর তিনি যখন এ আমল নিয়ে সপ্তম আসমানে পৌছবেন, তখন তথাকার ফেরেশতা তাকে বলবেনঃ অমি রিয়া এবং মানুষের মধ্যে প্রদর্শনী করার ফেরেশতা। এই আমলের মালিক, মজলিসে খ্যাতি, বন্ধুদের মধ্যে উচ্চস্থান এবং বড় বড়দের মধ্যে বুযুর্গীর প্রত্যাশা করতো। আমার পরওয়ারদিগার আমাকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ আমি এ আমলকে যেন আমা ব্যতীত অন্য কোথাও যেতে না দেই।

অতঃপর ফেরেশতা বান্দার আমল নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। তার সাথে থাকে নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, উমরাসহ উত্তম উত্তম আমল, আল্লাহ্র যিকিরের আমল। এগুলো নিয়ে তিনি সাতটি আসমানই অতিক্রম করে যান এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌছতে যত পর্দা আছে, তাও অতিক্রম করেন। শেষ পর্যন্ত ফেরেশতা বান্দার আমল নিয়ে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর সম্মুখে উপস্থিত হন এবং সেই আমলের প্রশংসা-গীতি এবং তা যে নেক আমল, সেই সাক্ষ্য দান করতে থাকেন।

তখন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ তুমি আমার বান্দার আমলের রক্ষক। কিন্তু তার অন্তরের খবর আমি রাখি। সে এসব আমল আমার উদ্দেশ্যে করে নি— অন্য কিছু বা কারো উদ্দেশ্যে সে এগুলো করেছে। খালিস আমার জন্য এ আমল সে করেনি। আমি পরিষ্কার জানি, এ আমল সে কি উদ্দেশ্যে এবং কার উদ্দেশ্যে করেছে। এ ধরনের লোকের উপর আমার অভিসম্পাত। সে তোমাকে এবং মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু আমাকে কিছুতেই ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়। আমি তো আলীমুল গায়েব। সকল অন্তঃকরণের খবরই আমি রাখি। কোন বিষয়ই আমার নিকট গোপন থাকতে পারে না। আমার মরজি ব্যতীত কোন কিছু ঘটতেও পারে না। ভবিষ্যতে কি হবে, তা যেমন আমি জানি, তেমনি জানি অতীতের সবকিছুর খবর। সব বিষয়ের পরিণামও আমার জানা আছে। সমস্ত গোপন ও গুপ্ত জিনিসের খবরও আমার জ্ঞাত। সুতরাং অমার বান্দা আমাকে তার আমলের ব্যাপারে কি করে ধোঁকা দেবে? সে ধোঁকা দিতে পারে মখলূককে। কারণ, তাদের কিছুই জানা নেই। আমার তরফ থেকে তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করা হোক। অতঃপর সেই সাত ফেরেশতা এবং তাদের অধীনস্থ তিন হাজার ফেরেশতা আল্লাহ্র নিকট বলবেঃ আয় রব! আপনার এবং আমাদের সকলের

অভিসম্পাত তার উপর বর্ষিত হোক। অতঃপর সমস্ত আসমানবাসীরা বলবে. সেই বান্দার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত এবং লা'নতকারীদের লানত বর্ষিত হোক।

এ বর্ণনা শোনার পর হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা) ক্রন্দন শুরু করলেন। অনেকক্ষণ কাঁদবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যে বিবরণ দিলেন, এ থেকে নাজাত লাভের উপায় কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ প্রত্যয়ের ব্যাপারে তোমার নবীর অনুসরণ করো। মা'আয (রা) আরয করলেনঃ আপনি তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) আর আমি মা'আয-ইবনে জাবাল। আমি কি করে এ থেকে মুক্তি পাবো? হুযূর (সা) বললেনঃ আচ্ছা ম'অ া! যদি তোমার আমলে অপরিপক্কতা ও ত্রুটি থাকে, তাহলে মানুষকে দোষারোপ করা থেকে বিরত হও। বিশেষ করে কুরআনওয়ালা ভ্রাতাদের ব্যাপারে। মানুষের কাছে নিজের দোষের কথা প্রকাশ করো। অন্যের দোষ বলে নিজেকে ভাল প্রমাণিত করার চেষ্টা করো না। তেমনি অন্যকে ছোট করে নিজের ইযযত বাড়াবার কোশেশ করো না। মানুষকে দেখাবার জন্য নিজের আমলকে প্রদর্শনীমূলক (রিয়া) করো না। আর দুনিয়ায় এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ো না যে, আখিরাতের কথাই ভুলে যাও। অন্য লোকের উপস্থিতিতে আরেকজনের সাথে কান-কথা বলো না। মানুষের নিকট বড়াই করো না। কারণ, এতে করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। মজলিসে বসে বাজে, অশ্লীল, লজ্জাহীন এবং অনাবশ্যক কথা বলো না, যাতে করে তোমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে অন্যেরা তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। মানুষকে বঞ্চিত করো না। নিজের কথার দ্বারা মানুষকে আঘাত দিও না, যাতে দোযখের কুকুর তোমাকে ছিন্নভিন্ন করতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

وَالنَّا شِطَاتِ نَشْطًا -

হাড় থেকে গোশ্‌ত ছিন্ন ভিন্ন করা হবে।

মা'আয (রা) বলেনঃ ।আমি আরয করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ-সব পালন করে চলা কার পক্ষে সম্ভব? তিনি জবাব দিলেনঃ ওহে মা'আয! আমি যা বললাম, আল্লাহ্ পাক যার জন্য সহজ করে দেন, তার পক্ষে এগুলো পালন করা সহজ হয়ে যায়। এর মধ্যে তোমার জন্য এ-ই যথেষ্ট যে, তুমি মানুষের

জন্য সেই জিনিস বা বিষয় পছন্দ করবে, যা তুমি তোমার নিজের জন্য পছন্দ কর। তেমনি, তুমি নিজে যা সহ্য কর না, মানুষের জন্যও তুমি তা পছন্দ করো না। তাহলেই তুমি নিরাপদ এবং নিশ্চিত হয়ে যেতে পারবে।

খালিদ ইবনে মাদান (রা) বর্ণনা করেন, হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা) এ হাদীসটি এত পাঠ করতেন যে, কুরআনুল করীমকেও তত পাঠ করতেন না।

এ হাদীস শোনার পর এখন একবার চিন্তা করে দেখো, তোমরা সকলেই এ হাদীসে বর্ণিত দোষগুলোতে লিপ্ত আছ কিনা? এসব রোগের পরিণতি কত ভয়াবহ, তা-ও একবার অনুমান করো যে, শুনলে জ্ঞান-বিবেক স্থির হয়ে যায়। বুক দুরু দুরু করে। শরীর ভয়ে জড়সড় হয়ে আসে। সুতরাং সকল ব্যাপারেই সেই পরম প্রভুকে লক্ষ্য করে আমল করো। তাঁরই সামনে বিনীত ও ভীত হয়ে আহাজারী করো। রাত দিন একই অবস্থায় কাটাতে চেষ্টা করো। কারণ, তাঁর রহমত ব্যতীত এত বিপদের ঝুঁকি সামলানো এবং তা থেকে নাজাত সম্ভব নয়। তাঁর তওফীক ব্যতীত নিরাপদ হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

সুতরাং আলস্য ও অসতর্কতা পরিত্যাগ করো। সাবধান হও, সচেতন হও। আমলকে পূর্ণরূপে করতে থাকো। নফসের সাথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হও, যাতে তোমাকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হতে না হয়।

আল্লাহ্ পাক অশেষ করুণাময়। তিনিই আমাদের সকল সংগ্রাম ও চেষ্টা-যত্নে সাহায্য করবেন।'

সারকথা

এখন যদি একবার দুনিয়ায় ন্যক্কারজনক অবস্থা এবং অবলুপ্তির দিকে তার দ্রুত ধাবমান গতির প্রতি লক্ষ্য করো, তাহলে আত্মগর্ব বা রিয়ার ন্যায় কোন দুষ্ট-গ্রহ এসে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। নফসকে বলোঃ হে নফস! এই অক্ষম, অজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞ মখলূক (মানুষ) যারা প্রকৃতপক্ষে তোমার ইবাদতের কোন কদরই বুঝে না, তাদের জন্য ইবাদত করার চাইতে প্রকৃত মাবুদ, আল্লাহ্র জন্য তা করাই উত্তম। কারণ, তিনিই সমস্ত জিনিস, সকল হৃদয়, সকল অন্তঃকরণ ও সকল উপকরণাদির চাবিকাঠি। সুতরাং তিনি যেমন ইচ্ছা, সে দিকে তা ফিরিয়ে নেবেন। হে নফস! বিবেচনার সাথে কাজ করো। রিয়া ও

আত্মগর্বের ন্যায় দুষ্টগ্রহের তালে পড়ে নিজের সমূহ নেক আমল, প্রিয় ইবাদতকে বরবাদ করো না। সেই মহাপ্রভুর কথা ক্ষণিকের তরেও ভুলো না। তাঁর প্রশংসা-গীতি করাই গৌরবের বিষয়। মনে রেখো, বিনা কারণে রাত-জাগরণে কোন ফায়দা নেই। নিজেকে বিলীন করা ব্যতীত আহাজারী করেও লাভ নেই।

অতঃপর নিজের নফসকে বলোঃ হে নফস! চিরস্থায়ী বেহেশতই উত্তম, না এই দুর্গন্ধময় দুনিয়া এবং তার ধ্বংসশীল উপকরণ?

তোমার পূর্ণ ক্ষমতা আছে, তুমি ইবাদতের মাধ্যমে সেই মহাআনন্দময় স্থান লাভ করতে পারো। সুতরাং দুর্বল, সাহসহীন হওয়া এবং সুসংকল্প করার কি প্রয়োজন? তুমি চেয়ে দেখো না, আসমানী হলেই যেকোন জিনিসের কদর কত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তুমিও তোমার সকল কর্মপ্রচেষ্টা ও যত্নকে আসমানের দিকে কেন্দ্রীভূত করো এবং যাঁর হাতে সমস্ত বিষয়ের চাবিকাঠি, তাঁরই জন্য তোমার হৃদয়কে খালি করে লও। নেক কাজের যতটুকু করার সাধ্য আছে, করো এবং অনাবশ্যকভাবে কিছুতেই তা নষ্ট হতে দিও না।

তুমি যদি গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন হও, তাহলে আল্লাহ্‌র সাহায্যের বিষয় এবং তোমার নিজের ইবাদত তাঁর অবদান সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। তুমি দেখবে যে, তিনি তোমাকে উপকরণ দিচ্ছেন, তারপর পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা দূর করে দিচ্ছেন। তবেই তুমি তাঁর ইবাদতের জন্য মুক্ত হতে পেরেছো। তারপর নেমে আসছে তাঁর সাহায্য ও বিশেষ তওফীকের কিরণধারা। এভাবে ইবাদতকে তোমার জন্য সহজসাধ্য করে দেবেন। তোমার অন্তঃকরণকে এমনভাবে সুষমামণ্ডিত করে দেবেন যে, ইবাদতেই তুমি দৃঢ়বদ্ধ ও স্থিতিশীল হয়ে যাবে। এখানেই শেষ নয়, এতকিছু সাহায্য করার পরেও তাঁর নিজের এত ঐশ্বর্য, বিভব এবং প্রতাপ-প্রতিপত্তি সত্ত্বেও তোমার সেই সামান্য আমলটুকুর জন্যই কত প্রশংসা ও কত পুরস্কার তিনি জমা করে রেখেছেন।

সুতরাং এর পরে আর এই সামান্য আমল নিয়ে আত্মগর্ব বা রিয়ার কি আছে? এ ব্যাপারে লজ্জা হওয়াই কি মানুষের কর্তব্য নয়? কারণ, ফযীলত, অবদান ও কদর যা কিছু সবই তো আল্লাহ্‌রই।

এভাবে আমল করার পর তোমার কর্তব্য হবে আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করা, যাতে তিনি তা কবূল করেন। তোমরা কি আল্লাহ্‌র খলীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা শোননি? তিনিও তো বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ থেকে

অব্যাহতি লাভের পর আল্লাহ্‌র দরবারে কত না আহাজারী করেছিলেন। ফলে তাঁর আমল কবূলের মকাম হাসিল করেছে। তিনি আরয করেছিলেনঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

অতঃপর দোয়া থেকে ফারেগ হয়ে বলেছেনঃ

رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاء -

সুতরাং আল্লাহ্ পাক যদি তোমার সামান্য আমলটুকু কবূল করে সাথে সাথে তার নিয়ামতে-পুরস্কারে তোমাকে ভূষিত করেন, তবে কত না সৌভাগ্য এবং কত আনন্দের কথা!

কিন্তু যদি তা না করেন, তাহলে তা যে কত বড় ক্ষতি, কত বড় হতভাগ্যের কথা, তা বলে শেষ করা যায় না।

লোক সকল! বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে সঠিক পথে আমল করার চেষ্টা করো।

যাহোক, এরপর ইবাদত থেকে ফারেগ হওয়ার পর বারবার নিজের মনে এসব বিষয় স্মরণ করো। অতঃপর আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করো। সাথে সাথেই মখলূক এবং নফস থেকে মুক্তি এবং আত্মগর্ব ও রিয়া থেকে অব্যাহতি লাভ করো। সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে করো, সর্বাবস্থায় তাঁরই সাহায্যের প্রত্যাশাসহ। তাঁরই পুরস্কারের আশায়, লক্ষ্য রাখবে, ইবাদতের বাহ্যিক দিক যেন সকল ত্রুটি বিচ্যুতি মুক্ত হয়, আর বাতেনী দিকটিও যেন সকল প্রকার কলুষতা ও পংকিলতাবিহীন হয়। তাহলে তা এমন গ্রহণযোগ্য ইবাদত হবে যে, জীবনে একবারও যদি এমন ইবাদতের নসীব হয় প্রকৃতই তা একটি অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।

আমার জীবনের কসম। এ ধরনের ইবাদত করা যেমন কঠিন ও মুশকিল, তেমনি এর পুরস্কার অসংখ্য।

রে হতভাগ্য! চিন্তা কর— এমন যেন না হয় যে, তুমিও ধোঁকায় পতিতদের দলভুক্ত হয়ে পড়ো। বরং উপরিউক্ত তরীকায় দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেলে তোমাকেও আল্লাহ্‌র মোখলেস বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা হবে।

এভাবেই তুমি এ ভয়ানক বিপদপূর্ণ ঘাঁটিও অতিক্রম করে যেতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ পাকই উত্তম তওফীক দানকারী।

দশম সোপান

হামদ ও শোকর

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে নেক তওফীক দান করুন। পূর্ববর্ণিত ঘাঁটি অতিক্রমের মাধ্যমে প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু ইবাদতে নিরাপত্তা হাসিল হয়ে যায়। এরপরই বান্দার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় সে মহান নিয়ামতের জন্য আল্লাহ্‌র হামদ (প্রশংসা-গীতি) ও শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) গোযারী করার। এটি অবশ্য কর্তব্য।

দু'টি কারণে আল্লাহ্‌র হামদ ও শোকর করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত, প্রাপ্ত নিয়ামতটি স্থায়িভাবে লাভ করার জন্য। দ্বিতীয়ত, সেই নিয়ামত আরও অধিক পাওয়ার কামনা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে।

বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, নিয়ামতের স্থায়িত্ব তার শোকরের উপর নির্ভরশীল। শোকর পরিত্যাগ করলে নিয়ামত বিলুপ্ত এবং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ–

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন না, যতক্ষণ না তারা স্বয়ং নিজেদের যোগ্যতার পরিবর্তন করে।

(সূরা রা'দ ঃ ১১)

তিনি আর বলেছেনঃ

فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ–

তারা আল্লাহ্র নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের ভুখ এবং ভয়ের স্বাদ বুঝিয়েছেন — তাদেরই আমলের পরিপ্রেক্ষিতে এ শাস্তি। (সূরা নাহলঃ ১১২)

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ -

হে মুনাফিকগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শাস্তি দিয়ে কি করবেন? যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ঈমান আনয়ন করো— আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই মর্যাদা দানকারী এবং অতিশয় জ্ঞানী। (সূরা নিসাঃ ১৪৭)

নবীয়ে আকরম (সা) বলেছেনঃ

اِنَّ لِلنِّعْمِ اَوَابِدًا كَاَوَابِدِ الْوَحْشِيِّ فَقَيِّدُوْهَا بِالشُّكْرِ -

নিয়ামত জংলী জানোয়ারের ন্যায় বেয়াড়া, সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার শোকর গোযারীর মাধ্যমে তাকে আয়ত্তে রাখো।

আর যেহেতু শোকরের উপরই নিয়ামতের স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল, সুতরাং শোকরের দ্বারাই তা বেশী পাওয়ার কামনাও করা যেতে পারে।

আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ইরশাদ করেছেনঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ -

যদি তোমরা শোকরগোযারী করো, তাহলে অধিক নিয়ামত দান করবো।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُمْ هُدًى -

যারা সঠিক পথে আছে, আল্লাহ্ পাক তাদের অধিকতর দান করেন।

আরও বলা হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে তাদের অবশ্যই হিদায়তের পথে তুলে দেয়া হয়।

সুতরাং পরম প্রভু যখন বান্দার দিকে ফিরে তাকান এবং দেখতে পান যে, বান্দা তাঁর নিয়ামতের হক আদায় করছে, তখন তিনি সেই নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। এমনকি, সেই বান্দাকে উক্ত নিয়ামতের যোগ্য বলে নির্দিষ্ট করে দেন। আর যদি বান্দা নিয়ামতের হক আদায় না করে, আল্লাহ্ যখন তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পান যে, বান্দা অকৃতজ্ঞ তখন তাঁর নিকট থেকে সকল নিয়ামত কেড়ে নেন। এভাবেই অনেক বান্দা আল্লাহ্র নিয়ামত থেকে হয় সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

নিয়ামতের শ্রেণীবিভাগ

নিয়ামত প্রথমত, দুই প্রকার। পার্থিব নিয়ামত; ধর্মীয় নিয়ামত। পার্থিব নিয়ামতও আবার দুই প্রকারঃ নিয়ামতে নাফা, অর্থাৎ উপকারী নিয়ামত আর নিয়ামতে দফা অর্থাৎ প্রতিরোধকারী নিয়ামত।

উপকারী নিয়ামতঃ সকল উপকৃত হওয়ার নিয়ামত এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যার দ্বারা মানুষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারে।

উপকারী নিয়ামতও আবার দুই প্রকার। প্রথমত নিরাপত্তা, পবিত্রতা ও শান্তি প্রভৃতি রক্ষা সংশ্লিষ্ট নিয়ামত। দ্বিতীয়ত কামনা, স্বাদ গ্রহণ, রতিক্রিয়া এবং খাওয়া-দাওয়ার শক্তি সংশ্লিষ্ট নিয়ামত।

নিয়ামতে দফা বা প্রতিরোধকারী নিয়ামত আল্লাহ্ কর্তৃক সকল প্রকার বিপদাপদ ক্ষতি, ভুল-ভ্রান্তি প্রভৃতি দূর করে দেওয়া এ শ্রেণীর নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। নিয়ামতে দফাও দুই প্রকার। প্রথমত, নফস ও প্রাণের দিক দিয়ে — আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দুর্বলতা, বিভিন্ন প্রকার রোগ ও আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। এ রক্ষাকারী নিয়ামতই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয়ত, সেই বিষয় থেকে রক্ষা করা যেগুলির দ্বারা সমূহ বিপদের আশঙ্কা থাকে। যেমন মানুষ, জিন, হিংস্র জানোয়ার প্রভৃতির বিপদ থেকে রক্ষা। দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করাও এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

নিয়ামত দীনিয়া অর্থাৎ ধর্মীয় নিয়ামতও দুই প্রকার। নিয়ামতে তওফীক আর নিয়ামতে ইসমত।

নিয়ামতে তওফীক— যেমন আল্লাহ্ পাক মানুষকে ইসলামের তওফীক, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পদাংক অনুসরণের তওফীক, অতঃপর ইবাদত ও নেক আমলের তওফীক দান করে থাকেন।

নিয়ামতে ইসমত— যেমন আল্লাহ্ পাক মানুষকে কুফরী থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। অতঃপর সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে রক্ষা করেন। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا -

যদি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত গণনা করতে শুরু করো, তাহলে গণনা করতে পারবে না।

এসব নিয়ামতের স্থায়ী থাকা তখনই সম্ভব, যখন আল্লাহ্ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে পুরস্কার দান করেন। তেমনি এসব নিয়ামতের কম-বেশীও আল্লাহ্রও সন্তুষ্টির উপরই নির্ভরশীল। তুমি যদি বেশী করে পেতে চাও, তাহলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধান করো। এইভাবে তুমি শুধু বেশীই পাবে না, তোমার ধারণারও বেশী পেয়ে যাবে।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানেরও একটি মাত্র পন্থা আছে। তা হলো শোকর গোযারী এবং তাঁর হামদ বা প্রশংসা।

সুতরাং, এমন মূল্যবান ও কদরওয়ালা বিষয়কে নিজের স্বভাবে একাত্ম করে ফেলা দরকার, যেন কখনো কিছুতেই তা হাতছাড়া না হয়।

হামদ ও শোকরের হাকীকত

হামদ ও শোকরের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী ও জ্ঞানী-গুণী বিভিন্ন রকমের মত প্রকাশ করেছেন এবং তা অর্জনের পন্থা সম্পর্কেও তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যা হোক, আল্লাহ্র তসবীহ- তাহলীলের মাধ্যমে প্রকাশ্য ইবাদতের নাম হলো হামদ। অপরপক্ষে, সমর্পণ ও ধৈর্য ধারণের নাম হলো শোকর। এটা হলো বাতেনী ইবাদতের মহান ফল। শোকর হলো কুফরের বিপরীত বিষয়। আর গালি-গালাজ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার বিপরীত হলো হামদ।

হামদ খুবই সাধারণ এবং সকলের মধ্যেই তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু শোকর বড় দুর্লভ, এটি খুব অল্প লোকই অর্জন করতে পারে। এজন্য আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ -

আমার বান্দাদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অল্পই হয়ে থাকে।

সুতরাং পরিষ্কার জানা যায় যে, হামদ ও শোকর— এ দু'টির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। কারো কোন উত্তম কাজের জন্য যে প্রশংসা করা হয়, তাকেই 'হামদ' বলে। কিন্তু শোকরের বহু অর্থ পাওয়া যায়।

সুতরাং পরিষ্কার জানা যায় যে, হামদ ও শোকর-এ দু'টির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। কারো কোন উত্তম কাজের জন্য যে প্রশংসা করা হয়, তাকেই 'হামদ' বলে। কিন্তু শোকরের বহু অর্থ পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ জাহেরী ও বাতেনী দিক দিয়ে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ইবাদত করার নাম শোকর। আমাদের কোন কোন মাশায়েখের মতও এরই কাছাকছি। তাঁরা বর্ণনা করেছেনঃ জাহেরী ও বাতেনী দিক দিয়ে পুরোপুরি আনুগত্য প্রদর্শনের নামই শোকর। তবে আর একটু বাড়িয়েও বলেছেনঃ জাহেরী ও বাতেনী সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে নিজেকে রক্ষা করাও শোকরের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

অন্য একদল বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী অমান্য করা বা নাফরমানী ইখতিয়ার করা থেকে বিরত থাকার (অন্তর, মুখ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুনাহ্ থেকে বিরত থাকবে এবং কোন প্রকারেই এগুলো থেকে গুনাহ্ প্রকাশ পাবে না) নামই শোকর।

আমাদের শায়খ বলেছেনঃ নিয়ামতদাতার নিয়ামত দানের পরিবর্তে তাঁর সম্পর্কে এমন একটি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করা, যার ফলে কিছুতেই যেন নিয়ামতদাতার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ না পেতে পারে।

বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার শোকরগোযারী ওয়াজিব। কারণ, যে কোন মানুষের উপকারের পরিবর্তেই তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একটি স্বাভাবিক কর্তব্য। তাহলে মহান আল্লাহ্র ক্ষেত্রে এটি বান্দার জন্য অবশ্য কর্তব্য নয় কি?

সারকথা এই যে, শোকর বান্দার সেই শ্রদ্ধাবোধের নাম, যা মানুষকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়া থেকে রক্ষা করে।

নিয়ামতদাতার নিয়ামত দানের জন্য নিয়ামত ভোগকারীর ন্যূনতম কর্তব্য হলো সেই নিয়ামতের দরুন গুনাহ্‌তে লিপ্ত না হওয়া। সেই ব্যক্তি সত্যিই নিকৃষ্টতম, যে দাতার বা উপকারীর দান বা উপকারকে নাফরমানীর মাধ্যম বানায়।

মোটকথা, বান্দার মনে আল্লাহ্ সোবহানাহু তা'আলার প্রতি কতখানি 'আজমত' (শ্রেষ্ঠত্ববোধ) থাকা উচিত, যাতে সকল অবস্থায়ই সব কিছুকে গ্রহণ করা সহজ হয়।

এরপর তোমাকে নেক আমল এবং ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কারণ, নেক আমল ঐ ইবাদত নিয়ামতের হকেরই অন্তর্ভুক্ত। তেমনি গুনাহ্ থেকে বিরত থাকাও নিয়ামতের হক।

এখন আমাদের জানা দরকার- শোকরের মকাম কি? অর্থাৎ কখন শোকরগোযারী করতে হবে?

উপরের বর্ণিত সকল প্রকার নিয়ামতের ক্ষেত্রেই শোকর আদায় করা ওয়াজিব। তবে দুনিয়া, নফস্, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে সংকট, বিপদাপদ ও ক্ষতি— এসব ক্ষেত্রে শোকর ওয়াজিব বা কর্তব্য কিনা, তা একান্তই আলোচনা সাপেক্ষ।

কোন কোন আলিম বলেনঃ এসব ক্ষেত্রে শোকর ওয়াজিব নয়, সবর ওয়াজিব। কারণ, শোকর নিয়ামত ব্যতীত আর কোন ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয় না। আবার কোন সংকট ও বিপদও এমন নেই, যাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত জড়িত না থাকে। এই নিয়ামত-সংশ্লিষ্ট সংকট ও বিপদে শোকর ওয়াজিব।

হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেনঃ আমি যখনই কোন বিপদে পতিত হই, তখনই তার মধ্যে চারটি নিয়ামত প্রত্যক্ষ করি। প্রথমত, বিপদটি ধর্মীয় ব্যাপার হয়নি (ঈমানের ক্ষতি ও দুর্বলতা প্রভৃতি)। দ্বিতীয়ত, এর অধিক বিপদ পতিত হয় নি, তৃতীয়ত, আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য ঘটেনি এবং চতুর্থত, এই বিপদের জন্য সওয়াবের আশা অছে।

অন্যান্য আলিমগণও অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন। আমাদের শায়খ (র) বলেছেনঃ পার্থিব বিপদ-মুসীবতে বান্দার জন্য শোকরগোযারী ওয়াজিব। কারণ,

প্রকৃতপক্ষে এ সকল বিপদ-আপদ নিয়ামতই। কেননা এ সকল বিপদাপদের মধ্যেই বহু উপকার, বহু সওয়াব রয়েছে এবং এসবের দরুনই আখিরাতের বহু রকমের পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য হবে। সুতরাং, এর চাইতে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে?

উদাহরণস্বরূপ মনে করো যে, তোমার যদি কোন রোগ হয়, আর চিকিৎসক তেতো ওষুধ দেন, সে ওষুধ যত তেতোই হোক রোগ সারার জন্য তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, এ তেতো ওষুধের মধ্যেই তোমার আরোগ্য, স্বাস্থ্য ও শান্তি সবকিছুই নিহিত আছে। সুতরাং তেতো ওষুধ প্রকৃতপক্ষে তোমার জন্য মহা নিয়ামত। তেতো ওষুধ দেখে মন খারাপ হয়, নফস ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, যে জোর করে তা খাওয়ায় তার প্রতি মন বিরক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তা তোমার জন্য অপূর্ব শান্তি বহন করে আনে। ঠিক একই অবস্থা এ ক্ষেত্রেও বিপদাপদও মানুষের জন্য অশেষ নিয়ামত বহন করে আনে।

তোমরা কি ভেবে দেখো না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার কিভাবে প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছেন? তিনি তো বিপদ-মুসীবতে রাব্বুল আলামীনের সেই রূপেই শোকর আদায় করেছেন, যেরূপ আদায় করেছেন তিনি স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক অবস্থায়। আরো ভেবে দেখো রাব্বুল আলামীন কি ইরশাদ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ

فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -

তা এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন এক জিনিস অপছন্দ করছো, যার মধ্যে আল্লাহ্ পাক হয়তো মহা উপকার রেখে দিয়েছেন।

আর, তাছাড়া যেহেতু বিপদাপদে ও সংকটে সবর করার ফলে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় সুতরাং এটাই বড় নিয়ামত— যদিও বাহ্যিকভাবে তা বিপদ বলেই প্রতীয়মান হয়।

ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞের মর্যাদা

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ

قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ -

আমার বান্দার মধ্যে শোকরগোযার (কৃতজ্ঞ) ব্যক্তি অল্পই হয়ে থাকে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ধৈর্যশীলের চাইতে কৃতজ্ঞের মর্যাদা বেশী। কারণ, বিশেষের মধ্যেও বিশেষ পর্যায়ে এটি সীমাবদ্ধ। যেমন নূহ (আ)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ

اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا-

সত্যিই সে আমার শোকরগোযার বান্দা ছিল।

এবং ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেছেনঃ

شَاكِرًا لِاَنْعُمِهٖ-

আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতের শোকরগোযার।

এটি হলো নিয়ামত ও পবিত্রতা (মুক্তি) দানের পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই বলা হয়েছে যে, বিপদাবস্থার চাইতে নিয়ামত প্রাপ্তির পরই শোকর আদায় করা আল্লাহ্র নিকট অধিক উত্তম। অতঃপর বান্দা সবর করবে (যদি সে বিপদগ্রস্ত হয়)।

অনেকে বলেছেনঃ ধৈর্যশীলের মর্যাদা কৃতজ্ঞের (শোকরগোযারের) চাইতে বেশী। কারণ, ধৈর্যশীল বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করে। এজন্য তার সওয়াবও বেশী। মর্যাদা বেশী হওয়া তাই স্বাভাবিক। যেমন আল্লাহ্ পাক স্বয়ং ইরশাদ করেনঃ

اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ -

নিশ্চয়ই আমরা তাদের ধৈর্যশীল পেয়েছি। তারা (সত্যিই) উত্তম বান্দা ছিল।

তিনি আরও বলেনঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

ধৈর্যশীলদের — তাদের অসংখ্য সওয়াব দেয়া হবে।

আল্লাহ্ পাক আরও ইরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ -

আল্লাহ্ পাক ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

কৃতজ্ঞ আর ধৈর্যশীল প্রকৃতপক্ষে এক মকাম নয়। উভয়ের মকাম ভিন্ন; তবে উভয় গুণই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি ব্যতীত অন্যটি অর্জন সম্ভব নয়, যথা — কৃতজ্ঞ পরিশ্রম ও ক্লেশের দায়মুক্ত। কারণ, এক্ষেত্রে এমন পরিশ্রম ও ক্লেশ বিদ্যমান থাকে না, যার উপর নিশ্চিত সবর ওয়াজিব। আর তাতে আহাজারী আদৌ থাকে না। কারণ, শোকর (কৃতজ্ঞতা) নিয়ামত দাতার সেই সম্মানের নাম, যাতে তার নাফরমানী প্রকাশই পাবে না। অথচ আহাজারী প্রকৃতপক্ষেই তার নাফরমানী। অপরপক্ষে, ধৈর্যশীলও নিয়ামত থেকে বঞ্চিত নয়। কারণ (আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি) বিপদাপদেও নিয়ামত আছে। এজন্যেই বিপদাপদ সহ্যকারীও প্রকৃতপক্ষে শোকর-গোযার। কারণ সে-ও কেবলমাত্র আল্লাহ্ পাকের সম্মানার্থেই আহাজারী করা থেকে বিরত থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এটাই শোকর। কারণ এটা এমন একটি শ্রদ্ধাবোধ যা গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

অধিকন্তু, কৃতজ্ঞ বা শোকরগোযার নিজ নিয়ামতের কুফরী (নিয়ামত অস্বীকার) থেকে বিরত থাকে এবং গুনাহ্র ব্যাপারে সবর (সংযম) করে। তাছাড়া, নিজের নফসেও শোকরের প্রতি প্রেরণা দেয় এবং নেক কাজে সবর (সে পথের দুঃখ কষ্টে ধৈর্য) করে। তাহলে প্রকৃতপক্ষে এটাই (সাবের) ধৈর্যশীল হয়ে গেল।

তাছাড়া, ধৈর্যশীলের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার 'আজমত' (শ্রেষ্ঠত্ববোধ) বদ্ধমূল থাকে। এমনকি, কেবল এজন্য বিপদ এবং দুঃখ কষ্টে পতিত হলেও আহাজারী এবং শোক-তাপ থেকে নিরাপদ থাকে। এ জিনিসটি তাকে ধৈর্য ধারণের প্রতি প্রেরণা দান করে। অতঃপর সে অল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করে। ফলে, সে প্রকৃত 'শাকের' (কৃতজ্ঞ) হয়ে যায়।

মোটকথা, দুটো এমনি অভিন্ন যে, একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তাই একটি ব্যতীত বান্দা অপরটি লাভ করতে অক্ষম।

সুতরাং, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা উভয়টিই পেতে হবে। তাহলে উভয়টিই পূর্ণাঙ্গ হবে।

কদরদাতাই নিয়ামত লাভের যোগ্য

অতঃপর মানুষকে এই সহজ ঘাঁটিটি অতিক্রম করতে হয়। ঘাঁটিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এটি অতিক্রম করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ ব্যাপারে দুইটি বিষয় সম্যক উপলব্ধি করা দরকার। প্রথমত, নিয়ামত তাকেই দান করা হয়, যে নিয়ামতের কদর বুঝে। দ্বিতীয়ত, কেবল কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই নিয়ামতের কদর বুঝতে সক্ষম।

আমার উপরিউক্ত কথার প্রমাণ আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত ফরমানের মধ্যেই পাওয়া যাবে। তিনি কাফিরদের ঘটনা ও তাদের দাবি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেনঃ

اَهٰـؤُلَاۤءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ -

এরাই নাকি সেই ব্যক্তি, আল্লাহ্ পাক আমাদের মধ্যে যাদের বেশী অনুগ্রহ দেখিয়েছেন? এটা কি সত্য নয় যে, আল্লাহ্ পাক সত্যাবলম্বীদের অধিক জানেন? (সূরা আন 'আম ঃ ৫৩)

এসব কাফিরদের ধারণা ছিল যে, মহান নিয়ামত ও সম্মানিত মর্যাদা তাদেরই দান করা হয়, যারা বংশ–মর্যাদা ও ধন-দওলতের দিক থেকে উচ্চ। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাফিরগণ বলেছিলঃ এ ফকিরগুলোর কি হয়েছে যে, আমাদের ছাড়া (বাদ দিয়ে) তাদের মহা নিয়ামত দেয়া হলো? আল্লাহ্ পাক তাদের এ উক্তির জবাব অতি সূক্ষ্মভাবেই দান করেছেন। অর্থাৎ এর জবাবে তিনি বলে দিলেন যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামত তাদের উপরই অবতীর্ণ করেন, যারা তাঁর নিয়ামতের কদর ও মর্যাদা বুঝে। আর তাঁর নিয়ামতের কদর ও মর্যাদা তারাই বুঝতে সক্ষম, যারা মনে-প্রাণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট, অপর কিছু অপেক্ষা উহাই তাদের নিকট অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং উহা হাসিল করার জন্য যে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়, তাকে তারা পরোয়া করে না। তাছাড়া তারা সর্বদা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র দরজায় স্থিতি থেকে তাঁর প্রতি শোকর করতে থাকে। আমরা জানি, অসহায় বা সম্বলহীন ব্যক্তিরাই এ মহান নিয়ামতের কদর ও মর্যাদা বুঝে থাকে। সুতরাং তোমাদের (বিত্তবান ও বংশ গৌরবে উন্নত) চাইতে তারাই নিয়ামতের অধিক যোগ্য। এ ব্যাপারে বিত্ত, ঐশ্বর্য এবং জাগতিক চাকচিক্য বা বংশ গৌরবের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা নেই।

তোমরা দুনিয়া এবং পার্থিব বংশ-গৌরব ও ঐশ্বর্য বৈভবের উপর সকল ভরসা করে থাকো। আর দীন, ইলম, সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার মারিফত — এ সকল তোমাদের কাছে কিছুই নয়। তোমরা কেবল বড়াইয়ে লিপ্ত এবং পরস্পর ব্যাপৃত কোন্দল ও গৌরব প্রকাশে। একথা কি তোমরা বুঝতে পারো না যে, তোমরাও দীন, ইলম ও সত্যের প্রতি মনোযোগী হতে পারো? কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এদিকে মনোযোগী হয়, তার প্রতি তোমরা করুণার দৃষ্টিতে তাকাও। এর প্রকৃত কারণ এই যে, তোমরা ওসবকে তুচ্ছ মনে করো এবং তজ্জন্য কোনরূপ তোয়াক্কা করো না।

অপরপক্ষে, এসব ফকিররা তো নিজেদের জীবনকেই এজন্য উৎসর্গ করে থাকে এবং নিজেদের সকল প্রচেষ্টা এতেই ব্যয় করে। তাছাড়া এসব হাসিল করতে গিয়ে যদি কোন ক্ষতি হয়ে যায় কিংবা কেউ তাদের শত্রুতা করে, তাতে তারা মোটেই বিচলিত হয় না এবং তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এরাই সেই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর মহান নিয়ামতের মূল্য উপলব্ধি করেছে— তারাই বুঝতে পেরেছে তাঁর কদর। এদের অন্তরেই এ মহান নিয়ামতের শৌর্য স্থান করে নিয়েছে। সুতরাং এ নিয়ামতের মুকাবিলায় যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার তাদের জন্য অতি সহজ হয়ে গেছে। সুতরাং এ পথে আগত সকল বিপদ-মুসীবত ও দুঃখ-ক্লেশ সহ্য করা তাদের জন্য খুবই সহজ। তাই এসব লোক সারাজীবন ধরে আল্লাহ্র শোকরগোযারীতে ব্যাপৃত থাকে। এ কারণেই তারা এমন মহান জ্ঞানের এবং এমন মহান নিয়ামতের যোগ্য হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা তোমাদের ছেড়ে তাদের ন্যায় সহায়-সম্বলহীন এবং বংশ-গৌরব নিষ্প্রভ ফকিরকেই এ ফযীলতে ভূষিত করেছি।

এই একই অবস্থা সেই সব প্রত্যেক দলের, যারা দীনের নিয়ামতের মধ্যে ইলম ও আমল উভয়টিতেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বস্তুত, তুমি যদি সন্ধান করো, তবে এ দলের মানুষের সন্ধান পাবে। দেখবে, তারা ইলম ও আমলকে এমনভাবে আঁকড়ে আছে যে, সমস্ত শক্তি তাতেই নিয়োজিত। কারণ, তারাই এর মর্যাদা অধিক বোঝে এবং সম্মান জানে। তারা এটি লাভ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং এই নিয়ামতের মর্যাদা ও সম্মানার্থে আল্লাহর দরবারে শোকরগোযারীতে থাকে সর্বদা সক্রিয়।

আর আল্লাহ্ তা'আলা উপরিউক্ত মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন সেসব লোককে, যাদের অন্তরে তৎপ্রতি মর্যাদাবোধ ও সম্মান নেই। যদি ইলম ও ইবাদতের প্রতি সম্মান সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ও ব্যবসায়ীদের অন্তরে আলিম ও আবিদদের মতোই হতো, তাহলে তারা ইলম ও ইবাদতের চাইতে ব্যবসাকে অগ্রাধিকার দিতে পারতো না। তাহলে তাদের পক্ষে ব্যবসাকে পরিত্যাগ করা সহজ হয়ে যেতো।

তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, কোন ফকির এমন কোন একটি বিষয় সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, যে বিষয়ে তার মনে সন্দেহ ছিল, তখন তার অন্তর কিরূপ প্রশান্তিতে ভরে উঠে। খুশী ও আনন্দের তার সীমা থাকে না। এমন আনন্দ হয় যে, এক হাজার দিনার পেলেও তার সে আনন্দ হতো না।

অনেক সময় তো এমন হয় যে, কোন একটি দীনী মাসআলার সমাধান করতে কারো কারো দশ বছর কিংবা বিশ বছর কেটে যায়। কিন্তু শত বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ ক্লেশ ও পরিশ্রম তাকে কিছুতেই তা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় না। বরং, এই অবস্থায় আল্লাহ্ পাক যদি তাকে সে মাসআলা উপলব্ধি বা বুঝবার ক্ষমতা দান করেন, তবে তিনি এটাকে আল্লাহ্র মস্তবড় ইহসান মনে করেন। শুধু তাই নয়, এ নিয়ামত প্রাপ্তিকে তিনি সকল প্রকার মাল-দওলত ও ঐশ্বর্যের চাইতেও অধিকতর মূল্যবান মনে করেন। সকল প্রকার অভিজাত্য ও বুযুর্গীর চাইতে এ নিয়ামত প্রাপ্তিকেই তিনি বড় মনে করেন। অনেক সময় এমনও হয় যে, তাঁর বিশ বছরের সাধনায় প্রাপ্ত দীনী মাসআলাটি হয়তো তিনি ইলমের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও ভালবাসা প্রকাশার্থে কোন ব্যবসায়ী বা শিথিল ইলম সন্ধানীর নিকট ব্যক্ত করলে সে তা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনতেও রাযী হয় না। এমনকি আলোচনা দীর্ঘ করলে দুঃখিত হয় কিংবা চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসে। যদি কোন মাসআলা বিশ্লেষণ পূর্বক বয়ান করতে যায়, তাহলেও তারা এসব মওলভী সাহেবদের প্রতি মনোযোগ দিতে চায় না। এমনিভাবে, এ শ্রেণীর লোক বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি উৎসর্গিত থাকে। এমনিভাবেই তারা সংগ্রাম করে চলে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের সাথে আর অতিক্রম করতে থাকে কৃচ্ছ্র সাধনার কঠিন মকাম। তারা নফসকে প্রবৃত্তি-কামনা ও লালসা থেকে বিরত রাখে সর্বদা। আল্লাহ্ পাক যাতে করে

দু'রাকাত নামায পবিত্রতা ও সকল আদবের সাথে আদায় করার তওফীক দান করেন, এজন্য তারা সকল আহকাম-আরকাম পূত-পবিত্র মনে পালন করে চলে। কতই না আহাজারী করে তারা এজন্য। আল্লাহ্‌র সামনে তারা আহাজারী করে, যাতে করে আল্লাহ্ পাক একটি মুহূর্তের জন্য পবিত্রতা, একাগ্রতা ও অমলিনতার সাথে তাঁর দরবারে মুনাজাত করার তওফীক দান করেন। অতঃপর যদি এক মাসের জন্য, এক বছরের জন্য বা সারা জীবনব্যাপী তাদের এ তওফীক হাসিল হয়ে যায়, তাহলে তারা তাকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, সবচাইতে বড় নিয়ামত বলে গণ্য করে। এতে তাদের যে আনন্দ ও শান্তি লাভ হয়, তা অনির্বচনীয়। অতঃপর তারা এজন্য করে আল্লাহ্‌র শোকর-গোযারী। এ পথে তাদের যেসব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়, যত বিপদ-আপদ ও দুঃখ 'ক্লেশ সইতে হয় এবং রাতের অনিদ্রা ও দিনের ক্লেশ বরণ এবং লালসা ও কামনার সবকিছুকে বর্জনের যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, এ সবকিছুকে তারা আদৌ পরোয়া করে না। এমন অমূল্য নিয়ামত হাসিলের পর ওসব তাদের কাছে তুচ্ছ জ্ঞান হয়।

এরপর সে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, যার সম্পর্কে ধারণা হবে যে, ইবাদতে তার আকর্ষণ এবং আকাঙ্ক্ষা আছে। তখন তুমি চেষ্টা করবে যে, তার যেন ইবাদতের মকাম হাসিল হয়ে যায় — এই চেষ্টা করতে গিয়ে যদি তোমার সন্ধ্যার খাবার একটু কমও হয় কিংবা বাজে কথা যদি একটু পরিত্যাগও করতে হয় অথবা কোন এক আরামের সময়ও যদি চলে যায়। কিন্তু সেই ব্যক্তি সূফী সাহেবের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নিজের নফসকে উদার করবে না এবং তার অন্তর এ কারণে আনন্দিতও হবে না।

আর যদি বা কখনো হঠাৎ ইবাদতের এই মকাম হাসিল হয়েও যায়, তবুও তাকে মহান কিছু একটা মনে করবে না এবং এজন্য রাব্বুল আলামীনের শোকর-গোযারীও করবে না।

এ ধরনের লোকদের তো আনন্দ হয় তখন, যখন তারা একটি দিরহাম পায় কিংবা রুটির একটি টুকরা লাভ হয়, শান্তি ও নিরাপদে থাকে কিংবা শরীর কোন প্রকার কষ্ট থেকে থাকে নিরাপদ — এই সময় তারা বলেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ –

- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য— এ তো লাভ হয়েছে আমার সেই প্রভুর করুণায়।

এবার একটু ভেবে দেখুন, সেই সব সম্মানিত সূক্ষ্মদর্শী উলামা ও সূফীদের সাথে এই ধরনের কৃতজ্ঞ মানুষের কি করে তুলনা হতে পারে? এজন্যই তাঁরা উত্তম ও নেক বিষয় লাভের ব্যাপারে অমন সাফল্যমণ্ডিত, আর এরা সকল উত্তম ও নেক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

আল্লাহ্ পাক এভাবেই সবকিছু বিতরণ করেন। কারণ, তিনি সব ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচারক।

মোটকথা, - اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ আল্লাহ্‌র এই ফরমানের ব্যাখারই এতক্ষণ আলোচনা করা হলো। বিষয়টিকে গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত এবং এর সকল দিক বাস্তবায়িত করা দরকার।

অতঃপর স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, নফ্‌সের কোন একটি কারণ ব্যতীত কারো পক্ষে উত্তম ও নেক থেকে বঞ্চিত থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং, আল্লাহ্ পাকের নিয়ামতসমূহের কদর ও মূল্য অনুধাবনের চেষ্টা করো এবং তৎপ্রতি যথাযোগ্য সম্মান করো— যাতে করে তুমি তার আবদালের যোগ্য হতে পারো এবং যাতে করে প্রথমে যেমন নিয়ামত দিয়েছেন, তা যেন স্থায়ী এবং অব্যাহত রাখেন।

নিয়ামত কেড়ে নেয়া

দ্বিতীয়ত, যারা নিয়ামতের কদর করে না কিংবা মূল্য অনুধাবন করে না, তাদের নিকট থেকে নিয়ামত কেড়ে নেয়া হয়। যারা নিয়ামতে নাশোকরী করে, তারাই প্রকৃতপক্ষে কৃতঘ্ন, এরা নিয়ামতের শোকর আদায় করে না। আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ -

এবং সেই সব লোককে তাদের অবস্থা বর্ণনা করে শোনাও, যাদের আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তা থেকে সম্পূর্ণ বের

হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর শয়তান তাদের পেছনে লেগে ছিল। ফলে তারা অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে পথভ্রষ্টদের। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭৫)

উপরিউক্ত পবিত্র কালামের ব্যাখ্যা এই যে, আমরা সেই বান্দাদের মহান নিয়ামত এবং দীনের ব্যাপারে সুমহান অবদান দিয়ে থাকি, যাতে তারা উক্ত মকাম ও সুমহান জীবনের অধিকারী হতে পারে এবং নিজের মধ্যে এমন ক্ষমতা ও শক্তির সঞ্চার করে, যাতে তারা সহজেই আমার দরবারে উঁচু মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা আমার এই মহান নিয়ামতের কদরদানী না করে তৎপ্রতি বেখেয়াল হয়ে এই জঘন্য এবং পংকিল দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর অগ্রাধিকার দেয় সেই মহান মর্যাদার পরিবর্তে নিজ প্রবৃত্তির কামনাকে। আহা! যদি তারা জানতে পারতো যে, সমস্ত দুনিয়া দিনের এক সামান্যতমও নিয়ামতের তুল্য হতে পারে না এবং সারা দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ্র কাছে একটি মাছি কিংবা তুচ্ছ কোন পদার্থের সমানও নয়।

নাউজুবিল্লাহ্! তাহলে সেই ব্যক্তির তুলনা কেবল সেই নীচাশয়ের সঙ্গেই হয়, যে সম্মান ও শান্তিকে অসম্মান ও কষ্টের উপর অগ্রাধিকার দেয় না এবং মর্যাদা ও ইয্যতকে যে অবজ্ঞা ও হীনতার তুলনায় কিছু মনে করে না। কুকুরের নিকট একটি রুটির টুকরাই সবকিছু, আহার্যই তার সবকিছু। কিছু খেতে পেলেই হলো। সে খাদ্য দস্তরখানা ঝাড়া খাদ্যই হোক আর নীচে মাটিতে তার সামনে ফেলেই দেয়া হোক। মোটকথা, কুকুরের নিকট সকল বুযুর্গী এবং সম্মান এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তেমনি দুর্ভাগ্য এ ধরনের মানুষেরও, যারা আমাদের নিয়ামতের কদরদানী করে না এবং আমাদের দানকৃত বস্তুর হক উপলব্ধি করে না, পরিণামে তাদের সূক্ষ্মদর্শিতা বিলোপ হয়ে যায়। অপরপক্ষে আমাদের ব্যতীত অপরের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে এবং অবজ্ঞেয় ও হীন দুনিয়ায় আমাদের নিয়ামতের আলোচনায় লিপ্ত হওয়ায় তারা ঔদ্ধত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন আমরা তাদের প্রতি বিচারকের দৃষ্টিতে তাকাই এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে উপস্থিত করি। অতঃপর জবরদস্তির (জাবারুতের) নির্দেশ মারফত সমস্ত নিয়ামত ও সমস্ত সম্মান কেড়ে নেয়া হয়। আর তার অন্তঃকরণ থেকে কেড়ে নেয়া হয় মারিফতের আলো। এভাবে সে হয়ে পড়ে সকল অনুগ্রহ, সম্মান ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। সে হয়ে যায় অভিশপ্ত কুকুর, বিতাড়িত শয়তানের ন্যায়।

আমরা আল্লাহ্র দরবারে এ ধরনের কষ্টদায়ক ও অসম্মানজনক অবস্থা থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি। আমীন!

এবার একটি বাদশাহ্র উদাহরণ গ্রহণ করুন। ধরুন, বাদশাহ্ তাঁর কোন গোলামকে সম্মান করতেন। তাঁর বিশেষ পোশাক তাকে দান করতেন এবং সর্বদা তাকে কাছে রাখতেন। এমনকি সকল খাদিম ও দারোয়ানের উপরে তার স্থান দিতেন। এভাবে তিনি তাকে নিযুক্ত করলেন নিজের দরজার পাহারায়।

এরপর বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেন, এই গোলামের জন্য অমুক জায়গায় সৌধ নির্মাণ করা হোক। সেই সৌধের খানার টেবিলগুলো সুসজ্জিত করা হোক সুন্দর সুন্দর দস্তরখানা দিয়ে এবং দাসীদের দ্বারা জাঁকজমক করে সাজানো হোক— দরজায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হোক গোলামদের। অতঃপর যখন সে এই খিদমত থেকে অবসর হবে, তখন তাকে একজন সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহ্ বানিয়ে সেখানে বসিয়ে দেয়া হবে। তাঁর এ খিদমত (বাদশাহ্র বিশেষ দরজায় পাহারা) ও বাদশাহী লাভের মধ্যে পার্থক্য শুধু একটি দিনের সমান সময়। এখন উপরিউক্ত গোলামটি যদি বাদশাহ্র সেই বিশেষ দরজা থেকে সেসব জানোয়ারের দিকে চেয়ে থাকে, যেগুলো রুটি কিংবা অন্য কিছু খাচ্ছে অথবা সেই কুকুরের দিকে চেয়ে থাকে যে কুকুর হাড্ডি চাটছে। এভাবে সে যদি বাদশাহ্ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালনের কথা ভুলে যায়, তাঁর সমস্ত অবদান ও সম্মানের কথা খেয়াল না করে এবং জানোয়ারদের প্রতি হাত বাড়িয়ে খাদ্য ভিক্ষা করে কিংবা কুকুরের সাথে হাড্ডি চাটার কাজে লেগে যায়, তাহলে বাদশাহ্ যখন তার এ অবস্থা দেখবেন তখন তিনি বলবেন বেওকুফ, নাদান! আমার সম্মান ও কারামতের হক জানতে পারলি না, আমার দান ও নিয়ামতের কদর বুঝতে পারলি না? আমি তোকে কত সম্মান ও নিয়ামত দিতাম— কত রঙ-বেরঙের পুরস্কারে তোকে সজ্জিত করতাম, কিন্তু তুই তার কোন মূল্য বুঝলি না। তুই একেবারেই দুর্বলচিত্ত, অজ্ঞ এবং বেআদব। অতঃপর বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেনঃ এর থেকে আমার সম্মানের ভূষণ খুলে নাও এবং আমার দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও।

ঠিক এই অবস্থাটিই হয় এই আলিমের, যে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সেই সব ইবাদত-গোযার ও দীনদার ব্যক্তির, যাকে ইবাদত ও শরীয়তের আহকাম-আরকান পালনের ফলে সম্মানে বিভূষিত করার পর আবার সে প্রবৃত্তির

দাসে পরিণত হয়। তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ অপেক্ষা তুচ্ছ ও হেয় জিনিসই মূল্যবান হয়ে গেলো। এভাবেই তারা নিজেও তুচ্ছ হতে তুচ্ছ, অবজ্ঞেয় হতে অবজ্ঞেয় হয়ে পড়ে। ফলে, তারা পার্থিব ব্যাপারে হয়ে পড়ে ব্যাপৃত। অথচ আল্লাহ্ তাদের দান করেছিলেন ইলম ও ইবাদতের ন্যায় মহান নিয়ামত।

আর ঠিক একই অবস্থা তারও, যাকে আল্লাহ্ পাক তাঁর তওফীক, খিদমত ও পবিত্রতার নূরে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন ও বিশেষ মর্যাদাবান করে তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান, ফেরেশতাদের নিকট তাকে নিয়ে গৌরব করেন এবং আপন দরজায় মহিমান্বিত করে নেতার স্থান দিয়েছেন এবং তাঁর নিকট শাফা'আত করার সম্মানেও বিভূষিত করেছেন। অপরপক্ষে সে যদি আল্লাহ্কে ডাকে, আল্লাহ্ তার ডাকে সাড়া দেন, যদি কিছু চায়, আল্লাহ্ পাক তা দান করেন, সে যদি সমস্ত পৃথিবীর সবকিছুর জন্য শাফা'আত করে, তবে তাও কবূল করেন, যাতে করে সে সন্তুষ্ট হয়। কোন জিনিসের ধারণা যদি তার মনে আসে, বিনা যাঞ্চাতেই আল্লাহ্ তাকে তা দিয়ে থাকেন। এমনকি, সে যদি কোন ব্যাপারে কসম করে বসে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার কসম পুরা করে দেন। সুতরাং এমতাবস্থায় পৌঁছবার পর যদি আবার সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র এ সব নিয়ামত ও সম্মানের মূল্য উপলব্ধি না করে এবং সেই মহান মর্যাদার প্রতি খেয়াল না করে নফসের সেই সব তুচ্ছ কামনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেগুলো স্থায়ী নয়। কিংবা যদি এই হীন দুনিয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, যে দুনিয়া একেবারেই অস্থায়ী। অপরপক্ষে, সে যদি ভুলে যায় সেই সব ওয়াদার কথা, যা আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতের জন্য দিয়ে রেখেছেন, তাহলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, এই লোক কত নীচুতে নেমে গেছে। কত হীন হয়ে গেছে তার মন। এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, কিভাবে এত উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আবার কেমন জঘন্য পর্যায়ে নেমে আসতে পারে। আল্লাহ্র নিকট আমাদের আরয এই যে, তিনি যেন তাঁর অনুগ্রহ ও করুণায় আমাদের আমল ও অবস্থাকে ঠিক রাখেন।

হে মানুষ! আল্লাহ্র নিয়ামতের কদর ও মরতবা উপলব্ধির জন্য নিজের সকল প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আর যেহেতু তোমাকে আল্লাহ্র পাক দীনের নিয়ামতে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন, সেইহেতু দুনিয়ার চাকচিক্য ও ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করাই তোমার কর্তব্য। কারণ, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার মধ্যে কেবল অপমান ও দুর্দশা, কেবল ক্লেশ ও যন্ত্রণা। আল্লাহ্ তোমাকে দীনের

নিয়ামতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করা সত্ত্বেও কি তুমি এ তুচ্ছ ও অবজ্ঞেয় দুনিয়ার প্রতি মনোযোগী হবে? তোমরা কি আল্লাহর এ বাণী শোননি, যখন সাইয়্যেদুল মুরসালীনকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ -

> আমি আপনাকে সাতটি নিদর্শন দান করেছি, যা নামাযে বারবার আবৃত্তি করা হয়, আরও দান করেছি মহান কুরআন। আপনি আপনার চক্ষু তুলেও কখনো সে জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখবেন না, যা আমি বিভিন্ন রকমের কাফিরদের অবলম্বন হিসেবে দিয়েছি। (সূর হিজর ঃ ৮৭)

মর্মার্থ এই যে, যে ব্যক্তিকে কুরআনের ন্যায় মহান নিয়ামতের অধিকারী করা হয়েছে, তার পক্ষে কিছুতেই উচিত হবে না, এই তুচ্ছ ও অবজ্ঞেয় দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। দুনিয়ার প্রতি তো কোন প্রকার লোভ-লালসা রাখবেই না, পরন্তু উপরিউক্ত মহান নিয়ামত দানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করতে থাকবে। কারণ, এটি সেই সম্মান ও মর্যাদা, যা হযরত ইবরাহীম (আ)-ও কামনা করেছিলেন। তিনি কামনা করেছিলেন যেন তাঁর পিতা এ নিয়ামত লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সে কামনা পূরণ হয়নি। তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা)-ও কামনা করেছিলেন যেন এ নিয়ামত (দীন) তাঁর চাচা আবূ তালিব লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর সে কামনা পূরণ হয়নি। অপরপক্ষে, দুনিয়ার মালামাল তো প্রত্যেক কাফির, ফিরাউন, ধর্মদ্রোহী, যিন্দিক, ফাসিক, ফাজির প্রভৃতির লাভ হয়। মোটকথা, দুনিয়ার মালমাত্তা দুনিয়ার হীনতম শ্রেণীর লোকদেরই হাসিল হয়, যাতে তারা তাতেই মত্ত হয়ে যায়। অপরপক্ষে নবী, সিদ্দিক, সূফী ও আলিম, যাঁরা সৃষ্টির সেরা ও সম্মানিত, তাঁদের রাখা হয় দুনিয়ার মালমাত্তা থেকে দূরে। ফলে এঁরা কখনো তাতে মত্ত হয়ে যান না। তাই তাঁরা দুনিয়ার এ পুঁতি-গন্ধময়তা ও ক্লেদ থেকে থাকেন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরাপদ।

এ বিষয়টি আল্লাহ্ পাক হযরত মুসা (আ) ও হযরত হারুন (আ) কে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ 'যদি তোমরা চাও, তবে তোমাদের জন্য এমন

চাকচিক্য ও ঐশ্বর্যের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যা দেখে ফিরাউন মনে করে যে, এসব জিনিস আমার কুদরতের বাইরে। কিন্তু দুনিয়ার লালসা ও আকর্ষণ থেকে আমি তোমাদের দূরে রাখতে চাই।'

আল্লাহ্ বলেন, ঠিক এ কার্যই আমি আমার আউলিয়াদের সাথে করে থাকি। আর সেসব নিয়ামতকে আমি তোমাদের জন্য স্তূপীকৃত করে রাখি, যেমন দয়ার্দ্র রাখাল তার উটের জন্য ঘাস ও অন্যান্য খাদ্য প্রস্তুত করে রাখে।

অপরপক্ষে, আমি আমার আউলিয়াদের পার্থিব আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দূরে রাখি। এ কাজটি আমার জন্য আদৌ অসুবিধার নয়। শুধু এ কারণে এমন করি যে, আমার কারামত ও বুযুর্গীসমূহ তাদের উপর পরিপূর্ণতা লাভ করুক — সবকিছু পূর্ণভাবে দান করি। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَ لَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّ احِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ

بِالرَّ حْمٰنِ لِبُيُو تِهِمْ سُقُفاً مِّنْ فِضَّةٍ –

যদি না এ ব্যাপারে আশা করা যেতো যে, সমস্ত মানব জাতি একই পদ্ধতির হবে, তাহলে যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে, তাদের গৃহের ছাদকে রৌপ্য দিয়ে বানিয়ে দিতাম। (সূরা যুখরুফঃ ৩৩)

এর মধ্যে অনুভূতিশীল মানুষের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। আর বলে দাও যে, সমস্ত প্রশংসা সেই পাক জাতের জন্য, যিনি আমাদের আউলিয়া এবং সূফীর নিয়ামত সম্পন্ন হওয়ার গৌরব দান করেছেন। আর দূরে রেখেছেন আমাদের দুশমনদের (শয়তান, দুনিয়া ও প্রবৃত্তি) থেকে আমাদের, যাতে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি। তাছাড়া তিনি আমাদের ইসলাম দান করে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন, সেই মহা নিয়ামত, মহান গৌরবের শুকরিয়া আদায়েই তোমার দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত করা উচিত। কিন্তু যদি তুমি এর কদর ও মরতবা অনুধাবনে অক্ষম হও, তাহলে অন্তত এতটুকু মনে রেখো যে, তোমাকে যদি পৃথিবীর প্রথম দিনই সৃষ্টি করা হতো আর সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যদি তুমি ইসলাম সম্পদের শুকরিয়া আদায় করতে, তাহলে তার হক আদায় করতে সক্ষম হতে না। অথচ তুমি এর একাংশ হক আদায় করছো, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কত নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যে কত নিয়ামত দান

করেছেন, তা বর্ণনা করাও আমার সাধ্যের অতীত। এ নিয়ামত বর্ণনা করতে গিয়ে যদি আমি এক লক্ষ পৃষ্ঠাও লিখে ফেলি, তথাপি আমার জানা যত নিয়ামত আছে তার-ই শেষ হবে না। অথচ আমি যা জানি তা প্রকৃত পক্ষে সারা পৃথিবী সাগরময় হলে তা থেকে এক কাতরা পানি নেওয়ার ন্যায়ই। পরিতাপের বিষয়, আল্লাহ্ পাক সাইয়্যেদুল মুরসালীনকে লক্ষ্য করে যা বলেছেন, তা তোমরা স্মরণ করছো না। তিনি বলেছেনঃ

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَاالْكِتَابُ وَلاَ الْاِيْمَانُ -

তোমার জানা ছিল না যে, কিতাবুল্লাহ্ কি বস্তু, না তোমার জানা ছিল ঈমানের চূড়ান্ত পর্যায় কোনটি (কোন্ বস্তু)। (সূরা শূরাঃ ৫২)

অবশেষে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলে দিয়েছেনঃ

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا -

এবং আপনাকে সেই সেই কথা বাতলিয়ে দিয়েছি, যা আপনি জানতেন না, আর আপনার উপর রয়েছে আল্লাহ্র মহান করুণা। (সূরা নিসাঃ ১১৩)

অতঃপর আল্লাহ্ পাক কোন এক জাতি সম্পর্কে বলেনঃ

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ -

বরং আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেন যে, তোমাদের ঈমানের তওফীক দান করেছেন। (সূরা হুজুরাতঃ ১৭)

আর তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফরমান কি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না? তিনি কোন এক ব্যক্তিকে ইসলামের গৌরবে (অর্থাৎ ইসলাম লাভের গৌরব) আল্লাহ্র প্রশংসা করতে শুনতে পেয়ে বলেছিলেনঃ তুমি আজীমুশ্‌শান নিয়ামতের বদলে আল্লাহ্র প্রশংসা করছো।

সত্যি ইসলাম কি অপূর্ব নিয়ামত। আর তাছাড়া, হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালাম যখন সুসংবাদদাতাকে জিজ্ঞাস করেছিলেনঃ কি জিনিসের উপর রেখে আসলে? সুসংবাদদাতা জবাব দিয়েছিলেনঃ ইসলাম সম্পদের উপর। একথা শুনে

হযরত ইয়াকূব (আ) বলেছিলেনঃ তাহলে এখন নিয়ামত পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে।

বর্ণিত আছেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ هَدَانَا اِلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ -

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাদের নিয়ামতের অধিকারী করেছেন এবং দীন ইসলামের দিকে হিদায়েত করেছেন।

উপরিউক্ত কলেমার চাইতে আল্লাহ্র নিকট প্রিয় আর কিছু নেই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও এর চাইতে অধিক উত্তম পন্থা কিছুই নেই।

ইসলামের জন্য শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারে গাফলতি করা থেকে সাবধান হওয়া উচিত। ইসলাম, মারিফত, ইবাদতে ইলাহী ও পবিত্রতা অর্জনের তওফীক হাসিলের অবস্থা প্রাপ্তির পর ধোঁকায় নিপতিত হওয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। কারণ, এই নিয়ামতসমূহ পাওয়ার পর আলস্য ও উদাসীনতা বা অসাবধানতা অবলম্বন করার কোন অবকাশ নেই। মনে রাখবে, সকল কাজের ভাল-মন্দ তার পরিণামের উপরই নির্ভরশীল।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলতেনঃ যে ব্যক্তি দীনের ব্যাপারে নির্লিপ্ততা বা অসাবধানতা অবলম্বন করে, তার নিকট থেকে 'দীন' কেড়ে নেয়া হয়। আমাদের শায়খ (র) বলতেনঃ যখন কাফিরদের সম্পর্কে তাদের দোযখে অবস্থানের বর্ণনা শুনবে, তখন নিজের নফসের ব্যাপারে নির্বিকার এবং নির্লিপ্ত থেকো না। কারণ, ব্যাপার বড়ই ভয়াবহ। তাছাড়া তুমি অবশ্যই জান না যে, কোন্ বিষয়ে মুক্তি ও শান্তি-নিরাপত্তা নিহিত আছে? কিংবা ইলমে গায়েবে তোমার সম্পর্কে কোন্ নির্দেশ জারী হয়ে আছে, তাও তুমি জানো না। মধুর সময় নিয়ে ধোঁকায় পতিত হয়ো না। কারণ, উহার বক্ষপুটে লুক্কায়িত থাকে সমূহ বিপদাপদ।

কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেনঃ ওহে নিরাপত্তা ও পবিত্রতা প্রাপ্তিতে ধোঁকায় পতিত হওয়ার দল! মনে রেখো, এতে বিপদাপদ লুক্কায়িত আছে। আল্লাহ্ পাক ইবলিসকে আপন পবিত্রতায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিলেন, কিন্তু সে-ই ছিল প্রকৃতপক্ষে লা'নতের উপযুক্ত। আর বাবা আদমকে আপন প্রতিনিধিত্বের আলোকে আলোকিত করেছিলেন, কিন্তু তাই ছিল তাঁর নিকট প্রকৃত দুশমন।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেনঃ ইহসানের পরিপ্রেক্ষিতে কত লোকই না ধোঁকায় নিপতিত, তার উত্তম কথা বলার সাথে কতই না লোক ফিতনায় লিপ্ত এবং অবস্থার অদৃশ্যমানতার পরিপ্রেক্ষিতে কত মানুষই তো ক্ষতিতে ব্যাপৃত।

যিন্নুন মিসরীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ মানুষ কোন্ বিষয়ে সবচাইতে বেশী ধোঁকায় নিপতিত হয়? তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ অনুগ্রহ ও কারামত লাভের কারণে।

এ বিষয় প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُوْنَ -

আমি তাদের ক্রমে ক্রমে নিয়ে যাচ্ছি এমনভাবে যে, তারা তা টেরও পাচ্ছে না। (সূরা কলমঃ ৪৪)

মারিফতপন্থিগণ বলেছেনঃ নিয়ামতের প্রাচুর্য আনয়ন করে—এমন বিষয় লাভ করার পর পরই আমরা তার শুকরিয়া আদায়ের বিষয়টি ভুলে যাই।

কোন এক কবি বলেছেনঃ 'সুখের দিন দেখে তুমি আনন্দিত হও, কিন্তু তকদীরের পরিপ্রেক্ষিতে তাতে যে অনিষ্ট লুক্কায়িত থাকে, সে সম্পর্কে তুমি অবশ্যই সতর্ক থাকো না। তেমনি রাতের স্বচ্ছতায় তুমি ধোঁকায় নিপতিত হয়ে থাকো, অথচ প্রকৃতপক্ষে, রাতের স্বচ্ছতার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে মলিনতা'।

মোটকথা, একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, যতই নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা লাভ করতে থাকবে, ততই জটিলতা ও আশঙ্কা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ব্যাপারটি ভয়াবহ এবং সূক্ষ্ম আকার ধারণ করবে। এতে বিপদাপদের আশংকা অত্যধিক। কারণ, যখন কোন বিষয় পূর্ণতার পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তাতে পরিবর্তন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। যেমন বলা হয়েছে যে, এমন কোন উড়ন্ত পাখী নেই, যে তার সীমা অতিক্রম করলে পড়ে না যায়। অবশ্যই তা পড়ে যায়। সুতরাং এমতাবস্থায় ভয়হীনতা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা বা এ ব্যাপারে অসতর্কতা অবলম্বন এবং এ অবস্থায় স্থিতিশীলতা অর্জনের (অবস্থাটি অব্যাহত রাখার জন্য) ব্যাপারে চেষ্টা তদবীর পরিত্যাগের কোন উপায় নেই।

ইবরাহীম আদহাম (র) বলতেনঃ কি করে তোমরা ভয়হীনতা অবলম্বন করছো, যখন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) বলেছেনঃ

وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَ صْنَامَ -

আমাকে এবং আমার খাস বংশধরগণকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করো।

(সূরা ইবরাহীমঃ ৩৫)

এবং হযরত ইউসুফ (আ) বলেছেনঃ

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا

মুসলমানরূপে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে দাও।

সুফিয়ান সওরী (র) সব সময়ই বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ -

হে আল্লাহ্! নিরাপদ রাখো এবং নিরাপত্তা দাও।

তাঁর এই মুনাজাত এত সার্বক্ষণিক ছিল যে, মনে হতো যেন তিনি একটি নৌকার আরোহী, যে নৌকাটি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আমি জানতে পেরেছি, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ (র) বলেছেন যে, সুফিয়ান সওরী (র) একদা সারা রাত চিন্তায় চিন্তায়ই কাটালেন। অতঃপর কাঁদতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললামঃ গুনাহ্ মাফের জন্যই কি এরূপ আহাজারী করছেন? তিনি তখন দৃষ্টি উঠিয়ে বললেনঃ গুনাহ্ মাফ করা তো আল্লাহ্র পক্ষে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। কিন্তু আমি তো এ ব্যাপারে ভয় করছি (আল্লাহ্ এমন না করুন) যে, আল্লাহ্ পাক না আমার নিকট থেকে ইসলাম রত্নই কেড়ে নেন।

হে মানুষ! সাবধানতা অবলম্বন করো। এটি সতর্কতার মকাম। শুকর-গোযারীকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো। দীনের নিয়ামতের জন্য আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করো। এই দীনের নিয়ামতের মধ্যে সবচাইতে মূল্যবান নিয়ামত হলো ইসলাম ও আল্লাহ্র মারিফত। আর তার নিম্নস্তরের নিয়ামত হলো, আল্লাহ্র তসবীহ পাঠের তওফীক এবং অপকাজ থেকে রক্ষা পাওয়া।

আমরা আশা করি, আল্লাহ্ পাক যেন আমাদের উপর তাঁর নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দেন এবং এ সব নিয়ামত কেড়ে নেয়ার দুর্দশা থেকে নিরাপদ রাখেন। কারণ, সম্মানের পর অসম্মান, নৈকট্যের পর দূরে রাখা এবং মিলনের পরে বিচ্ছেদ সবচাইতে মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক।

বিশেষ কথা

আল্লাহ্ তা'আলার আজীমুশ্‌শান নিয়ামত এবং তাঁর সেই সব সম্মানজনক তওফীকসমূহের বিষয় একবার গভীরভাবে ভেবে দেখো, যা তোমার সামনে বিদ্যমান। অথচ তোমার বিবেকে যা ধরতে এবং তোমার কল্পনাশক্তি যা আয়ত্তে আনতে পারে না। এইভাবে এই ভীতিপূর্ণ ঘাঁটিটিও অতিক্রম করে নেবে। এরপর জ্ঞান ও দুরদর্শিতা লাভ এবং মন্দ ও পংকিলতা থেকে পবিত্রতা হাসিল করতে সক্ষম হবে। সমস্ত প্রকার অপকাজ ও দুশ্চিন্তা থেকে তুমি পাবে মুক্তি। এইভাবে দোয়ার ব্যাপারে লাভ করবে সাফল্য এবং সকল প্রকার ধ্বংসকারী জিনিস থেকে পাবে মুক্তি ও নিরাপত্তা।

এখন চিন্তা করে দেখো, তাহলে কিরূপ আজীমুশ্‌শান বৈশিষ্ট্য এবং কেমনতরো উচ্চ মর্যাদা হাসিল হবে, যার শুরু হবে চাক্ষুষ জ্ঞান ও মারিফতের মাধ্যমে আর তার সমাপ্তি ঘটবে আভিজাত্য ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে। সুতরাং বিষয়টি নিজের বিবেকানুযায়ী চিন্তা করে দেখা উচিত এবং সাধ্যের অতিরিক্ত শোকর আদায় করার চেষ্টা করা কর্তব্য, যাতে করে তোমার জবানে যেন সর্বদা উচ্চারিত হয় কেবল আল্লাহ্‌রই প্রশংসা ও গুণকীর্তন, তোমার অন্তরে জাগ্রত থাকে সর্বদা তাঁরই মহানত্ব ও বিরাটত্বের ছবি এবং যাতে তুমি এমন মকাম হাসিল করো যে, গুনাহ্ও তোমার মধ্যে তা প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে, তোমার নেকী যেন তোমাকে তোমার সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌র ইবাদতে প্রেরণা যোগায় আর সেই সঙ্গে তুমি যেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দান ও করুণাধারার কথা স্মরণ রেখে নিজের গুনাহ স্বীকার করো। আর, হঠাৎ যদি শোকর করার ব্যাপারে আলস্য বা গাফলতি পরিলক্ষিত হয়, তৎক্ষণাৎ যেন সযত্নে তা পুরা করার চেষ্টা করো— অবলম্বন করো অনুশোচনা ও অনুনয়-বিনয়ের পন্থা। আল্লাহ্‌র দরবারে আহাজারী করতে থাকোঃ হে প্রকৃত মাবুদ,

মালিক! যেভাবে তুমি বিনা যোগ্যতায়ই নিছক তোমার করুণায় আমার উপর দান করা শুরু করেছ, তেমনি তুমি তোমারই অনুগ্রহ ও করুণায় পুরা করে দাও— দানে পূর্ণতা আনয়ন করো।

আর সেই সব আউলিয়া কিরামের ন্যায় আল্লাহ্‌র দরবারে করাঘাত করতে থাকো, যারা হিদায়তের মুকুট লাভ করেছে এবং তার মধুর আস্বাদ পেয়েছে। অতঃপর যদি তুমি আপন নফসের জন্য বিচ্ছেদ, অপমান, অসম্মান ও বঞ্চিত হওয়ার ভয় করো, তাহলে রাব্বুল আলামীনের সামনে আহাজারী বা কান্নাকাটি করতে থাকবে অনুশোচনা ও অনুনয়-বিনয়ের সাথে— তাঁর সম্মুখে হাত দারাজ করবে। নিরালা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদবে আর বলবেঃ

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ

رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

এই দোয়ার মর্মার্থ হলো, তোমার তরফ থেকে রহমতের বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। ফলে আমি লোভে পড়ে অন্য নিয়ামতের আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। তুমিই দাতা ও করুণাময়। প্রথমে তুমি যেমন তোমার নিয়ামতের দ্বারা আমাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছো, তেমনি আয় পরওয়ারদিগার, তোমার রহমতে তাতে পূর্ণতা দান করো।

(সূরা আলে-ইমরানঃ ৮)

পরিতাপের কথা, মানুষ বুঝতে পারছে না যে, রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের মধ্যে স্বীয় বুযুর্গ বান্দাদের যে দোয়া সর্ব প্রথম শিক্ষা দিয়েছেন, তা হলোঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

এ জন্য আহাজারী করছি যে, তুমি আমাকে সেই রাস্তায় (স .ল) দৃঢ় এবং স্থিতিশীল করে দাও। কারণ, এ পথে বিপদাপদ অনেক বে .।।

বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আলিমদের বিপদাপদকে পাঁচ রকমের বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তা হলো--(১) অভাবের সময় অসুখ- বিসু.., (২) শেষ বয়সে

নিঃস্বাবস্থা, (৩) তরুণাবস্থায় মৃত্যু, (৪) দৃষ্টিশক্তি লাভের পর পুনরায় অন্ধ হয়ে যাওয়া এবং (৫) মারিফত লাভের পর পুনরায় তা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

কোন এক ব্যক্তি কত সুন্দরই না বলেছেনঃ যে কোন জিনিস বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তার পরিবর্তে অন্য কিছু পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিচ্ছেদের কোন স্থলবর্তী কিছু নেই। দুনিয়ায় লিপ্ত থেকেও যদি মানুষের দীন অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা হারিয়ে যাওয়া উত্তম নয়।

চল্লিশ প্রকারের ফযীলত

আমি গভার চিন্তা-ভাবনার পর উপলব্ধি করতে পেরেছি, আল্লাহ্র ইবাদত, খিদমত ও আনুগত্য প্রদর্শন এবং এই পথে স্থিতিশীলতা অর্জনকারী বান্দাকে আল্লাহ্ পাক চল্লিশ প্রকারের ফযীলত ও কারামত দান করেন। তন্মধ্যে বিশটি দান করেন এই পার্থিব জীবনে, আর অবশিষ্ট বিশটি দান করেন আখিরাতের জীবনে।

পার্থিব জীবনে যে বিশটি ফযীলত ও কারামত দেয়া হয়, তা হলো নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ্ পাক সে বান্দার সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তার ইবাদতের প্রশংসা করেন, যে বান্দার আলোচনা আল্লাহ্র দরবারে হয়, তার মরতবা ও সম্মান যে কত উচ্চে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তদুপরি রয়েছে সেজন্য প্রশংসাসহ দান।

২. আল্লাহ্ সে বান্দাকে সম্মান প্রদর্শন করেন ও তার ইবাদত, আনুগত্য ও খিদমতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সমমর্যাদার কোন ব্যক্তি যদি কাউকে সম্মান দেখায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহলে তাকেই তো যথেষ্ট সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করা হয়। আর স্বয়ং আল্লাহ্ যাকে সম্মান করেন, তার গৌরবের কথা কি আর ভাষায় প্রকাশ করা যায়?

৩. আল্লাহ্ পাক সেই বান্দাকে ভালবাসেন। যদি মহল্লার কোন বড় ব্যক্তি বা শহরের আমীর তোমাকে ভালবাসে, তাহলে তাকেই তুমি কত গৌরবের বিষয় মনে করো এবং বিরাট বিরাট কাজে তার সাহায্য লাভ করে কৃতার্থ হও। তাহলে বুঝতেই পারো, আল্লাহ্ পাকের ভালবাসার মরতবা কত উচ্চে ও কল্যাণময়তা কত গভীর ও ব্যাপক।

৪. আল্লাহ্ পাক সেই বান্দার সকল কাজকর্মের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন।

৫. আল্লাহ্ পাক সেই বান্দার রুযী ও রিযিকের যিম্মাদার হয়ে যান এবং সে যে-কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, বিনা ক্লেশ ও পরিশ্রমে রিযিক পেতে থাকে।

৬. আল্লাহ্ পাক সেই বান্দার সকল শত্রুর ও বিপদাপদ দূর করার জন্য তার বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে যান।

৭. আল্লাহ্ পাক সেই বান্দার ঘনিষ্ঠ সাথী হয়ে যান। ফলে, ভয়-ভীতি এবং উত্থান-পতন ও পরিবর্তন বিবর্তনের কোন দুশ্চিন্তা তাকে আর বিচলিত করতে পারে না।

৮. সেই বান্দার আত্মমর্যাদাবোধ সবল হয়। দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের সেবার দ্বারা তাতে কোন নীচতার স্থান করে নেয়ার সুযোগ থাকে না। এমনকি, দুনিয়ার বাদশাহ্ ও সুলতানগণের সেবা করতেও সে আর রাযী হয় না।

৯. সেই বান্দার মনে দুরন্ত সাহস অর্জিত হয়। সে দুনিয়া ও দুনিয়াবসীদের পঙ্কিলতায় পতিত হয় না। দুনিয়ার খেল-তামাশায়ও সে কখনো লিপ্ত হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তিদের নীতিও এই-ই; তারা কখনো ছেলে-পেলে এবং মেয়েদের নিয়ে খেল-তামাশায় লিপ্ত হয় না।

১০. সেই বান্দার মন মুখাপেক্ষিতা মুক্ত হয়ে যায়। ফলে দুনিয়ার সকল শ্রেণীর বিত্তবানের চাইতেও সে উত্তমাবস্থায় থাকে। মন সুস্থ ও বুক প্রশস্ত থাকে। এই ব্যক্তি কোন কিছু প্রাপ্তিতে আত্মহারা হয় না। তেমনি কোন কিছু না পেলে উদ্বিগ্ন হয় না।

১১. সেই বান্দার অন্তর আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। ফলে, তার সামনে সকল গুপ্ত রহস্য, জ্ঞান ও হিকমতের দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায়। অপরের পক্ষে বহু চেষ্টা-পরিশ্রমের পরও এমন কিছু লাভ করা সম্ভব হয় না।

১২. সেই বান্দার বক্ষ প্রশস্ত হয়ে যায়। পার্থিব বিপদাপদ, ক্লেশ-পরিশ্রম এবং মানুষের ধোঁকা ও দাগা কোন কিছুতেই সে আড়ষ্ট হয় না।

১৩. মানুষের অন্তরে সেই বান্দার ভয় ও ভীতি প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, মানুষ তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং সকল ফিরাউন ও বিদ্রোহী তাকে ভয় করে।

১৪ মানুষের অন্তরে সেই বান্দার প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি হয়। এ ভালবাসার সৃষ্টি করে দেন আল্লাহ্ স্বয়ং। যার ফলে সমস্ত অন্তঃকরণ তাকে ভালবাসতে বাধ্য হয়, সকল শ্রেণীর মানুষ তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়।

১৫ সেই বান্দার প্রত্যেক ব্যাপারেই বরকত ক্রিয়াশীল হয়। এমনকি, তার কথাবার্তা কাজ-কর্ম, পোশাক-আশাক, খানা-পিনা— সবকিছুতেই বরকত প্রতিভাত হতে থাকে। তার সাথে যারা উঠা-ব : করে, তাদের মধ্যেও এর বরকত সঞ্চারিত হয়।

১৬. জমিন বা ভূ-পৃষ্ঠ, স্থল বা জল, যাই হোক না কেন— এমনকি, বাতাসে উড়া পানিতে চলা এবং অল্পক্ষণে দূর-দূরান্তর অতিক্রমের ক্ষমতা অর্জিত হয়।

১৭. চতুষ্পদ জন্তু, পশু-পক্ষী— সকল জীব জন্তুর মধ্যেও সেই বান্দার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। ফলে তার মধ্যে কার্যকরী থাকে একটি সান্নিধ্য ভাব অর্থাৎ সে কখনো নিঃসঙ্গ অনুভব করে না।

১৮. ভূ-পৃষ্ঠের সকল সম্পদ সেই বান্দার ভাগ্যেই জুটে, যেখানে সে হাত রাখে, সেখানে সম্পদ। পানির দরকার হলে শুষ্ক ভূমিতে হাত মারলেই পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়। খাবার ইচ্ছা করলেই আহার্য এসে উপস্থিত হয়।

১৯ রাব্বুল ইয্যতের দরবারে সেই বান্দার নেতৃপদ লাভ হয়। ফলে মখলূক (সৃষ্টি) তার সেবাকে আল্লাহ্র দরবারের উপলক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার মর্যাদা ও উচ্চস্থানের কারণে আপন আপন অভাব দূরীকরণে প্রস্তুত হয়।

২০. আল্লাহর দরবারে সেই বান্দার দোয়া কবূল হয়। যে জিনিস সে চাইবে, তা-ই সে পাবে, যে ব্যাপারে সুপারিশ করবে, তা-ই গৃহীত হবে। এমনকি, তার মর্যাদা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হবে যে, সে যদি কোন ব্যাপারে শপথ করে, তবে আল্লাহ্ পাক তা পুরা করে দেবেন।

শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণীর লোকের অনেকেরই এমন অবস্থা হয় যে, সে যদি পাহাড়ের প্রতি ইশারা করে, তবে পাহাড় সেখান থেকে সরে যাবে। মুখে কোন কিছু চাওয়ার আর প্রয়োজন থাকে না। অন্তরে তার যা উদয় হবে, তা-ই হয়ে যাবে। এমনকি, ইশারা করবারও তার আর প্রয়োজন থাকে না। দুনিয়ার সকল বুযুর্গী ও কারামত হয় তার আয়ত্তে।

অখিরাতে প্রাপ্য বিশটি ফযীলত

১ প্রথমত, সেই বান্দার জন্য আল্লাহ্ পাক মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করে দেন। আর, এই মৃত্যু-যন্ত্রণা এমন যে, এজন্য আম্বিয়া কিরাম পর্যন্ত ঘাবড়িয়েছেন। এমনকি, তাঁরা আল্লাহ্ পাকের নিকট এজন্য মুনাজাত পর্যন্ত করেছেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমার মৃত্যু-যন্ত্রণাকে সহজ করে দাও। অথচ অনেক ব্যক্তির জন্যই মৃত্যুটি এমনভাবে আগমন করে, যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি সুস্বাদু পানি পান করে।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ -

যাদের রূহ ফেরেশতা এমনভাবে কবজ করে যে, তারা শিরক থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (সূরা নাহ্লঃ ৩২)

২. মারিফত ও ঈমান দৃঢ় থাকাও খুবই কঠিন মকাম। আল্লাহ্ পাক উক্ত বান্দাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন।

৩. সেই বান্দার রূহ 'রাহানে বুশরা'য় স্থান লাভ করে এবং লাভ করে চিরন্তন নিশ্চয়তা।

৪. সেই বান্দা চিরস্থায়ী জান্নাত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে।

৫. তাঁর রূহ অতি উচ্চ মকাম হাসিল করে। ফলে সওয়াব ও পুরস্কারের আশায় সকলে তাঁর জানাযা ও দাফন-কাফনে শরীক হয় তার সম্মানার্থে আসমান ও যমীনের ফেরেশতাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরিত হয়।

৬. সেই বান্দা কবরের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় এবং তথাকার সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তওফীক লাভ করে।

৭. তাঁর কবর হয় সমুজ্জ্বল ও প্রশস্ত। সে কবরের সংযোগ স্থাপিত হয় জান্নাতের বাগিচার সাথে। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি তাতে বিচরণ করতে থাকেন।

৮. তাঁর রূহ সবুজ পাখীর আকারে অন্যান্য নেককারদের সাথে আল্লাহ্র শুভাশীষপূর্ণ পরিবেশে আনন্দে বিচরণ করে।

৯. হাশরের ময়দানে সম্মান ও ঐশ্বর্যের মুকুটে তিনি হবেন বিভূষিত।

১০. সেদিন তাঁর চেহারা হবে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়।

১১. কিয়ামতের ভয়াবহ ও ত্রাসপূর্ণ পরিবেশে তিনি লাভ করবেন পরিপূর্ণ স্বস্তি ও শান্তি।

১২. সেই বান্দাকে তাঁর ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

১৩. হিসেব-নিকেশের ব্যাপারে তাঁর সাথে কড়াকড়ি কম করা হবে অনেকের হিসেব-নিকেশই হবে না।

১৪. তাঁর আমলের ওজন হবে ভারী। এমনকি, আমলের ওজনের জন্য তাঁকে দাঁড়াতেও হবে না।

১৫. তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে হাউজে কাউসারের নিকট উপস্থিত হবেন এবং তথা হতে এমন পানি পান করবেন, যার ফলে কোনদিন আর তৃষ্ণার্ত হবেন না।

১৬. পুলসিরাতের উপর দিয়ে নির্বিঘ্নে পার হয়ে যাবেন। দোযখ থেকে পাবেন মুক্তি।

১৭. কিয়ামতের দিন নবী-রাসূলদের ন্যায় শাফা'আতের অধিকার লাভ করবেন।

১৮. জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবেন।

১৯. জান্নাতেও সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

২০. আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উন্মুক্ত দিদার হবে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। অসংখ্য দরূদ তাঁর রাসূলের প্রতি।

ইফাবা-৯৪-৯৫-এ/৩৫৪২(উ)-৩২৫০